এক রমণীর যুদ্ধ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮ এপ্রিল ১৯৬২

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ মুদ্রক
ইম্প্রেসন হাউস
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২, বিডন রো
কলকাতা-৭০০০০৬

সুরজিৎ ঘোষ

প্রীতিভাজনেষু

এক রমণীর যুদ্ধ

খুব দূরপাল্লার যাত্রা নয়। কলকাতা থেকে বারাণসী। ঘড়ি-ধরা সময় মনে নেই, সকাল সাড়ে ন'টা দশটায় হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে রাত সাড়ে সাতটা আটটায় বেনারস পৌঁছে দেবে। তবে, সেখানে এখন খুব কড়া শীত খবর পেয়েছি, তাই আমাদের মতো প্রবীণদের কাছে সাড়ে সাতটা আটটা একেবারে কিশোরী রাত্রিও নয়। বিশেষ করে ন'-দশ ঘণ্টার জার্নির ধকলের পর নতুন জায়গায় গিয়ে পড়লে। কিন্তু সে জন্যে কারো মনে উদ্বেগ নেই। বয়স্করা রিজারভেশন টিকিটের সঙ্গে উষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতিও আগাম পেয়ে তবে এই যাত্রার শরিক হয়েছেন।

আমাদের এয়ার কনডিশনড্ চেয়ারকার কম্পার্টমেণ্টের প্রায় সবটাই কবি কথাশিল্পী সমালোচক নাট্যকার মাসিক-সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সম্পাদক আর সাহিত্য অনুরাগী সাংবাদিকে ঠাসা। এছাড়া সিংগল্-ফেয়ার ডাবল-জার্নির সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু ভাবী কবি সাহিত্যিকও বারাণসীর এই সভায় যোগ দিতে চলেছেন। এটা নিখিল বঙ্গ বা নিখিল-ভারত সাহিত্য সম্মেলন নয়। সেখানকার প্রাচীনতম বাঙালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আর তাদের লাইব্রেরির সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এই আমন্ত্রণ। টানা পাঁচ দিনের সমাবেশটি কোনো সাহিত্য সম্মেলনের থেকে বড় ছাড়া ছোট হবে মনে হয় না। অনুষ্ঠান সূচীতে নাচ গান বাজনা ক্যারিকেচার নাটক ইত্যাদিও আছে। কিন্তু সেখানকার কর্মকর্তাদের সাহিত্য সমাবেশটি জম-জমাট করে তোলাটাই বোধহয় প্রধান লক্ষ্য।

ট্রেনের এক কামরায় বাগ্‌বাদিনীর এত রথী-মহারথী আর সৈনিকের এমন মিলন সচরাচর ঘটে না। তাই দূরের যাত্রা না হলেও ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীন প্রবীণ এবং মধ্য-বয়সী সকলের মনেই একটা ভেসে-

পড়া গোছের লাগাম-ছাড়া ভাব। এয়ার কনডিশনড্ কামরায় ট্রেন চলার ঘড়ঘড় খটাং খটাং শব্দ নেই, তাই কেউ গলা চড়ালে সকলেই শুনতে পায়। ট্রেন চলতে শুরু করার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকলের শ্রদ্ধেয় প্রবীন কবি কথাশিল্পী উঠে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন, শুনহ সুধিজন! এখানে নরক গুলজার যদ্যপি হয়, সাহিত্য কচকচি কদাপি নয়!

সমবয়সী কবি এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসকার টিপ্পনী কাটলেন, তবু ভালো যদ্যপির সঙ্গে কদ্যপি মেলাওনি।

আমার সমবয়সী সদাগম্ভীর ফাজিল সাহিত্যিক তাঁর দুশ্চিন্তা প্রসারিত করলেন, ট্রেনের এই একটি কামরা অঘটন কবলিত হবার ফলে এর জঠরস্থ সব কবি-সাহিত্যিক যদি এক সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন তাহলে বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যা দশা কতকালে ঘুচবে?

—দীর্ঘকালের জন্য না ঘোচাই মঙ্গল, দুর্মুখ নামী সমালোচক ভদ্রলোকের কাষ্ঠ জবাব, বাংলা সাহিত্যের অবাঞ্ছিত এক্সপ্লোশনে আমরা জর্জরিত, দীর্ঘ-মিয়াদী বার্থ-কণ্ট্রোল দরকার।

তাঁর প্রত্যয়ী মতবাদ তুচ্ছ করে অধ্যাপক-কবি সমস্যার বিকল্প সমাধানে পৌঁছুলেন, এ রকম প্রমাদই যদি ঘটে, পরলোকে গিয়ে সকলে মিলে আমরা একটি সাহিত্য জগৎ সৃষ্টি করব, খুঁজে পেতে কবিগুরুকে এনে রাজ-সিংহাসনে বসাবো।

একজন জুনিয়র ক্রিটিকের মন্তব্য, খবর পেলে তিনি না সত্রাসে আবার এই মর্ত্যেই পালিয়ে আসেন।

দুপুরের আহার সাময়িক তন্দ্রা আর এমনি অম্ল-মধুর রসালাপের ফাঁকে দুপুরে বিকেল আর সন্ধ্যা গড়িয়েছে। ট্রেন প্রায় ঘণ্টাখানেক লেট, তা-ও খুব একটা বিরক্তির কারণ হয়নি। যত উত্তরে যাচ্ছি শীতের প্রকোপ বাড়ার কথা। কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসে তফাৎ অনুভব করছি না। তবু পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে সুটকেস থেকে পুলোভার বার করে গায়ে চড়িয়েছি আর কাঁধে ভাঁজ-করা শাল ফেলে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছি। প্রবীণরা অনেকেই তাই করেছেন। বয়সের গরম যাঁদের তাঁরা বক্র কটাক্ষ

হেনেছেন। ট্রেন থেকে নেমে তাঁদের পস্তানো মুখভাব লক্ষ্য করার সুযোগ হয়নি। একে মাঘের শীত, তায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি। স্টেশনের সরগরম পরিবেশে সোয়েটারের ওপর শাল জড়িয়েও মনে হচ্ছে কনকনে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া চামড়ায় বিঁধছে।

ডজন দেড়েক ভলান্টিয়ারসহ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অভ্যর্থনায় হাজির। এই সাদর অভ্যর্থনা সকলেরই প্রত্যাশিত ছিল। এঁদের অন্যতম মাতব্বর বীরেশ্বর ঘোষাল আমার পুরনো বন্ধু এবং সহপাঠী। এখানকার কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছিল। সম্প্রতি রিটায়ার করেছে। বারাণসীতেই স্থায়ী বসবাস। দশ বছর হল বিপত্নীক। বরাবরই রসিক মানুষ। স্ত্রী বিগত হবার পর তার রসবোধ আরো বেড়েছে। কলকাতায় গেলে আমার ওখানেই ওঠে। গেল বছরও লাইব্রেরির বই কেনার জন্য দু'দিনের জন্য এসেছিল। তার খেদের কথা শুনে হেসেছি। বলেছিল, এ-বয়সে বউ খুইয়ে ছেলে, ছেলের বউয়ের তদারকে থাকতে হলে কি যে বিড়ম্বনা তুমি বুঝবে কি, মুখ ফসকে দু'-চারটা রসের কথা বেরুলেই ধড়ফড় করে চার দিকে তাকাতে হয়, কে শুনে ফেলল, দশ বছরের নাতনীটার সঙ্গে যেটুকু রসালাপ চলে তাই শুনেই আমার বউমায়ের কান লাল হয়। বছর ছয় আগে এই বেনারসেই নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের আসর বসেছিল। সেবারে নামী হোটেলে থাকার ব্যবস্থা নাকচ করে বীরেশ্বর ঘোষালের সাদর আতিথ্যে দিন কয়েক কাটিয়ে গেছি। হোটেলে থাকা যদি বা বরদাস্ত করতে পারি খাওয়া-দাওয়া মোটে পছন্দ হয় না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার বাদ বিচার আরো বেড়েছে। এবারেও আমার থাকার ব্যবস্থা ওর বাড়িতেই হবে ধরে নিয়েছি। শুধু আমার কেন, আরো জনাকয়েক বয়স্ক কবি-সাহিত্যিকের হোটেল পছন্দ নয়, তাঁরাও এক-একজন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত অতিথি হয়ে থাকবেন শুনেছি। এবারে বীরেশ্বর ঘোষালের আগ্রহাতিশয্যে আমার আসা। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিল, তোমার হোটেল পছন্দ নয় জানি, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তোমার ব্যবস্থা সর্বোত্তম হবে।

এই প্রতিশ্রুতির ফাঁকে যে কিছু রসিকতা প্রচ্ছন্ন ছিল কল্পনাও

করিনি।

সকলকে কর-জোড়ে অভ্যর্থনা জানাতে জানাতে বীরেশ্বর এক ফাঁকে আমার কাছে এসে গলা খাটো করে বলল, এবারের এত কবি-সাহিত্যিকের ঝাঁকের মধ্যে তুমি সব থেকে লাকি, তোমার জন্য যে ব্যবস্থা করেছি এরপর তুমি বেনারস থেকে নড়তে চাইলে হয়··· আগে এঁদের ডেসপ্যাচ করে নিই, ততক্ষণ তুমি এই মহিলাকে ভালো করে দেখে রাখো।

চোখের ইশারায় যাঁকে দেখালো কিছু না বুঝে আমি তাঁর দিকে ফেরার ফাঁকে বীরেশ্বর হন্তদন্ত হয়ে আর একদিকে সরে গেল। গজ কুড়ি দূরে একটি মহিলা দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টিও আমার দিকেই। হাসি-ছোঁয়া সপ্রতিভ চাউনি। পরিচয় হয়নি বলেই হয়তো এগিয়ে আসতে দ্বিধা।

ভব্যতা রক্ষা করে এক নজরে কতটুকু বা দেখা সম্ভব। মুখ ফেরানোর পরেও মনে হল একটা সাদাটে ছটা আমার চোখে লেগে আছে। স্টেশনের হট্টগোল আর ভলান্টিয়ারদের ব্যস্ততার ফাঁকে আরো বার কয়েক লক্ষ্য করলাম। দুই একবার চোখোচোখিও হয়ে গেল।··· বছর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে বয়েস, গায়ের রং বেশ কালো, বাঙালী ধাঁচের মুখ নয়, কিন্তু ভারী সুশ্রী, লম্বার ওপর সুঠাম স্বাস্থ্য। পরণে দুধ-সাদা শিফন শাড়ি, গায়ে ভেলভেটের মতো মসৃণ সাদা ব্লাউস, কাঁধ আর পিঠে জড়ানো সাদার ওপর কাজ-করা কাশ্মীরি শাল···খোঁপায় গোঁজা ঘোমটা। পরে লক্ষ্য করেছি পায়ের শৌখিন স্যাণ্ডেল জোড়াও সাদা। কিন্তু যে সাদাটে ছটার কথা বললাম তা ওই সাদা বেশ-বাসের নয়। হীরের। মহিলার নাকে বেশ বড় একটা হীরের ফুল। দেখামাত্র মনে হয়েছে কোনো অতি সুশ্রী রমণীর কালো মুখ আলো করার ক্ষমতা একটিমাত্র অলংকারই ধরে—সেটা তাঁর নাসিকা-বিদ্ধ প্রমাণ-আকারের একখানা হীরে।···বাঁ-হাতে সোনার চেনের রিস্ট-ওয়াচ ছাড়া আর কোনো গয়না নেই।

বীরেশ্বরের মনে কি আছে জানি না, ভিতরে ভিতরে কি রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি!

ভলান্টিয়ার আর কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে সকলে স্টেশনের বাইরে

লাম। . সারি সারি ট্যাক্সি আর কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে। বশির ভাগ অতিথির হোটেলে থাকায় ব্যবস্থা। এক-এক ট্যাক্সিতে ার-পাঁচজনকে তুলে নিয়ে ভলান্টিয়াররা প্রস্থান করল। কর্মকর্তারাও য-যার বরাদ্দ অতিথিদের নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। শেষে বাকি আমি, অগ্রজতুল্য সেই কবি-সাহিত্যিক এবং কবি-ঐতিহাসিক উপন্যাসকার। াত-আট গজ দূরে ওই মহিলা দাঁড়িয়ে। প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক তাঁকে ার কয়েক লক্ষ্য করে খাটো গলায় তাঁর সতীর্থকে বললেন, দেখে নাও ভালো করে, কালো তা সে যতই কালো হোক···রবি ঠাকুর নাকের ওই হীরের ছটা দেখলে আরো কি লিখতেন গো?

আমার অস্বস্তি। কারণ প্রবীণ সতীর্থটি সোজা ঘুরে দাঁড়িয়ে মহিলাকে একপ্রস্থ দেখে নিলেন।

ছোটাছুটির ফলে এই জমাটি শীতেও বীরেশ্বর ঘোষালের হাঁপ ধরেছে। শেষ প্রস্থের অতিথি ক'জনকে চালান করে ফিরে এসে হৃষ্ট বদনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। —যাক, কম্‌প্লিট—দাদারা চলুন, আপনারা দু'জন আমার অতিথি, আর তুমি—

ঘুরে তাকালো, অবন্তী দেবী আপনি দূরে দাঁড়িয়ে কেন, আপনার অতিথি তো মজুত, আর এঁরা দু'জন হলেন—

—আমি সকলকেই চিনি। দু' হাত বুকের কাছে যুক্ত করে স্মিত মুখে মহিলা এগিয়ে এলেন। তারপর নত হয়ে অগ্রজ দু'জনকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আমার দিকে এগোলেন। বিড়ম্বিত মুখে পিছু হটতে খুব সহজ দাবির সুরে বললেন, আপত্তি করবেন না, আমি সব দিক থেকেই আপনাদের অনেক ছোট।

সহজ মিষ্টি কথা, গলার স্বরও তেমনি মিষ্টি। প্রণাম নিতে হল। কবি-সাহিত্যিক বলে উঠলেন, আমরা আপনাকে চিনি না অথচ আপনি আমাদের চেনেন, এটা কি রকম হল?

কালো কমনীয় মুখের সলাজ হাসিটুকুও নাকের হীরের ছটায় ঝকঝকে মনে হল। কানের দু' পাশের কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে। তুলে ফেলা বা গোপন করার চেষ্টা নেই দেখে আরো ভালো লাগল। সবিনয়ে জবাব দিলেন, আমার ছবি তো কাগজে বেরোয় না আপনারা

চিনবেন কি করে, আপনাদের হামেশাই বেরোয়।···তাছাড়া বীরেশ্বর-বাবু আপনাদের সকলের ফোটো ক্লাবের লাইব্রেরি ঘরে সাজিয়ে রেখেছেন।

ওই দুই সাহিত্যিকেরই বয়েস সত্তর ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়েছে। কিন্তু মন বুড়োয়নি। একজন বললেন, তার মানেই ফাটোগ্রাফির অপচয়, আপনার ক'খানা ফোটো টাঙানো আছে জানতে চাই।

মহিলা ইংগিতজ্ঞা নিশ্চয়। হেসে ফেললেন।

দ্বিতীয় জন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, আমারও সেই প্রশ্ন! বীরেশ্বরের দিকে ফিরলেন, এঁর পরিচয়?

বীরেশ্বর ঘোষাল আমারই সুবাদে কলকাতার সাহিত্যিক মহলের অন্তরঙ্গ মানুষ। পরিচয় দিলেন, ইনি শ্রীমতী অবন্তী পাণ্ডে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট পেট্রন, আর লাইব্রেরির বর্তমান কর্ণধার, এঁরই দাক্ষিণ্যে এখন পশ্চিম বাংলা ছেড়ে তামাম ভারতের ছোট বড় সমস্ত বাঙালী কবি-সাহিত্যিক সেখানকার বইয়ের সেলফ্-এ জাঁকিয়ে বসে আছেন···এছাড়া এঁর আসল গুণের পরিচয় আপনারা কাল পাবেন।

ছ' বছর আগে যখন এসেছিলাম এই বিশিষ্ট পেট্রনটির অস্তিত্বও জানা ছিল না। মনে হয় বীরেশ্বরেরও ছিল না।

দুই প্রবীণতর সাহিত্যিক বয়েস এবং নামোচিত গম্ভীর। একজন বললেন, শুনে খুশি হলাম, কালকের অপেক্ষায় থাকব। ···তা আমাদের ভায়া বুঝি এঁর অতিথি?

আমার চোখ এড়িয়ে বীরেশ্বর ঘোষাল জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

দু'জনেই যে চোখে তাকালেন আমার দিকে তার সাদা অর্থ ভাগ্যখানা বটে তোমার। অন্যজন বললেন, তাহলে আমরা আর এই শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাই কেন, তোমার বাহন কোনটা?

—ওই যে। তাদের সঙ্গে একটু এগিয়ে এসে বীরেশ্বর বলল, আপনারা গিয়ে বসুন, আমি এক মিনিটের মধ্যে এঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি—

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমি মনে মনে খাবি খাচ্ছি। মহিলাকে ছেড়ে

এই ফাঁকে আমিও ওঁদের পিছনে খানিকটা এগিয়ে গেছি। বীরেশ্বর ফিরতেই রাগত চাপা গলায় বললাম, এটা কি রকম রসিকতা হল ?

শুনতেই পেল না যেন। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, চট করে অতিথিকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ুন অবন্তী দেবী --আমার বন্ধুর ভাগ্য দেখে ওই দুই ভদ্রলোক শীতে আরো বেশি কাঁপছেন।

সত্যিই স্টেশনের বাইরে শীতের কামড় আরো বেশি। কিন্তু মহিলাকে তেমন শীতে কাবু মনে হল না। দুই কাঁধে শাল এখনো তেমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াননি, কেবল গলায় জড়িয়েছেন। সঙ্গ নিয়ে খুশি মুখে বীরেশ্বরকে বললেন, ক'টা দিন এঁদের সামনে অন্তত আপনার জিভকে একটু শাসনে রাখুন।

অদূরের ঝকঝকে সাদা অ্যামবাসাডারের দিকে পা বাড়িয়ে বীরেশ্বর ঘোষাল গম্ভীর গলায় বলল, আমার জিভের এখন দুঃশাসনের মেজাজ, আপনার গাড়িতে ওঠার আগে একটা ফয়সালা হয়ে যাক, একটু আগে আমার বন্ধু এবার আপনার অতিথি শুনে বললেন, এটা কি রকম রসিকতা হল। তার জবাবে আমি যদি বলি সাহিত্যিকদের মধ্যে যে ক'জন হোটেলে থাকা পছন্দ করেন না তাঁদের নাম শুনে আপনি নিজে ওঁকে চেয়ে নিয়েছেন—সেটা কি এক বর্ণও মিথ্যে হবে ?

জবাবে নাকের হীরের জেল্লার সঙ্গে আবার ঠোঁটের হাসি মিশল। মাথাও নাড়লেন একটু। —না, তা হবে না।

—শুনলে ? সকালের ব্রেকফাস্ট বিকেলের সাপার দুপুরের লাঞ্চ রাতের ডিনারে কি-কি বৈচিত্র্য পেলে তোমার রসনা সিক্ত হয়, আর অন্যান্য ব্যাপারেও তোমার কি পছন্দ বা অপছন্দ—ক'দিন ধরে ইনি মনোযোগী ছাত্রীর মতো আমার কাছ থেকে সেই পাঠ নিয়েছেন, আর তোমাদের ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা লেখার এই কদর দেখে আমি হিংসেয় জ্বলেছি—বুঝলে ? তবু আপনাকে বলে রাখি ম্যাডাম, জলজ্যান্ত একজন খুঁতখুঁতে সাহিত্যিককে ঘরে নিয়ে তোলাটা তার বই বুকে নিয়ে পড়ে থাকার মতো জল-ভাত ব্যাপার নয়—সেধে ঘাড়ে নিয়েছেন এখন সামলানোর দায়ও আপনার।

অন্য কারো প্রসঙ্গ হলে রমণীর কালো মুখের সুচারু বিড়ম্বনাটুকু

উপভোগ্য মনে হত। নিজে একটু জোর পাওয়ার মতো করে বললেন, আপনি আমাকে ঘাবড়ে দেবেন না, ওঁর যাতে অসুবিধে না হয় আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করব···কিন্তু উনি খুঁতখুঁতে মানুষ আপনি কখনো বলেননি তো, বরং উল্টো বলেছেন!

এবারে আমার তরফ থেকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা। ব্যস্ত হয়ে বললাম, আপনি ওঁর কথায় কান দেবেন না, আমার কোন কিছুতেই অসুবিধে হয় না, আমি আপনার অসুবিধে ভেবেই সংকোচ বোধ করছিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মিষ্টি জবাব, আমার আবার কি অসুবিধে আমার তো ভাগ্য!

ঘোষাল হড়বড় করে বলে উঠল, তাহলে তো হয়েই গেল, আঙুল তুলে সামনের সাদা গাড়িটা দেখিয়ে হুকুম করল, আপনি এগিয়ে গিয়ে আপনার ভাগ্যের দরজা খুলুন, আমি চট করে এঁকে একটা দরকারি কথা বলে নিই—

মহিলা খুশি মুখে একটু এগোতেই বন্ধু কাঁধে একটা খাবলা মেরে আমাকে নিজের দিকে ফেরালো। গলা খাটো করে কানে কানে বলল, সময় নেই, ওই দুই বুড়ো শীতে হি-হি করে কাঁপছেন কি রাগে আর হিংসেয় কে জানে—একটা কথা কেবল বলে রাখি, এখন যত রাগই করো, তোমার শেষ ধন্যবাদ আমারই পাওনা হবে—এখন মনে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব না রেখে সুড়সুড় করে শ্রীমতীর সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠে বোসো—আর এত শীতে রাতে অন্তত গুরুভোজনের লোভ সামলে সুমলে চলো।

বলে হাসি চেপে হনহন করে বীরেশ্বর রাস্তার ওপারের গাড়ির দিকে চলল।

সাদা অ্যামবাসাডারের সামনে অবন্তী দেবী ছাড়া আরো দুটি মানুষ দাঁড়িয়ে। শৌখিন বেশ-বাস, দুজনেরই গলায় সোনার চেন হার, গরম জামায় হীরের বোতাম, সোনার ব্যাণ্ডের হাত-ঘড়ি। দেখলেই বোঝা যায় দুই ভাই। একজনের বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি অন্য জনের

সাইত্রিশ-আটত্রিশ। চেহারা-পত্র তেমন সুন্দর নয়, কিন্তু দু'জনেই বেশ লম্বা। সুখের শরীরে কিঞ্চিৎ মেদাধিক্য ঘটার ফলে বয়েস অনুযায়ী একটু ভারিক্কি দেখায়।

অবন্তী বললেন, আসুন, আমার ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এ আমার বড় ছেলে নকুল আর এ ছোট—সহদেব। ড্রাইভারটা হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় এদের ধরে নিয়ে এসেছি—ওরা অবশ্য খুশি হয়েই আপনাকে দেখতে আর নিতে এসেছে।

দু'জনেই হাত জোড় করে অনেকটা নত হয়ে আমাকে শ্রদ্ধা জানালো। অবন্তী পিছনের দরজা খুলে দিলেন, আসুন—

আমি একটু ভেবাচাকা খেয়ে উঠে পড়লাম। এঁদের মা-ছেলের সম্পর্কটা চট করে বোধগম্য হল না। না হবার কারণ মহিলার বয়েস যদি ছেচল্লিশ সাতচল্লিশও হয়, এ বয়সের দু' দুটো ছেলে তাঁর নিজের হতে পারে না।

ছোট ছেলে সহদেব গাড়ি চালাচ্ছে, বড়জন তার পাশে। গাড়ি ফাঁকা রাস্তায় পড়তে নকুল একটু ঘুরে বসে বলল, দু'দিন ধরে মায়ের মুখে আপনার কথা খুব শুনছি, মা আপনার লেখার দারুণ ভক্ত। ড্রাইভার মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে, কিন্তু আপনাকে দেখার লোভে আমরাই চলে এলাম।

অবন্তী বললেন, দেখে আর কতটুকু বুঝবে ওঁকে, পড়াশুনার সময় তো তোমাদের আর হয়ে ওঠে না।

বড়জন এই মৃদু অনুযোগ হাসি মুখেই মেনে নিযে হালকা খেদ প্রকাশ করল, সত্যি, এক ব্যবসা দেখা ছাড়া আমাদের আর কিছুই হল না।

যেমন মা-ই হোক, এত বয়সের দুই ছেলে বেশ অনুগত এবং অন্তরঙ্গ এটুকু বোঝা গেল। ভালো লাগল এবং কৌতূহলও হল। জিগ্যেস করলাম, এদের কিসের ব্যবসা ?

অবন্তী জবাব দিলেন, ওরা বেনারসী শাড়ির ম্যানুফ্যাকচারার আর হোলসেলার, আবার যার যার আলাদা দোকানও আছে—দু'জনেরই ব্যবসায়ে খুব নাম-ডাক।

দেখেই অবস্থাপন্ন মনে হয়েছিল, বেশ জাঁকালো ব্যাপার বোঝা গেল। কিন্তু বড় ছেলে নকুলের হাসি মুখের মন্তব্য এবং পরের বিস্তারটুকু শুনে বেশ অবাকই লাগল।

প্রথমে ভাইকে বলল, মা কেমন বললেন শুনলি? তারপর আমাদের দিকে আধাআধি ঘুরে বসে জানান দিল, মায়ের নিজেরও এই একই বিজনেস আর সেটা আমাদের থেকে বড় ছাড়া ছোট নয় —বুঝলেন?

বুঝেও চট করে আমার মুখে কথা সরল না। অবন্তী পাণ্ডে সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাতে চাইলেন।—বড় হোক ছোট হোক সবই তো বাপু তোমাদের ঘাড়ে রেখে, যাক, কোথায় এঁর কথা শুনব, না আমরা নিজেদের কথাই বলে যাচ্ছি।

এবারে খেয়াল হল গাড়ি শহরের পথ ধরে চলছে না। রাস্তা বেশ অন্ধকার আর নির্জন। গাড়ির রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে তাকিয়েও ঠিক ঠাওর হল না। অনেক দূরে দূরে এক-একটা ল্যাম্পপোস্ট। প্রশস্ত পাকা রাস্তায় গাড়ি বেগে ছুটেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি ক্যান্টনমেন্টের রাস্তা ধরে চলেছি?

সামনে থেকে সহদেব জবাব দিল, হ্যাঁ, আমবাগান ছাড়িয়ে সারনাথ আর বেনারসের মাঝামাঝি জায়গায় মায়ের বাড়ি।

ছ'বছর আগেও জানতাম, রাত-বিরেতে এ পথ খুব নিরাপদ নয়। এই বিশাল পথের এদিক-ওদিকে কিছু কিছু বস্তিঘর শুধু দেখা যেত। সাইকেল রিকশ বা টাঙ্গার সারনাথ দর্শনার্থীরা সন্ধ্যারাতের মধ্যেই শহরে ফিরে আসত। অবশ্য গেল বারেও দেখে গেছি প্রায় সব দিকেই বারাণসীর বিস্তার দ্রুত গতি নিয়েছে। কিন্তু এ-দিকটা এখনো নির্জন দেখছি আর বাড়ি-ঘরও তেমন চোখে চোখে পড়ছে না। শীতের এই রাত সাড়ে ন'টা নিঝুম রাত্রি মনে হচ্ছে।

বাইরের দিকে চোখ রেখেই জিগেস করলাম, এ-দিকটায়ও আজকাল বসতবাড়ি উঠছে তাহলে?

সহদেবই জবাব দিল, কেমন উঠছে দেখতেই পাচ্ছেন, আরো মাইল খানেক এগোলে হাতে গোনা কয়েকটা দেখতে পাবেন, মা-ই এই

ব্যাপারে পাইওনিয়ার বলতে পারেন। হেসে যোগ করল, আমাদের মায়ের ভয়ে ডাকাতও ঢিট্‌।

দুশ্চিন্তা নস্যাৎ করার সুরে অবন্তী পাণ্ডে বললেন, হ্যাঁ, ডাকাতের আর পরমায়ুর শেষ নেই, জন্ম জন্ম ধরে কেবল ডাকাতিই করে যাবে। হলে ডাকাতি আর কোথায় না হয়—শহরে হয় না? ডাকাত কিছু পাবার আশা নিয়েই ডাকাতি করে, এখানে পাবেটা কি? টাকা পয়সা সোনা দানা কেউ আর আজকাল ঘরে নিয়ে বসে থাকে না, এ ডাকাতও জানে। আমার দিকে ফিরলেন, আবছা অন্ধকারে নাকের হীরে ঝকমক করে উঠল।—আসলে লোকের ভয়ই বেশি বুঝলেন, কবে কোন্‌ কালে এ-দিকটায় ডাকাতি হত বলে আজও তাই ধরে নিয়ে বসে আছে। হাসলেন।—এই তল্লাটে বাড়ি করব ঠিক করতে আমার দুই ছেলেরই সে কি ভীষণ আপত্তি, এখানে বাড়ি করলে ওদের মা-কে ডাকাতে একেবারে গিলে খাবে!

মহিলার বিলক্ষণ স্নায়ুর জোর আছে বোঝা গেল। মুখের দিকে চেয়ে তবু একটু সংশয়ের আঁচড় না কেটে পারলাম না। দিনের বেলা কেমন লাগবে জানি না, রাতে লোকালয় ছেড়ে এই নির্জনে বাস আমারও খুব মনঃপূত নয়। বললাম, ডাকাতের লোভের স্ট্যানডারড সম্পর্কে আপনার ধারণা যদি ঠিক না হয় তাহলে একটু মুশকিল··· ধরুন আপনার নাকের ওই হীরে আর হাতের সোনার ঘড়ি সোনার চেনও তো খুব বড় না হোক ছোটখাটো ডাকাতের বেশ লোভের কারণ হতে পারে।

সামনের দু' ভাই-ই হেসে উঠল। বড় ভাই বলল, আমাদেরও সেই কথা।

অবন্তী পাণ্ডের নিঃশঙ্ক মেজাজী জবাব, লোভ হলেই হল, তাদের আর প্রাণে ভয়-ডর নেই, বাড়িতে দুটো দারোয়ান আছে তিনটে যোয়ান চাকর আছে—দুটো ঝি, দুটো আয়া আর মেয়েগুলো আছে, ওরা সব একসঙ্গে চেঁচালে ডাকাত পালাবে।

প্রথমে মহিলার এই দুই ছেলে দেখে একপ্রস্থ ধোঁকা খেয়েছিলাম। এখন আর এক দফা ফাঁপরে পড়লাম। আমার জন্য বীরেশ্বর ঘোষালের

'সর্বোত্তম' ব্যবস্থার তল-কূল পাচ্ছি না।

মজার কিছু মনে পড়তে সামনের সিটে নকুল প্রায় ঘুরেই বসেছে, উৎফুল্ল মুখে জিগ্যেস করল, আচ্ছা মা, হরিহর ছাদে উঠে এখনো বন্দুক দাগে তো?

পলকা অনুযোগের সুরে তার কাছাকাছি বয়সের মা'টি জবাব দিলেন, তা আর দাগবে না, যেমন আস্কারা দিয়েছ তোমরা, বারণ করলেও শোনে! আবার আমার দিকে ঘুরে একটু জোরেই হেসে উঠলেন। আবছা অন্ধকারে সুন্দর দাঁতের সারিও চিকিয়ে উঠল। আর আমার চোখের ভ্রম নিশ্চয়, একই জিনিস দেখছি, মহিলা হাসলেই তাঁর নাকের হীরের ছ'টাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। বললেন, কাণ্ড শুনুন, আপনি এ নিয়েও লিখতে পারেন—এখানকার বাড়িতে এসে ওঠার দিন থেকেই দারোয়ান দুটো এখানেই আছে। দুটোরই কর্তব্যজ্ঞান এমন যে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। তার মধ্যে হরিহরকে সহদেব শিখিয়ে রেখেছিল, রাতে মাঝে মাঝে ছাদে উঠে বন্দুক ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করবি—তাহলে আশপাশের চোর ডাকাত জানবে এ-বাড়িতে বন্দুক আছে, সাবধান! সেই থেকে আজ তিন বছর ধরে সপ্তাহে দু'দিন করে হরিহর সন্ধ্যা পেরুলে ছাদে উঠবেই আর বন্দুক ছুঁড়বেই।

সাড়ে তিন-চার মাইল পথ নিমেষে ফুরিয়ে গেল। হেড লাইটের আলোয় দেখলাম উঁচু দেয়াল-ঘেরা বিরাট চত্বরের মধ্যে বাড়ি। সামনে মস্ত লোহার গেটের শেকলে পেল্লায় দুটো তালা ঝুলছে। হর্ন বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে মস্ত টর্চ জ্বেলে একটা লোক ছুটে এসে চাবি লাগিয়ে গেটের তালা খুলল। ব্যস্ত হাতে গেট দুটোও সটান খুলে দিল। কিন্তু গাড়ি এগোবার আগে অবন্তী বড় ছেলেকে বললেন, বাহাদুরের কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে তোমাদের দুর্গের বাইরেটা ওঁকে দেখাও--

সহদেব হাসি মুখে দরজা খুলে নেমে দারোয়ানের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে প্রথমে গেটের মাথায় আলো ফেলল। গ্রীল বসানো মস্ত গেটের রডের মাথাগুলো তীরের ফলার মতো ছুঁচলো। টর্চের আলো দু'মানুষ সমান উঁচু দেয়ালের ওপর ফেলতে দেখা গেল, দেয়ালের মাথায়

আগাগোড়া ছুঁচলো মোটামোটা লোহার রডের টুকরো গাঁথা। নিরাপত্তার ব্যবস্থা পাকা-পোক্ত বটে। আক্ষেপের সুরে অবন্তী বললেন, চোর-ডাকাতের ওপর ছেলেদের দয়ামায়া নেই, টপকাতে চেষ্টা করলেই রক্তাক্ত কাণ্ড হবে।

ভিতরের রাস্তা ছোট একটু বাগান আধা-আধি বেষ্টন করে সিঁড়ির গোড়ায় এসে শেষ হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই মস্ত ঢাকা বারান্দা। দোতলায়ও সামনের দিকটা এমনি বারান্দা মনে হল। নিচের বারান্দায় এক প্রস্থ সৌখিন সোফা-সেটি সাজানো। শীতের সন্ধ্যায় বা রাতে এখানে বসলে হাড়ে বাতাস লাগবে। শহরের থেকে এখানে দেড়া শীত। সকালে আরামদায়ক হতে পারে। সামনেই মস্ত হল্ ঘরটা ভিতরের বৈঠকখানা। এটার সাজসজ্জা আরো আধুনিক, আরো শৌখিন। এর দু'দিকে তিন-চারখানা করে ঘর মনে হল।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ ভালো লাগছে। অবন্তী বললেন, আপনি বসে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করুন, তারপর আপনার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

একজন মাঝবযসী লোক দরজাব কাছে এসে সকলের উদ্দেশে আনত হল। তার পাশের যোয়ান গোছের লোকটা চাকর হবে। কর্ত্রী বয়স্ক লোকটিকে জিগ্যেস করল, মিশ্রজি তোমাব তবিয়ত এখন বিলকুল ঠিক তো?

—জী মাতাজী।

—ঠিক আছে, এখন আরাম করোগে যাও, কাল থেকে তোমার কেবল আমাদের এই মেহমানের ডিউটি আমার দরকার হলে ছোট গাড়িটা ব্যবহার করব।

এবারে মেহমানের উদ্দেশে আর একবার করজোড়ে আনত হয়ে মিশ্রজী চলে গেল। কর্ত্রী দ্বিতীয় লোকটিকে হুকুম করলেন, রাম, আজ রাত থেকে তোমারও কেবল এই বাবুজীর ডিউটি, সব সময় কাছাকাছি থাকবে, কি দরকার না দরকার দেখবে, উনি আর একটু বাদে ঘরে যাচ্ছেন, সব ঠিক আছে কিনা দেখে রাখো—

লোকটা চলে যেতে বলে ফেললাম, এমন রাজসিক খাতির বা

আদর-যত্ন পেতে তো আমি অভ্যস্ত নই।

—কিছু না, আজ আমার কত আনন্দ আপনি ভাবতে পারেন না, আপনি বীরেশ্বরবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু শুনে অনেকদিন ভেবেছি ওঁকে ধরে নিয়ে আপনার কলকাতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হব কিনা—

···তাহলে মুশকিলেই পড়তাম।

থতমত খেয়ে তাকালেন। ছেলেরাও এমন উক্তি শুনে অবাক একটু।

হেসে বললাম, আমি সাদামাটা লেখক, এমন অতিথিপরায়ণতার ধারে কাছে যেতে পারতাম না।

হেসে ফেললেন। দুই ছেলেও। অবন্তী বললেন, আপনার সঙ্গে কথায় পারব কেন। পাঁচ সাত মিনিট বসুন, মেয়েগুলো হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে, একবার দেখে আসি—

দরজার দিকে এগোবার আগে নকুল বলল, রাত তো খুব বেশি হয়নি, আজ আমরাও চলি মা···কাল বিকেলে তোমাদের ওপেনিং ফাংশন, সকালে একবার আসব না হয়···

কালো মুখের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল একটু। দুই ভাইয়ের মুখের দিকেই একবার তাকালেন।—আজ এখানেই থেকে যাবে বউমাদের বলে আসতে বলেছিলাম, বলে আসা হয়নি?

এটুকুতেই ব্যস্ত হয়ে নকুল জবাব দিল, রাত বেশি হলে আর ফিরব না বলে এসেছি, সবে তো দশটা এখন, বিশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

—দশটা এখানে অনেক রাত, যেতে হবে না, রাস্তায় ডাকাত-টাকাত পড়তে পারে—

হাসি চেপে প্রস্থান করলেন। এখন মনে পড়ল, গাড়িতে বাড়ির বাসিন্দাদের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে ছেলেরাও থাকে মহিলা এ-কথা বলেননি। হালকা অনুযোগের সুরে সহদেব দাদাকে বলল, বাড়িতে একটা ফোন করে দিও, মায়ের হুকুমের নড়চড় হবে না জানোই তো, কেন বলতে গেলে।

হাসি মুখে নকুল আমার দিকে ফিরে বলল, মায়ের এই গোছের

হুকুম আর মিষ্টি বকুনি শুনতেও আমাদের খুব ভালো লাগে···।

ভালো লাগল। হেসেই জবাব দিলাম, তোমরা মায়ের যোগ্য ছেলে এটুকু বুঝছি।

ছুই ভাইয়ের মধ্যে এই বড়টিই বেশি মনখোলা মনে হল। একটু গাঢ় স্বরে তক্ষুনি বলে বসল, আমরা যোগ্য ছিলাম না, এখন যতটা পারি যোগ্য হতে চেষ্টা করছি···আমাদের গুরুদেবের আশীর্বাদে মা-কে চিনেছি, নইলে কত বড় ভুল নিয়েই না বসেছিলাম। এখন মনে হয় অনেক ভাগ্যের জোরে এমন মা পেয়েছি—

—দাদা, সহদেবের বিব্রত মুখ, উনি সবে এলেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না, মাঝখান থেকে অবাক হচ্ছেন—

নকুল হাসতে লাগল, তারপর ঈষৎ উৎসুক, চোখে আবার তাকালো।—আচ্ছা, আপনিও তো এই প্রথম দেখলেন, এরই মধ্যে আমাদের মা-কে আপনার ভালো লাগেনি?

বিশ্বাসযোগ্যভাবেই জবাব দিলাম, খুব।

ঘরে একটাই মস্ত ছবি টাঙানো আগেই চোখে পড়েছে। তক্ষুনি মনে হয়েছে ছবির ভদ্রলোক এই ছুই ছেলের বাবা। চুল খুব ছোট করে ছাঁটা হলেও মুখের আদল মেলে। এখন ভা লক্ষ্য করতে মনে হল, ছবির চোখ বা চাউনি আদৌ মেলে না রকম পাথুরে চোখ আর অনড় চাউনি।

ফোটোর দিকে মনোযোগ দেখে সহদেব জানান দিল, আমাদে বাবা, আট বছর হল মারা গেছেন।

মুখ দিয়ে প্রশ্নটা আপনি বেরিয়ে এলো, তোমাদের নিজের মা নেই?

—নিজের মা আমাদের ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন।

নকুল হাসিমুখে জানান দিল, এই মা আমার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের আর সহদেবের থেকে আট বছরের বড়—বাবার একটু বেশি বয়সে আমাদের ঘরে এসেছেন।

বিস্তারের দরকার ছিল না, এটুকু সহজ অনুমানসাপেক্ষ। গাড়ির বাক্যালাপ মনে পড়তে জিগ্যেস করলাম, বাবা বেঁচে থাকতেই তোমাদের

আলাদা ব্যবসা, না আগে থেকে ?

—অনেক আগে থেকে। বাবা বেঁচে থাকতেই আমাদের দু' ভাইয়ের আলাদা আলাদা ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছল—অবশ্য বাবার জন্যই সেটা হয়েছিল···বাবার ব্যবসা এখন শুধু মায়ের।

হাসি মুখে সহদেবই এবার মায়ের প্রশস্তি গাইলো।—মা কিন্তু গাড়িতে তখন আপনাকে খুব সত্যি কথা বলেননি···মায়ের ব্যবসা আমরা দেখি বটে, কিন্তু উনি রোজই একবার না একবার গদিতে যান, আর অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু দেখেন তাই যথেষ্ট। মা কত সহজে সব বুঝে নিতে পারেন ভাবতে পারবেন না, সংকটে পড়লে নিজেদের ব্যবসার জন্যও এখন আমরা মায়ের পরামর্শ নিই।

ঘরে ঢুকে হাসি মুখে অবন্তী পাণ্ডে বললেন, মায়ের পাবলিসিটি হচ্ছে বুঝি ?

আমি তাঁর দিকে তাকিয়েও ঠিক খেয়াল করিনি, বেশবাস বদলে হয়নি;ছেন আর মুখখানা একটু ভেজা ভেজা এটুকুই কেবল লক্ষ্য ফ:ংশন ছি। কিন্তু নকুল পাণ্ডে তাঁর দিকে চেয়েই আঁতকে উঠল, মা তুমি কা:ণ্ডায় চান করে এলে ?

দিকেই এ্যাঢ় চোখে আমি আবার তাকালাম। হ্যাঁ, চান করা মুখই মনে বলে আসরনে চওড়া নীল পাড়ের পাতলা শাড়ি, পাতলা চাদরের ফাঁকে এলাম গায়েও অন্য ব্লাউস, আর এক-হাত প্রমাণ চুল পিঠে ছড়ানো নলজ্জা পেয়ে বললেন, বন্ধ বাথরুমে তপতপে গরম জলে চান করেছি তাতে আর কি হয়েছে—আমার অত ঠাণ্ডা টাণ্ডা লাগে না। আপনাকে দেরি করিয়ে দিলাম, উঠুন এবারে—

অভিযোগের স্বরে নকুল বলল, দেখে রাখুন, যখন তখন চান করাটা মায়ের একটা প্যাশান

দুই ছেলের সঙ্গে বৈঠকখানার ভিতর দিয়ে ছোট একটু প্যাসেজ পেরিয়ে পুরু শৌখিন পর্দা সরিয়ে যে ঘরটায় নিয়ে এলেন সেটাই আমার জন্য নির্দিষ্ট। বৈঠকখানার হলঘরের মতো অত না হলেও মস্ত বড় ঘরই। ঝকঝকে টাইলের মেঝে। কোণের দিকে দেয়াল-ঘেঁষা চকচকে খাটে পরিপাটি বিছানা করা, পায়ের কাছে দুটো বিলিতি কম্বল ভাঁজ

করা, খাটের চার ডানায় ধপধপে সাদা নেটের মশারি গোটানো, পাশে ছোট্ট টেবিলের ওপর বেডল্যাম্প। খাটের মাথার দিকের বসবার বড একটা গদি-মোড়া ইজি-চেয়ার পাতা। ঘরের মাঝামাঝি একটা চকচকে টেবিলের দু'দিকে দুটো শৌখিন চেয়ার। টেবিলের ওপর হালকা কারুকার্য করা বড় ভাসে মস্ত একটা টাটকা ফুলের তোড়া। দুদিকের দেয়ালে ফ্রেমে আঁটা এক-জোড়া করে টিউব লাইটের আলোয় ঘর দিনের মত সাদা। মাথার ওপর চকচকে পাখাও ঝুলছে একটা, তবে এই শীতে ওটা বাড়তি জিনিস। সামনে অ্যাটাচড বাথ।

দুচোখ পরিতৃপ্ত এবং মন খুশি হবার মতোই ব্যবস্থা। ঘর পর্যবেক্ষণ শেষ হতে হোস্টেস আন্তরিক আগ্রহে জিগ্যেস করলেন, আর কিছু লাগলে বলবেন···অসুবিধে হবে না তো?

হেসে বললাম, একটু হবে বোধহয়, এত আরামে অভ্যস্ত নই।

হাসলেন উনিও।—একথা বলে আর এক মহিলার নিন্দা করবেন না, আপনার স্ত্রী আপনাকে কম আরামে রাখেন বলতে চান?

আঙুল তুলে অ্যাটাচ্‌ড বাথ দেখিয়ে বললেন, মুখ-হাতে জল দিয়ে চেঞ্জ করে নিন, তোয়ালে টোয়ালে সব ওখানেই পাবেন, শাওয়ার আর বেসিন ট্যাপে ঠাণ্ডা গরম দু'রকম জলের ব্যবস্থাই আছে, অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, ঠাণ্ডা জল ছোঁবেনও না—

আলতো করে বড় ছেলে নকুল পাণ্ডে বলল, কেন, গরম জল যখন আছে একটু চানও তো করে নিলে পাবেন···

রাগ দেখাতে গিয়েও মহিলা হেসে ফেললেন, দেখলেন? ওরা আমার সঙ্গে এই রকম করে—যান, আপনি আর দেরি করবেন না, রান্নার লোকটা আবার নিজের কি বিদ্যে ফলাচ্ছে দেখে আসি। যেতে গিয়েও ছেলেদের দিকে চেয়ে থামলেন, তোমাদের চা পাঠিয়ে দেব?

মুখখানা নিরীহ গোছের করে সহদেব জবাব দিল, তুমি হুকুম করলে এঁকেও সঙ্গ দিতে পারি—

—খুব যে! চকিত ভ্রূকুটি, তার পরেই প্রস্থান।

ব্যাপারটা আমার ঠিক বোধগম্য হল না। ওদের দিকে তাকাতে নকুল হাসতে হাসতে বলল, ও কিছু না, আপনি সেরে আসুন, আমরা

বসার ঘরে আছি—

···যত বড় লোকই হোক, মহিলাটি আর এই দুই ছেলেরও অন্তরঙ্গ হবার মতো সহজ গুণটুকু আছে তাতে সন্দেহ নেই। এটুকু সময়ের মধ্যেই আমার সংকোচ অনেকটা কেটে গেছে।

বাথরুম দেখেও খুশি। বেশ বড়সড়, ঝকঝকে। ঢোকার পর বেরুতে মিনিট পনেরো লেগে গেল। কনকনে শীত হলেও ট্রেনের লম্বা ধকলের পর সাবান আর গরম জলে মুখ হাত ধুয়ে গা মুছে ফেলতে বেশ ভালো' লাগল।

পাট-ভাঙা পাজামার ওপর পশমের গেঞ্জি আর গরম পাঞ্জাবি চড়িয়ে তারও ওপর শাল জড়িয়ে ঘর ছেড়ে আবার বৈঠকখানায় এলাম। হোস্টেস আর দুই ছেলের সামনে চায়ের খালি পেয়ালা। আমারও আসবে ধরে নিলাম, এ-সময়ে প্রথমে এক কাপ গরম চা মন্দ লাগবে না।

—আসুন, ইউ আর রিয়েল ফ্রেশ নাও। নকুল পাণ্ডের আপ্যায়ন এবং মন্তব্য।

আমাকে দেখেই অপ্রস্তুতের মতো অবন্তী উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, এই যাঃ একেবারে ভুলে গেছি! আমার যা মন হয়েছে না—

কেউই ভুলের হদিস পেলাম না। সহদেব জিগ্যেস করল, কি হল?

সখেদে জবাব দিলেন, ওঁর ব্যাপারে আমার আতিথ্য বাতিল করতে বীরেশ্বরবাবু তো আর কম চেষ্টা করেননি। বলেছিলেন, পাজামা-টামাতে ওঁর সুবিধে হয় না, বাড়িতে লুংগি পরা অভ্যেস, তাই শুনে আমি সুন্দর এক জোড়া লুংগি কিনে ধুইয়ে ইস্তিরি করিয়ে রেখে দিয়েছি অথচ মুখ-হাত ধুয়ে চেঞ্জ করে নিতে বলার সময়েও আর মনে পড়ল না।—

দুই ছেলে হাসছে। আমি গম্ভীর।—খুব অন্যায় রকমের ভুল, রাতে শোবার আগে পাঠিয়ে দেবেন।

—তা তো দেবই। তারপরেই হাসলেন একটু, একবার নজর করে দেখে মন্তব্য করলেন, পাজামাতেই আপনাকে কিন্তু বেশ ভালো

দেখাচ্ছে, লুংগিটা কিরকম যেন—

তক্ষুনি আবার বললাম, তাহলে আর পাঠাবেন না।

দুই ভাইয়ের হাসি মুখ। নকুল বলল, একটু আগেই মা বলছিলেন আপনার আসল গুণ হল সব লেখার মধ্যেই মানুষের জন্য আপনার খুব দরদ, কিন্তু আমরা দেখছি আপনি বেশ মজার মানুষ।

তার দিকে তাকালাম।—অনেকটা বেবুনের মতো বুঝি?

ওরা জোরেই হেসে উঠল।—ছি ছি, তা কেন—

অবন্তীও হাসছেন। বললেন, শুনুন, আমার রীতি হল সংকোচের ব্যাপার সরাসরি কাটিয়ে দেওয়া—আপনাকে আমার এখানে রাখার ব্যাপারে বীরেশ্বরবাবুর আরো আপত্তি ছিল কারণ, আপনার নাকি রাতে একটু আধটু ড্রিংক করার অভ্যাস আছে আর এই কড়া শীতে আপনার দরকারও নাকি—তাই ছেলেদের বলেছিলাম একটা ভালো কিছু এনে রাখতে—এনেছেও, আপনি কিছুমাত্র সংকোচ করবেন না, এখানেই দিতে বলব, না আপনার ঘরে গিয়ে আরাম করে বিছানায় বসে খাবেন?

আমি ধুপ করে একটা সোফায় বসে পড়লাম। খানিক আগে ছেলেদের জন্য অবন্তীর চা পাঠানোর প্রসঙ্গে নিরীহ মুখে সহদেব বলেছিল, তুমি হুকুম করলে এঁকেও সঙ্গ দিতে পারি। খুব যে বলে অবন্তী ভ্রূকুটি করে চলে গেছলেন। এতক্ষণে রসিকতার মর্ম বোঝা গেল। হতাশ সুরে বললাম, বীরেশ্বর হতভাগা আর কতভাবে আপনার কাছে আমাকে পথে বসিয়ে রেখেছে বলুন তো?

—তা কেন, উনি ভারি খোলা মনের মানুষ আর আপনাকে ভালও বাসেন খুব, আমি নেহাত নাছোড় বলেই আপনাকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আসছি—

চলে গেলেন। মিনিট তিন-চারের মধ্যে আমার জন্য নির্দিষ্ট সেই খাস ভৃত্য রামের আবির্ভাব। প্রথমে ট্রেতে একটা গেলাস আর এক জাগ জল রেখে গেল। তারপর একটা বিলিতি বোতলের প্যাকেট রেখে দ্রুত প্রস্থান করল।

কড়া শীতে লোভনীয় বস্তুই বটে। তবু বেশ বিব্রত বোধ করছি।

বললাম, এ-জিনিস এখানে পেলে কোথায়—আর অনেক দামও তো নিশ্চয়।

সহদেব খুশি মুখে জবাব দিল, জিনিসটা পেয়ে গেলাম এতেই আনন্দ, দামের জন্য কি আছে—মায়ের তবু চিন্তা আপনার পছন্দ হবে কিনা।

সোৎসাহে উঠে প্যাকেট থেকে বোতলটা বের করে মুখ খুলে নিজের আন্দাজ মতো অর্থাৎ পরিমিত মাপে গেলাসে ঢেলে জিগ্যেস করল, ঠিক আছে?

মাথা নাড়লাম, ঠিক আছে।

গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতে সহদেব বলল, মনে করে দুটো সোডাও এনে রাখলে হত, অসুবিধে হবে না তো?

হেসেই জবাব দিলাম, আমার অসুবিধের ঠেলা সামলাতে গিয়ে তোমাদেরই কম অসুবিধে হচ্ছে না, এরপর আর অসুবিধের কথা বোলো না। গেলাস তুলে নিয়ে দু'জনের দিকেই তাকালাম।—তোমাদেরও একটু-আধটু চলে তো বলো, ও-ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসলেই তোমাদের মা বুঝতে পারবেন।

নকুল জোরেই হেসে উঠল।—আমাদের চললে এই মা-কে আড়াল করার দরকার হত না।—বাবার এ-জিনিস এমন ভীষণভাবে চলত যে গুরুদেব ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কড়া শাসনে এর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

নিজের অগোচরে আমি দেয়ালের ওই মস্ত ফোটোর দিকে তাকালাম। অনড় পাথুরে চাউনি। বললাম দ্যাখো দেখি, তোমাদের মা বাধ্য হয়ে এ-সবের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু মনে মনে কি না জানি ভাবছেন, আমার না হলে চলে না এমন নয়—

মজা পাওয়ার সুরে সহদেব বলল, মায়ের তাহলে আপনি কিছুই জানেন না—বিদেশে থাকতে এ-সব মা এত দেখেছেন যে এ-জিনিস তাঁর কাছে জল-ভাত ব্যাপার—মা কিছুই ভাবছেন না।

আমি উৎসুক।—বিদেশে থাকতে মানে?

—মা তো সাত বছর ফ্রান্স-এ ছিলেন, তার মধ্যে লণ্ডন সুইজারল্যা

স্পেন ওয়েস্ট জার্মানিও ঘুরেছেন।

জিগ্যেস করলাম, বিয়ের আগে না পরে?

—অনেক আগে, এ-সব তো আমরাও বাবা মারা যাবার পরে জেনেছি। মা নিজের সম্পর্কে কাউকে কখনো কিছু বলেন না, উনি এত দেশ ঘুরেছেন, তাঁর এত বিদ্যেবুদ্ধি এ কি আমরাই জানতাম—গুরুদেবের কথা শুনে পরে খুঁচিয়ে সব বার করেছি—গুরুদেব বলেন মা একাধারে শক্তি আবার লক্ষ্মী সরস্বতীও।

দুই ছেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছি। বিশ্বাস করতে ভালো লাগছে।—এদের গাড়িতে ওঠার আগে বীরেশ্বর ঘোষাল আমার মাথাটা টেনে কানে কানে বলেছিল, এখন যতোই রাগ করো তোমার শেষ ধন্যবাদ আমারই পাওনা হবে—এ-ও কেন যেন আর কথার কথা মনে হচ্ছে না।

মিনিট পনেরর মধ্যে অবন্তী এলেন, পিছনে আবার ট্রে হাতে রাম। সেটা রাখতে দেখা গেল তিনটে ডিশে বড় বড় দুটো করে কাবাব। ধোঁয়া উঠছে। মহিলার রুচিবোধের পুনরুক্তি থাক। বললেন, খানিক বাদেই ডিনারে বসবেন, তাই বেশি দিলাম না।

নকুল আর সহদেব খুশি হয়ে যে যার ডিশ তুলে নিল। নকুল বলল, দেখলেন, কোন্ জিনিসের সঙ্গে কি চলে মা ঠিক জানেন, এসব ওঁর নিজের হাতের তৈরি। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে সহদেব মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে তুমি নিশ্চয় ফ্রান্সের কোনো বড় রেস্তরাঁয় রাঁধুনিগিরি করেছ—

ঈষৎ চকিত গলায় অবন্তী বললেন, আবার এসব কথা কেন!

আমার কেমন মনে হল, এ-প্রসঙ্গ মনঃপূত নয়। সহদেব এ প্রসঙ্গের কারণ ব্যক্ত করল।—ড্রিংকের ব্যবস্থা করতে হয়েছে দেখে তোমার কথা ভেবে উনি লজ্জা পাচ্ছিলেন, তাই আমি বললাম বিদেশে থাকতে এসব মা এত দেখেছেন যে এ জিনিস তাঁর কাছে জল-ভাত ব্যাপার।

—সবেতে বিদেশের ঘাড়ে দোষ চাপাও কেন, তোমাদের বাড়িতেও এই ব্যাপার কম দেখেছি? বেশ গম্ভীর, নাকের হীরে এখন জ্বলজ্বল

করছে মনে হল না।

দুই ভাইই অপ্রস্তুত একটু। সেটা নিশ্চয় ওদের মায়ের এই কথার কারণে নয়, বাবার বেশি মাত্রায় মদ চলত তা একটু আগে নিজেরাই বলেছে।

২

রাতে বিছানায় গা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। ট্রেনের ক্লান্তি আর শীতের তাড়না দূর করার মতো রসদ মিলেছে, পরের ভোজন পর্বটিও চমৎকার হয়েছে। অতএব নিদ্রাদেবী তো চোখের পাতায় বসে। তবু এত সাধের ঘুম আসতে কিছু দেরি হল। মনের তলায় কৌতূহলের আঁচড় পড়েছে। পড়ছে।···কথা শুনলে ভদ্রমহিলাকে বাঙালী ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না, বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তেমনি অনুরাগ, কিন্তু সুশ্রী কালো মুখের আদল ঠিক বাঙালী মেয়ের মতো নয়।···সাত-সাতটা বছর, যত দূর মনে হয় যৌবনের সেরা কালটুকুই ফ্রান্সে কেটেছে—কিন্তু কেন বা কার কাছে? বাবা বা আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে হলে বিদেশের প্রসঙ্গ চটপট ধামাচাপা দিলেন কেন···আর ওই আলোচনার ফলে ছেলেদের ওপরেও একটু বিরক্তভাব দেখলাম মনে হল কেন? সাত বছর ফ্রান্সে থাকা মেয়ে বেনারসে এসে বিয়ে করলেন বয়স্ক দুই সন্তানের বাপ বিপত্নীক এক প্রৌঢ়কে, এ-ই বা কেমন কথা! বেনারসী শাড়ির বড় কারবারী হিসেবে ওই ভদ্রলোকের যত টাকাই থাক সাহিত্য বা সংস্কৃতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ আছে বলে তো মনে হয় না।···তাহলে টাকার লোভে এই বিয়ে? বড়লোকের গৃহিণী হবার লোভে?

আর একটা কথা মনে পড়তে ঘুম চটে যাবার দাখিল।··নকুল বলেছিল মায়ের মিষ্টি হুকুম আর বকুনি শুনতে তাদের ভালো লাগে। জবাবে আমি ওদেরও একটু প্রশংসা করেছিলাম, বলেছিলাম, তোমরাও মায়ের যোগ্য ছেলে। তাই শুনে একটু গাঢ় গলায় ওই ছেলে যেন নিজেদের ত্রুটি স্খালনের চেষ্টা করেছিল। তার কথাগুলো হুবহু মনে পড়ল। বলেছিল, আমরা যোগ্য ছিলাম না, এখন যতটা পারি যোগ্য হতে চেষ্টা করছি···আমাদের গুরুদেবের আশীর্বাদে মা-কে চিনেছি, এখন

মনে হয় অনেক ভাগ্যের জোরে এমন মা পেয়েছি। এমন উক্তি নিছক ভাবাবেগের মাতৃস্তুতি হতে পারে না। এই উক্তি মহিলার এখানকার অর্থাৎ বারাণসীর পারিবারিক জীবনে কিছু সংঘাতের আভাস দেয়। এই দুই ছেলেও মা-কে ভুল বুঝেছিল এটুকু অন্তত স্পষ্ট।

খুব সকালেই ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ তাই প্রথমে ভেবেছিলাম রাত। হাত ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে পাঁচটা। মনে হল তন্দ্রার মধ্যে কিছু বাজনা-টাজনার শব্দ কানে আসছিল।• কান পাতলাম, ঠিকই শুনছি। দূরে কোথাও তবলা করতাল গোছের কিছু বাজছে। আর মিলিত গলার গানও ভেসে আসছে। আর একটু সজাগ হতে মনে হল আশপাশে বাড়ি নেই, গানবাজনা তাহলে এ-বাড়িতেই হচ্ছে। আরো একটু মনোনিবেশ করে বুঝলাম, তাই। ভোরের শীতে কম্বলের তলা থেকে বার হতে ইচ্ছে করছিল না। তবু মায়া কাটিয়ে উঠে পড়লাম। সোয়েটারের ওপর লম্বা শীতের কোর্তা চাপিয়ে দরজা খুলতেই গানের শব্দ আরো স্পষ্ট হল। এগিয়ে গেলাম। বৈঠকখানার ভিতর দিয়ে নিচে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। গানের শব্দ দোতলা থেকেই আসছে। অনেকগুলো মেয়ে একসঙ্গে ভোরের প্রার্থনা সংগীত গাইছে। বেশির ভাগই কচি গলা। সঙ্গে তবলা আর করতাল বাজছে।

কান পাতলে শুনতে মন্দ নয় হয়তো, কিন্তু আবার গিয়ে কম্বলের তলায় ঢোকার ইচ্ছেটাই বেশি। তাই করলাম। কিন্তু ফের শয্যা নিয়েও ঘুম আর এলো না। তাছাড়া জানালা দুটো খুলে দিয়েও ভুল করেছি। নেটের মশারির ভিতর দিয়ে বারাণসীর ভোরের আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

একটু বাদে একটা গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ কানে এলো। নকুল আর সহদেব চলে গেল মনে হয়। সেই রকমই কথা ছিল। খুব ভোরে উঠে চলে যাবে বলেছিল।

বাইরে চাকরবাকর বা দারোয়ানদের কথাবার্তা কানে আসছে। উঠেই পড়লাম। পুলোভারটা গায়েই ছিল। তপতপে গরম জলে বেশ করে মুখ-হাত ধুয়ে একেবারে শেভিং সেরে এসে লম্বা গরম কোটটা

কের গায়ে চড়ালাম। আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াতেই আমার দু চোখ স্থির একটু। ভালো লাগার কথা, ভাল লাগছেও, কিন্তু এই সকালের ঠাণ্ডায় এটুকু প্রত্যাশিত নয়।

সুন্দর একটা বেতের সাজি হাতে অবন্তী বাগানে ফুল তুলছেন। খালি পা। পরনে সাদার ওপর সাদা ডুরের পাতলা শাড়ি। গায়ের সাদা ব্লাউজটাও গরম মনে হল না। গরম চাদরটাদরেরও বালাই নেই। খোলা আর্দ্র চুল পিঠে ছড়ানো। দেখলেই বোঝা যায় স্নান সারা। গাছ দেখছেন, ধীরেসুস্থে বেছে বেছে ফুল তুলছেন। আমি অপলক চেয়ে আছি। কালো পাথরে খোদা সচল মূর্তির মতো লাগছে। কটিতল কটিদেশ পেট বুক গলা সবই যেন স্রষ্টার হিসেবী মনোযোগে গড়া। ধীরে হাঁটা বা ঝুঁকে ফুল তোলার সময়েও ওই দেহসম্ভারে নিঃশব্দ সাড়া জাগে লক্ষ্য করছি।

বেরিয়ে এলাম। কাছাকাছি আসতেও টের পেলেন না।

—সুপ্রভাত।

চকিতে ফিরলেন। হাসলেন। দিনের আলোয় নাকের হীরে অত ঝলসায় না, তবু আগের ভাগে চোখে পড়ে।

—সুপ্রভাত।···আপনার প্রভাত এত সকালে হয় নাকি, কখন উঠেছেন?

—অনেকক্ষণ। সিঁড়ির কাছে এসে আপনার মেয়েদের প্রভাত-বন্দনা শুনলাম।

—তাই নাকি! ওপরে উঠে এলেন না কেন? থমকালেন।—ওদের গানের চোটে আপনার ঘুম ভেঙে যায়নি তো?

—না, আমার ববাত ভালো, এখন এই দৃশ্য দেখব বলেই হয়তো ঘুমটা ভেঙেছিল।

না বুঝে তাকালেন, কোন্ দৃশ্য? তারপরেই হেসে ফেললেন, ও ·· ভারী তো দৃশ্য।

—আচ্ছা, আপনার শীত বলে কি সত্যি কিছু নেই নাকি? কাল রাত দশটায় চান আবার এই ভোরেও চান! ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে একটা গরম চাদরও গায়ে নেই···

হেসে বললেন, শীতের সকালে গরম জলে বেশ করে চান করতে কত আরাম আপনি জানেন না তাহলে, চানের পর আর শীতটীতও করে না।

—এ তো জানতাম না·· তাহলে আমিও গিয়ে এক্ষুনি ও-পাট সেরে ফেলে আরামের ভাগীদার হই ?

—না না! আপনার অভ্যেস নেই, সহ্য হবে না। তারপর হাসতে লাগলেন।—দেখুন যে-দেশে আমি সাত-সাতটা বছর কাটিয়েছি সেখানে আমি আর কিছু শিখি না শিখি শীত সহ্য করার বিদ্যেটা খুব ভালই রপ্ত করেছি।

···কাল ছেলেদের মুখে মায়ের বিদেশে থাকার প্রসঙ্গে বিরক্ত হতে দেখেছি, আজ নিজেই তুললেন।

···ফ্রান্স?

···হ্যাঁ।

·· আপনার কোন্ বয়সে ছিলেন সেখানে ?

কালো টানা চোখ মুখের ওপর থমকালো একটু।—চব্বিশ থেকে প্রায় একত্রিশ···

একটু ইতস্তত করে বললাম, কৌতূহল অশোভন হচ্ছে কিনা জানি না···ফ্রান্সে সাত বছর কি সুবাদে ছিলেন ?

বিরক্তি বা দ্বিধার ছিটেফোঁটাও দেখলাম না। সোজা চোখে চোখ রেখে অল্প অল্প হাসছেন। হালকা জবাব দিলেন, অদৃষ্টে ছিল সেই সুবাদে ছিলাম।···এটুকু কৌতূহল না থাকলে আপনি আর এতবড় লেখক কেন। এবারের হাসিতে সাদা দাঁতের সারি ঝিকমিক করে উঠল, বললেন, আপনার কৌতূহলের অধিকার আর আমার জবাব দেবার বা না দেবার অধিকার—তা বলে আপনার কৌতূহল অশোভন ভাবতে যাব কেন, যা মনে আসে জিগ্যেস করবেন, কেবল ছেলেদের সামনে নয়, ওরা ভাবে ওদের মা মস্ত কলাবিশারদ হবার জন্যই সাত সাতটা বছর ও-দেশে কাটিয়ে এসেছে—ফাঁক পেলেই ওখানকার গল্প শোনার জন্য খোঁচায়। চলুন, অত ভোরে উঠেছেন, অনেক আগেই আপনার চা পাওয়া উচিত ছিল—

এই আলাপের বিরতি কাম্য ছিল না। আপত্তি না করে সঙ্গ নিলাম।

বাড়িতে ঢুকে রামকে চায়ের আয়োজন করতে বলে আমার দিকে ফিরলেন।—দোতলায় চলুন, আমার মেয়েদের দেখাই।

উনি সাজি হাতে আগে আগে উঠছেন, আমি পিছনে। অবাধ্য চোখ দুটোকে শাসনে বাঁধার চেষ্টা আমার, যদিও আপ্ত বাক্যের ওজর তুলে 'এ থিং অফ বিউটি'কে 'জয় ফর এভার'-এ টেনে নিয়ে চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে দিতে পারি।

দোতলার তিন সিঁড়ি আগে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেয়ালে কোনো সাধকের মস্ত একটা ফোটো।···অবন্তী আগে উঠে এগিয়ে গিয়ে ফোটোর সামনে সাজিসুদ্ধ দুহাত জোড় করে প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মাথা নুইয়ে প্রণাম করে ফিরলেন। ছবির দিকে আমার দৃষ্টি সংবদ্ধ দেখে বললেন, আমার গুরুদেব—

এই পরিবারের গুরুদেবের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে আঁচ করতে পারি। গত রাতে নকুল আর সহদেব এঁরই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিল। ভালো করে দেখলাম। দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ পুরুষ, সাদা থান ধুতি দোপাট করে লুঙ্গির মতো করে পরা, অনাবৃত শরীরের এক কাঁধে ভাঁজ-করা সাদা চাদর, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। বুদ্ধিদীপ্ত হাসি-ছোঁয়া আয়ত-পক্ষ্ম জীবন্ত চোখ। ঠোঁটে মুখে চাউনিতে কাঁচা মিষ্টি হাসি। এঁদের বয়স আঁচ করা শক্ত, তবু কোনো মতেই ষাটের বেশি মনে হয় না।

জিগ্যেস করলাম উনি আছেন?

সসম্ভ্রমে জবাব দিলেন, আছেন বইকি, কিন্তু কোথায় তা জানি না। আজকালের মধ্যেও দেখা পেতে পারি, আবার দু'তিন বছরের মধ্যেও না পেতে পারি।

—কি নাম?

—ভক্তরা ওঁকে ব্রহ্মমহারাজ বলে ডাকেন, এই পরিবারের উনি ব্রহ্মগুরু···পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরেছেন, নকুল সহদেবের ঠাকুরদা ওঁর কৃপা পেয়েছিলেন, আমরাও পাচ্ছি।

শুনে একটু অবাক আমি, বললাম, কিন্তু এঁর বয়স তো বেশি মনে হয় না ?

—এই ছবি দেখে বয়েস ঠাওর করতে পারবেন না, এটা ষাট বাষট্টি বছর বয়েসের ফোটো, এর পর থেকে তিনি আর কাউকে ফোটো তুলতে দেননি, এখন তাঁর বয়েস আশির ওপরে হবে, কিন্তু এখনো অনেকটা এইরকমই মজবুত আর তাজা আছেন ।···আমার জীবনে উনি মস্ত আশীর্বাদ ।

গুরুদেবের প্রসঙ্গে গত রাতে নকুল সহদেবেরও খুব ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব দেখেছি। কিন্তু এই মহিলার কেবল ভক্তিশ্রদ্ধা নয়, দুই চোখে যেন সমর্পণ দেখছি।

এ-দিক ও-দিক থেকে তিন-চারটে মেয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বয়েস ন' দশ থেকে তের-চৌদ্দর মধ্যে। একজনের হাতে ফুলের সাজি দিয়ে বললেন, সকলকে ডেকে নিয়ে আমার ঘরে আয়। আমাকে ডাকলেন আসুন—

তাঁর ঘর বলতে শুধুই ঘর একটা। মস্ত বড়। শৌখিন টাইলের তকতকে মেঝে। খাট চৌকি বিছানা এমন কি কোনো আসবাব পত্র পর্যন্ত নেই। দেয়াল-তাকের থেকে একটা আসন এনে মেঝেতে পেতে দিলেন।

—বসুন।

বসতে ইচ্ছে করল না। খালি পায়ে ঘরটার এ-মাথা ও-মাথা করলাম একবার। স্যাণ্ডেল জোড়া সিঁড়ির কাছেই ছেড়ে এসেছি।

মেয়েরা সব এলো। তাদের মায়ের ইশারায় আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। আমি গুণে দেখলাম ষোলটি মেয়ে। বয়েস সাতের থেকে চৌদ্দ পনেরর মধ্যে। লক্ষ্য করলাম, পাঁচ ছ'টি মেয়েকে অন্তত বাঙালী মনে হল না। ছোটদের পরনে ফ্রক, বড়দের স্কার্ট-ব্লাউস, সকলেরই গায়ে একই রঙের আর রকমের পুরো হাতের গরম জামা। খুশি হয়ে বললাম, সকালে তোমাদের গান শুনেছি, তোমরা লেখা-পড়াও করো তো ?

বড় দু তিনটি মেয়ে জবাব দিল, আমরা সবাই স্কুলে পড়ি।

—স্কুল কত দূরে, যাতায়াত করো কি করে ?

এবারে বড় একজন জবাব দিল, মা আমাদের জন্য একটা বাস ঠিক করে দিয়েছেন, নিয়ে যায় আর দিয়ে যায়।

উৎসাহের সুরে মহিলা বললেন, আর কি করিস তোরা বল্—ইনি একজন মস্ত লোক, বড় হয়ে জানবি।

সেই মেয়েটিই জবাব দিল, আর আমরা গান করি, সেলাই শিখি, আঁকা শিখি—

—হয়ে গেল ? তোদের ঘর ঝাট-পাট করে পরিষ্কার রাখা জামা-কাপড় কাচা ইস্তিরি করা—এসব কে করে ?

মায়ের কথায় লজ্জা পেয়ে কয়েকজন সমস্বরে জবাব দিল, আমরাই করি। একটু আধটু রাঁধিও।

যেতে বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এবার হাত জোড় করে নমস্কার করে একসঙ্গে চলে গেল। সত্যিই ভারী ভালো লাগছিল। আমার মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে এলো, আশ্রম করে ফেলেছেন দেখছি, এত মেয়ে পেলেন কোথায় ?

হেসে জবাব দিলেন, আমার গুরুদেবের উপহার, একটি দুটি করে এনে হাজির করেন, বলেন, এই তোমার আরো মেয়ে, মানুষ করো··· গুরুদেব আমাকে এই সাধনার দিকে ঠেলেছেন।

একটু বাদে একসঙ্গে নেমে এলাম। ভিতরে একটা অকারণ আনন্দ গোছের অনুভূতি। সাত বছর ফ্রান্সে থাকো মহিলার ফিরে এসে এত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও যদি এই রূপান্তর হয়, তাহলে ওই গুরুদেবটিকে শক্তিমান পুরুষই বলতে হবে—কিন্তু মহিলার নিজস্ব কোনো প্রবণতা না থাকলে এমনটি হওয়া সম্ভব কি ?

প্রাতরাশের আয়োজনও কম কিছু নয়। ফল রুটি মাখন ডিম জেলি ছেড়ে বড় বড় দুটো মাংসের কাটলেটও আছে। আমি আঁতকে উঠলাম, সকালেই এই !

—শুরু করুন তো, যা পারেন খাবেন। নিজের জন্য এক পেয়ালা চা শুধু ঢেলে নিলেন।

—সে কি, আপনার এ-সব কিছু চলবে না ?

হেসে জবাব দিলেন, সকালে আমার বার দুই চা আর একবার কফি ছাড়া আর কিছুই চলে না।

গত রাতেই লক্ষ্য করেছি, আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসলেও ওঁর আহার নিরামিষ।

চায়ের পাট শেষ হতে বললেন, আপনার জন্য একটা গাড়ি মজুত, ইচ্ছে করলে বেড়িয়ে আসতে বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেন · একটায় লাঞ্চ করবেন তো ?

—যে পর্যন্ত চালালাম এখন তো মনে হচ্ছে লাঞ্চের আর দরকার হবে না · আপনি সকালে বেরুবেন না ?

মাথা নাড়লেন, আমি আজ সকালে আর না, একেবারে বিকেলের ওপেনিং সেরিমনিতে যাব, আপনি রেডি হোন, আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি—

শেষ পর্যন্ত আমারও আর বেরুতে ইচ্ছে করল না। বীরেশ্বর ঘোষালকে একটু একলা পাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার ওখানে দুটি রসিক অগ্রজ সাহিত্যিক মোতায়েন, আমাকে পেলেই ছেঁকে ধরবেন। তাছাড়া এই সন্ধ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অতিথি অভ্যর্থনা গান-বাজনা নাটকের ভিতর দিয়েই শেষ। কিন্তু কাল সকালের অধিবেশনে আমার কিছু গুরু-দায়িত্ব আছে। বর্তমান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি থেকে শ্লীলতা অশ্লীলতার উপসংহারে এসে পৌঁছুতে হবে। বাংলার কড়া অধ্যাপক হিসেবে বীরেশ্বর ঘোষালের পত্রাঘাত মনে আছে, লিখেছিল, তোমাদের আজকের সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার যমজ সৃষ্টির মৌসুম চলেছে। কদাকার রসও রস বটে, কিন্তু রসের গুণগত বৈষম্য সম্পর্কে তোমার বলিষ্ঠ বক্তব্য আশা করব। ভাবলাম, আজ রাতে আর সময় পাব না, কাল সকালেও না, তাই এখনই একটু প্রস্তুতি হিসেবে কিছু পয়েন্ট নোট করে রাখা দরকার।

বিকেলেও গাড়ি নিয়ে একলাই বেরুতে হল কারণ অবন্তী জানালেন, বাসটাকে বলে রাখা হয়েছে, প্রথম দিনের উৎসবে তাঁর মেয়েরাও যাবে, আর তাঁর সঙ্গে কিছু সরঞ্জাম যাবে। একেবারে উৎসব প্রাঙ্গণে এসে নামলাম।

অগ্রজ দুই সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা হতে তাঁরা এক-হাত নিলেন আমাকে। চিবিয়ে চিবিয়ে একজন বললেন, সকালে তোমাকে ঘোষালের বাড়িতে আশা করেছিলাম, এলে না মানেই বেশ মৌজে ছিলে বোঝা গেল।

অন্যজনও টিপ্পনী কাটলেন।

এঁদের নির্দোষ রসনায় ইন্ধন যোগানো নিরাপদ নয়। সরে পড়লাম। বীরেশ্বর ঘোষাল ব্যস্তসমস্ত। হবারই কথা। খানিক বাদে একটু সময়ের জন্য সে-ই আমার পাত্তা নিল। —কি ব্যাপার, তোমার হেপাজতে তো একটা গাড়ি থাকার কথা, সকালে তোমাকে খুব আশা করেছিলাম, এলে না তো?

বললাম, কালকের দায়িত্ব পালনের জন্য একটু ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ছিলাম—

—ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ছিলে? —চালাকি পেয়েছ? অবন্তীর আতিথ্য কেমন লাগছে আগে বলো—

—ভালোই। কিন্তু তোমার মতলবখানা কি, আমাকে ওঁর কাছে ঠেললে কেন?

—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছ নাকি! এ বয়সের একটি অভিজাত মহিলা তোমার মতো একজন সাহিত্যিককে কেন একান্তে পেতে চায় সে চিন্তা তোমার মাথায় আসেনি? ভদ্র-মহিলার জীবনে একটা মস্ত অতীত আছে এ বুঝতে পারছ না? তোমার সম্পর্কে তাঁর অনেকদিন ধরে বিশেষ আগ্রহ দেখছি, ভি. পিতে তোমার বই আনিয়ে আগে নিজে পড়ে তারপর লাইব্রেরিতে পাঠায়—সব নিজের খরচে। আমার ধারণা, সেই অতীত তাঁর কাছে একটা বোঝার মতো হয়ে উঠেছে, এই বোঝা তিনি হাল্‌কা করতে চান তাই মনের মতো একজন দরদী লেখক খুঁজছেন, এরপর শুধু রাজসিক আতিথ্য নিয়েই তোমাকে যদি বেনারস ছাড়তে হয় তো ধরে নেব তুমি তাঁকে হতাশ করেছ—তাঁর আস্থাভাজন হতে পারোনি।

বীরেশ্বরের একটা কথা আমার মগজে আটকে গেল। যে অনুভূতিটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসছিল কিন্তু সকালে সেই শব্দটা মাথায় আসছিল

না। ভদ্রমহিলার বড় রকমের একটা অতীত আছে। হ্যাঁ, গত সন্ধ্যা থেকে আজ এই পর্যন্ত তাঁকে দেখে এই একটা কথাই তাঁর সম্পর্কে খাটে, এমন এক অতীত আছে যা তাঁকে এই বর্তমানের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

জিগ্যেস করলাম, ভদ্রমহিলা চব্বিশ থেকে একত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত ফ্রান্সে কাটিয়ে এই বেনারসে এসে বড় বড় দু' ছেলের বাপ মাঝবয়সী এক বেনারসীওয়ালাকে বিয়ে করে বসলেন এ-ই বা কোন্ অতীতের ব্যাপার?

বীরেশ্বর সানন্দে আমার পিঠ চাপড়ে দিল, এক রাতের মধ্যে বেশ তো এগিয়েছ হে! আমরা গত চার পাঁচ বছরের মধ্যেও এর বেশি এগোতে পারিনি। ছাই ওড়াও—মাথা খাটিয়ে ছাই উড়িয়ে যাও, অমূল্য রতন ঠিক পেয়ে যাবে। এবার যাই, তোমরা এসে আমাদের কতখানি উদ্ধার করেছ ডায়েসে উঠে একথা তোমাদেরই ফলাও করে শোনাতে হবে, এখানে বোসো, পাশে একটা জায়গা রেখো, ফাঁক পেলেই আসছি। এগিয়ে গিয়েও কি মনে পড়তে আবার ঘুরল। —ভালো কথা, আমাদের সমাচার সেনশর্মার সঙ্গে তোমার এখনো দেখা হয়নি তো? তোমার খোঁজে আজ সকালে আমার বাড়ি এসেছিলেন, সন্ধ্যায় এলে এখানে দেখা হবে বলেছি।

সাগ্রহে জিগ্যেস করলাম, তিনি এখন মৌনী না সবাক?

—সবাক। ব্যস্ত পায়ে প্রস্থান।

বেনারসে আমার অন্তরঙ্গ দীর্ঘদিনের পরিচিত এই আর একটি চরিত্র। বলা বাহুল্য সমাচার সেনশর্মা তাঁর নাম নয়। নাম ফণীন্দ্র সেনশর্মা। কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গ যথা সময়ে।

কলকাতার অভ্যাগতদের প্রথম সারিতে বসানো হয়েছে।

ডায়াসের ড্রপসীন উঠল। সকলের উদ্দেশে অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভাপতি বীরেশ্বর ঘোষাল বিপুল হাততালির মধ্যে পঞ্চাশ বছর আগের প্রতিষ্ঠাতার বড় ফোটোতে মালা পরালো। চারদিকে এবং পিছনে তাকিয়ে দেখলাম বিশাল সভাঙ্গন সভ্য এবং স্থানীয় আমন্ত্রিতজনে ঠাসা। বীরেশ্বর ঘোষাল তার পরিমিত ভাষণে প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশ বছরের গৌরবের অধ্যায়ের কথা বলল, কিছু সরস স্মৃতিচারণ

করল, আর শেষে অনুষ্ঠা তাদের আন্তরিক আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কলকাতা তথা বাংলার যে-সব দিকপাল কবি সাহিত্যিকরা এখানকার সংস্কৃতি সভা উজ্জ্বল করতে এসেছেন তাঁদের উদ্দেশে যে ভাব আর ভাষায় অভ্যর্থনা এবং কৃতজ্ঞতা জানালো তার সারমর্ম তাঁদের পদার্পণে সংস্কৃতি-রসিক বারাণসীবাসীরা ধন্য।

ভাষণ শেষ হতে মাইকে পরের ঘোষণা শুনেই আমি উৎসুক। অভ্যাগতদের এবারে গান গেয়ে স্বাগত জানাবেন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট পেট্রন এবং লাইব্রেরি শাখার প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী অবন্তী পাণ্ডে।

না, উৎসুক কেবল আমি নই, চারদিক থেকে বিপুল এবং সাড়ম্বর করতালি শুনে বোঝা গেল মহিলার অনুরাগীর সংখ্যা এখানে কম নয়।

ভিতর থেকে একটি শুধু হারমোনিয়াম এলো। আর কোনো বাজনা নয়। তারপর অবন্তী পাণ্ডে এসে করজোড়ে সভাকে প্রণতি জানালেন। মনে পড়ল, স্টেশনে বীরেশ্বর বলেছিল বটে, এঁর আসল গুণের পরিচয় কাল মিলবে। এই গুণ তাহলে গান।

কান পাতলাম। চক্ষুও সজাগ প্রসারিত। মনে হল নাকের হীরের ছটায় ডায়াসের দিনের মতো সাদাটে আলোও মার খাচ্ছে। আমার ধারণা, সব দর্শকেরই দৃষ্টির অনেকখানি বোধহয় ওই হীরে কেড়ে নিচ্ছে।

ছেদ পড়ল একটু, নিঃশব্দে বীরেশ্বর এসে পাশের খালি চেয়ারে বসল। অস্ফুট স্বরে বলল, শুরুর আগেই তন্ময় যে একেবারে, আমার স্তুতি কেমন লাগল?

—তোমাকে চাটুকলা বিশারদ উপাধি দেওয়া যেতে পারে।

কানের কাছে মুখ এনে বলল, শ্রীমতীর হাঁটু মুড়ে বসার ভঙ্গীখানা ছাখো, দেখলে বুড়ো হাড়ে ডুবো গজায়, এঁর গান চাখার সুযোগ ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছ নাকি?

মাথা নাড়লাম।

স্বাগত গান ভালোই লাগল। উচ্ছ্বাসশূন্য সাদাসিধে বয়ান। সাদাসিধে মিষ্টি সুর। এতে শিল্পনৈপুণ্যের ছোঁয়া তেমন নেইই, কেবল

একটু আন্তরিকতার স্পর্শ আছে। নিটোল মিষ্টি গলা অবশ্যই, কিন্তু এ-গান উচ্ছ্বসিত হবার মতো কিছু নয়।

শেষ হতেই চারদিক থেকে বায়নার রব উঠল।—ভজন! একখানা ভজন চাই! একখানা না দু'খানা!

ডায়াসের গায়িকা হাসি মুখে একটু মাথা নেড়ে খুশির অভিব্যক্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তারপর উইং-এর দিকে তাকিয়ে কাউকে কিছু ইশারা করলেন।

পাশ থেকে বীরেশ্বরের মন্তব্য, এবারে মন দিয়ে শোনো।

মঞ্চে এবারে একাধিকজনের প্রবেশ। একজনের হাতে তানপুরা একজনের বাঁয়া-তবলা, একজনের হাতে হাত-বাজনার মতো কিছু। অবন্তী পাণ্ডে হারমোনিয়াম সরিয়ে তানপুরা নিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর বসার ভঙ্গীও একটু বদলালো। কান গাল আর মুখের খানিকটা তানপুরায় ঠেকল।

—না-রা-য়-ণ-অ—!

আচমকা এত মানুষের বুকের তলায় একটা শিহরণ তুলে নারায়ণ শব্দটা যেন সুরের সপ্ত লহরী বিচরণ করে শমে মিশল। আর তারপর এ-কি ভজন!

নারায়ণ যিন্‌কে হিরদয়মে
সো কুছ করম্ করে না করে।
নাও মিলি যিন্‌কে জল অন্দর
বাঁহমে নীর তরে না তরে।
পরশমণি যিন্‌কে ঘর মাহি
সো ধন সঞ্চ্ ধরে না ধরে।
সুরযকো পরকাশ ভ্যায়ো যব্
দীপকি জ্যোত জ্যরে না জ্যরে।

নারায়ণ যার হৃদয়ে সে কিছু কর্ম করলেই বা কি না করলেই বা কি। দরিয়ায় নেমে যে নৌকো পেয়ে গেছে, নৌকো সে বাইলেই

বা কি না বাইলেই বা কি। পরশমণি যার ঘরে মজুত সে ধন সঞ্চয় করলেই বা কি না করলেই বা কি। সূর্যের প্রকাশ যদি হয়েই যায় তখন দীপ জ্বললেই বা কি না জ্বললেই বা কি। এতবড় সভা স্তব্ধ, সমাহিত।

পরেও পনের বিশ সেকেণ্ড পর্যন্ত সভা নিশ্চেতন। তারপরেই সমবেত বিপুল উল্লাস আর করতালি।

ঘড়ি দেখলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা গেয়েছেন ওই ভজন। কিন্তু মনে হচ্ছে পাঁচ মিনিটও নয়। শ্রোতারা তাঁকে উঠতে দিল না। চারদিক থেকে চিৎকার, অনুরোধ। আর একখানা! আর একখানা!

অগত্যা আবার তানপুরায় গাল ঠেকালেন। পাশ থেকে বীরেশ্বরের বাহুর ধাক্কা খেলাম। —কি জ্ঞানে আছ না অজ্ঞানে?

—দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থা।

একটু বাদে কানে বুঝি মধুবর্ষী উদাত্ত অমৃতধারা। একে গান বলব কি স্তব বলব কি বিচিত্র স্তোত্র-চারণ বলব জানি নে। একটা নিটোল [illegible] উঠছে নামছে কাঁপছে সমর্পণে লুটিয়ে পড়ছে ঃ

> কর্মপাশনাশ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।
> শর্মদায় নর্মভস্মকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।
> জন্মমৃত্যুঘোরদুঃখহারিণে নমঃ শিবায়।
> চিন্ময়ৈকরূপদেহ ধারিণে নমঃ শিবায়।

আমার শিরায় শিরায় রক্ত কাঁপছে। সামনের ডায়াসে এই কাকে দেখছি আমি? রানী অহল্যাবাঈ? শোকে দুঃখে পাথর ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ মরজীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসে নমঃ শিবায় এই প্রণাম মন্ত্র জপ করে করে ঊষর অন্তরে শিবশংকরের করুণাধারায় সন্ধান পেয়েছিলেন। এই মন্ত্র তিনি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য ছড়িয়ে রেখে গেছেন—নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়!

শেষ হল। শ্রোতারা আবার হাততালি দিতে ভুলে গেল। সেই ফাঁকে তানপুরা রেখে সভাকে প্রণাম জানিয়ে মহিলা আস্তে আস্তে উঠে

াড়ালেন। তখন সচেতন শ্রোতাদের হাততালির ধুম।

বীরেশ্বর ঘোষাল উঠে গেল। এরপর আবৃত্তি নৃত্যানুষ্ঠান আরো কি কি। মন এত ভরে আছে যে এসব আর কিছুই ভালো লাগবে া। মনে হল এই ফাঁকে সমাচার সেনশর্মার কাছে চলে যাই। কাছেই াড়িতে রামাপুরা পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। কিন্তু যাঁর গাড়িতে যাব তাঁকে বলে যাওয়া দরকার মনে হল।

তাঁর মেয়েরা সব ও-দিকের তৃতীয় সারিতে বসে আছে। সেখানে উনি নেই। ভিতরে পেলাম। বললাম, আজ বেনারসে আসা আমার ার্থক হল মনে হচ্ছে, আর যে দু'দিন আছি কান-মন আরো ভরে না নিয়ে যাচ্ছি না।

শুনে ভারী খুশি। বললেন, ভালো কথা তো···ওই শিব স্তোত্র আমার গুরুদেবের মুখে শুনে শেখা, আপনি তাঁর গলায় শুনলে ভুলতে পারতেন না।

—আমি অহল্যার মুখে শুনলাম, এ-ও ভুলতে পারছি না। উনি লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগলেন। বললাম, আমি একটু ঘুরে আসছি, আপনি কতক্ষণ আছেন বা গাড়ির দরকার আছে কিনা জিগ্যেস করতে এলাম।

—না, আমার সঙ্গে তো বাস আছে, আপনি গাড়ি নিয়ে যান।

সমাচার সেনশর্মা বছরে দুবার আমাকে চিঠি লেখেন। একবার নববর্ষে, একবার বিজয়ায়। তাও চিঠির শেষে নিজের নাম ফণীন্দ্র সেনশর্মা লেখেন না। লেখেন, ইতি আপনাদের সমাচার সেনশর্মা।

শুনেছি এই নাম প্রথম নিঃসৃত হয়েছিল তাঁর ঠাকুমার শ্রীমুখ থেকে। ফণীন্দ্রবাবু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। বারাণসীর টোলে অধ্যাপনা করেছেন। যৌবনে এবং তার পরেও কিছুকাল বারাণসী সমাচার নামে একখানা পাক্ষিক কাগজ নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। গোড়ায় এই উদ্যমের সঙ্গে আরো জনাকতকের উৎসাহ যুক্ত ছিল। কিন্তু সেই

উৎসাহে ভাঁটা পড়তে খুব সময় লাগেনি। ক্রমে দেখা গেল ফণীন্দ্র সেনশর্মা একাই ওই সমাচারের সম্পাদক, প্রিণ্টার, প্রুফ-রিডার, ক্যানভাসার এবং একনিষ্ঠ পাঠকও। টোলের অধ্যাপনার সময়টুকু ছাড়া এই সমাচারই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাঁরই মতো তাঁর জনাকতক সাগরেদ ছিল। এখনো আছে। তাঁরই মতো তারাও ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতো, অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে বিনা পয়সায় কাশীর সমাচার সংগ্রহ করে তাঁর হেপাজতে পৌঁছে দিত। ভাঙা বাড়ির বাইরের ঘরে এই সাগরেদদের নিয়ে ফণীন্দ্রবাবুর জমজমাট আড্ডা বসত। ভিতর থেকে তখন প্রায়ই তাঁর ঠাকুমার গলা শোনা যেত, ওরে ও সমাচার, তোর কি নাওয়া-খাওয়া আছে, না আমি সবকিছুতে জল ঢেলে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ চায় বেরিয়ে পড়ব?

ভদ্রলোকের সমাচার নামের উৎস এই। সমাচারের অস্তিত্ব অনেক দিনই ঘুচে গেছে। নামটা শুধু থেকে যায় নি, একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে।

সেই পাক্ষিক কাগজের অস্তিত্ব আর না থাকলেও তার একটা নামগত প্রভাব ভদ্রলোকের ওপর থেকেই গেছে। কাশীর সমস্ত সমাচার এখনো তাঁর কানে যত পৌঁছয় তেমন আর কারো না। তাঁর সেই সাগরেদরা এখন কেউ প্রৌঢ় কেউ বা বৃদ্ধ. আড্ডা দিতে বসে রসিয়ে রসিয়ে এখনো তারা গোটা কাশীটিকে তাঁর ঘরের মধ্যে এনে উপস্থিত করে।

এখানকার সুধিজনেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে ভালবাসে আবার তাঁকে নিয়ে মজাও পায়। পণ্ডিত মানুষ কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই। বুদ্ধিমান কিন্তু বুদ্ধি জাহির করেন না। মিতবাক। আজ অনেক বছর ধরে বাক-সংযমের মহড়া দিয়ে চলেছেন। মাসে পনেরো দিন মৌন থাকেন, তখন তাঁর তরফ থেকে বাক্যালাপ বা প্রশ্নোত্তর চলে শ্লেটে লিখে লিখে। তখন বড় একটা শ্লেট আর পেন্সিল সর্বদাই সঙ্গে মজুত থাকে। মৌনীকালে ভুলেও একটি কথা বলে ফেলেন না। সমাচার ঝাড়াবাছা করে বিশ্লেষণের অভ্যাসের দরুনই হয়তো ভদ্রলোক একটু বেশী মাত্রায় সত্যনিষ্ঠ। এমনিতে অমায়িক,

চণ্ড সত্যের খাতিরে অনেক সময়ে একটু রূঢ় বা ক্রূরও হয়ে উঠতে পারেন।

গাড়ি তাঁর গলির মুখে ঢুকবে না। গলিটাও অন্ধকার। সঙ্গে একটা টর্চ থাকলে ভালো হত। নেই। অনেকবার এসেছি, তাই একতলা ভাঙা বাড়িটার হদিস পেতে অসুবিধে হল না।

—সমাচাব সেনশর্মা আছেন নাকি?

দ্বিতীয়বার ডাকতে হল না। সামনের ঘবটাতেই তিনি থাকেন, আবার ওটাই তাঁর সাধনক্ষেত্র। এক ডাকেই নড়বড়ে দরজাটা খুলে গেল। —শুভায় ভবতু, আসুন আসুন!

ঘরের আলোটা পঁচিশ পাওয়ারের বেশি হবে না। তাতেও ময়লা জমেছে আর ডোমটায় ময়লা জমেছে বলে এই কিশোরী রাতেও ঘরেব আলো-আঁধারি দশা। তিনি হাত ধরে আমাকে ভিতরে নিয়ে এলেন, কাঠের চেয়ারের বইয়ের স্তূপ সবিয়ে নিজের ধুতির খুঁট দিয়ে ঝেড়ে আমাকে বসতে দিলেন, আর চৌকির ওপর থেকে পুঁথিপত্র একপাশে ঠেলে সরিয়ে নিজেও মৌজ করে বসলেন।

বললাম, আপনাকে আজ ক্লাবের ওপেনিং ফাংশনে সবাই আশা করেছিল।

হাসলে ভদ্রলোকের বড় দাঁতের সারি একটু বেশী মাত্রায় দেখা যায়। বললেন, আপনার কথা ভেবেই যাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কাজে বসে গিয়ে আর হয়ে উঠল না।

—কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম নাকি তাহলে?

—অমায়িক জবাব, কিছুমাত্র না, না যাওয়াটা স্বভাবগত ভুল। ···আসছেন জেনে আপনার খবব নিতে আমি ঘোষাল মশাইয়ের বাড়িতে গেছলাম।

—শুনেছি। ওর মুখ থেকেই আপনার এখন মৌনী কাল 'চলছে তা শুনে আশ্বস্ত হয়েছি।

সামান্য হেসে আমাকে একটু নিরীক্ষণ করলেন। —বারাণসী-ধামে এসে এবারে বেশ রসেবশেই আছেন তাহলে?

—কি রকম? আমিও হাসলাম।

—এবারে আপনি অবন্তী মালহোত্রার মাননীয় অতিথি শুনলাম···তিনিই নাকি আগ্রহ করে আপনাকে তাঁর হেপাজতে নিয়ে গেছেন।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, অবন্তী মালহোত্রার অতিথি!

—সে-রকমই তো শুনলাম···নাকি ভুল শুনলাম!

—আমি তো জানি আমি অবন্তী পাণ্ডের অতিথি!

—তাই বুঝি···তাহলে আমারই কিছু ভুল-চুক হয়ে থাকবে, বয়েস তো কম হল না। একটু চা করে নিয়ে আসি?

চায়ের তৃষ্ণা নেই, তাছাড়া রাজি হলে ওঁকেই করে আনতে হবে। ব্যাচিলর মানুষ, স্বপাকহারী, এখন চাকর বাকরও আছে মনে হল না।

—আপনি বসুন, চায়ের একটুও দরকার নেই।···অবন্তী মালহোত্রা কে?

মুখে বিড়ম্বনার ছায়া টেনে বললেন, আপনার মাথায় আবার কি ঢোকালাম, মালহোত্রার পাণ্ডে হতে বাধা কি···হলেই হল। আপনি সমাদরে আছেন কিনা সেটাই কথা।

ভদ্রলোককে ভালো করে জানা না থাকলে এত কৌতূহল হত না। তূণের প্রথম শর হিসেবে মহিলার নামের সঙ্গে মালহোত্রা শব্দটি তিনি ইচ্ছে করেই যুক্ত করেছেন সন্দেহ নেই।

জোর দিয়ে বললাম, আপনি হেঁয়ালি ছাড়ুন তো, অবন্তী দেবীকে আপনি চেনেন?

এবারে একটু বেশিই হাসলেন।—এ-ই ভালো, মালহোত্রা নয়, পাণ্ডে নয়—একেবারে দেবী। পুরনো দিনের ফিল্ম আর্টিস্টরাও শুনেছি একটু নাম করলেই দেবী হয়ে যান—এঁরও নাম-টাম হচ্ছে, দেবী হতে বাধা কি ··চিনি বলতে লাইব্রেরিতে দু-চারবার দেখেছি, বীরেশ্বরবাবু একবার একটু আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। নাকের ওই হীরেটি ওকে দারুণ মানায়, তাই না?

চেয়ে আছি। মাথা নাড়লাম, তাই।

—গানও খুব চমৎকার করেন শুনেছি, আমার অবশ্য শোনা

হয়নি।

—আপনি খুব মিস করেছেন, আমি আজকের ফাংশনে শুনলাম, সকলে স্পেলবাউণ্ড।

—তাই নাকি, আমার বরাতটাই এ-রকম, যাব ঠিক করেও যাওয়া হল না।

বললাম, আপনি ইচ্ছে করেই যাননি কেন সে-জেরার মধ্যে আপনাকে ফেলব না, কেবল বলুন, মহিলার সম্পর্কে আপনি কি জানেন ?

—কেন, আপনি ইণ্টারেস্টেড ?

—খুব। বীরেশ্বর ঘোষাল বলে, তাঁর একটা বড় রকমের অতীত আছে। আর ওর আরো ধারণা, সেই মহিলা আমার প্রতিও একটু ইণ্টারেস্টেড—

—তাহলে তো সোনায় সোহাগা, এর মধ্যে আমাকে আর টানা-টানি কেন! তাছাড়া আমি তাঁর বিদেশের জীবনযাত্রার কিছুই জানি না।

—এ-দেশের যেটুকু জানেন তা-ই বলুন।

—কি মুশকিল, আপনি শুনতে চাইছেন অবন্তী পাণ্ডের কথা, আমি যার খবর একটু-আধটু রাখতাম তিনি অবন্তী মালহোত্রা, বিদেশ থেকে এখানে এসে মাস আট নয় উষা বাইজীর দলে ভিড়েছিলেন, ওই বাইজীটির সঙ্গে সূর্য পাণ্ডের দহরম-মহরম ছিল, তার কাছ থেকে অবন্তী মালহোত্রা সূর্য পাণ্ডের দখলে চলে যান—

আমি বাধা দিলাম, সূর্য পাণ্ডে কে, পরে যিনি অবন্তীর স্বামী ?

—স্বামী আপনাকে কে বলল ?

হোঁচট খেলাম। —সবাই তো তাই বলে···

—যারা বলে তাদের কেউ বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছে, না রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তল্লাসী করেছে ?

এই চাঁছাছোলা উক্তি ভাল লাগল না। বললাম, সূর্য পাণ্ডের, মনে হয় সূর্য পাণ্ডেরই হবে, তাঁর বড় বড় দুই ছেলের—

—নকুল পাণ্ডে আর সহদেব পাণ্ডে ?···হ্যাঁ, সূর্য পাণ্ডেরই ছেলে

তারা।

—আমি নিজের চোখেই দেখেছি অবন্তীকে তাঁরা মায়ের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

অম্লান বদনে সমাচার সেনশর্মা বললেন, তা হবে, যে-ভাবেই হোক মহিলা ওদের গুরুদেব ব্রহ্মমহারাজের অনুকম্পা পেয়েছিলেন শুনেছি···ব্রহ্মমহারাজ সংস্কারের উর্দ্ধে মস্ত সাধক এ-ও বিশ্বাস করি, তিনিই কিছু করে থাকবেন—নইলে বছর সাড়ে তিন চার পর্যন্ত ওই ছেলেরাও শত্রুপক্ষ ছিল বলেই জানি।

জিগ্যেস করলাম, সূর্য পাণ্ডে কি রকম লোক ছিলেন?

—খাসা। দাপট সুরা আর নারী, কোন গুণেরই ঘাটতি ছিল না। ভয় একমাত্র বংশের গুরুদেব ওই ব্রহ্মমহারাজকেই করতেন, সে-ও সামনে এসে দাঁড়ালে···তবে লোকটা কিছু লেখাপড়া জানতেন আর ব্যবসাবুদ্ধিও প্রখর ছিল, আর গুণের মধ্যে সেকালের বড় লোকদের মতো নাচ-গান বাজনার সমজদার ছিলেন—পুরুষের নয়, শুধু মেয়েদের নাচ গান বাজনার···তবে শুনেছি বেনারসের এক নাম-করা গাইয়েকে বহাল করে অবন্তী মালহোত্রাকে গান শিখতে সাহায্য করেছেন, মহিলা ভালো গাইবেন এতে আর অবাক হবার কি আছে?

···অনুষ্ঠান মঞ্চের ভজন আর স্তোত্র সেই মূর্তি চোখে ভাসছে। ···হ্যাঁ, মহিলার জীবনে একটা অতীত আছে, বৃহৎ রকমের কোন অতীত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অতীত যেমনই হোক, সদ্য বর্তমানে তিনি তার থেকে উত্তীর্ণ নন এ-ও ভাবতে ইচ্ছে করছে না। কোনো কালে কারো হয়তো শুধুই ভোগের প্রেয়সী ছিলেন তিনি, কিন্তু এই বর্তমানে আশ্রিত ওই মেয়েগুলোর সামনে তিনি এখন শুধুই মা, এ-ছাড়া আর কি কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে? না ভাবতে পারা যায়?

ফেরার পথে নির্জন রাস্তায় পড়তে গাড়ি বেগে ছুটল। আমার ভাবনাগুলো বুঝি তারও আগে ছুটতে লাগল। এক-একটা প্রশ্ন নিঃশব্দে মগজে আঁচড় কেটে বসতে লাগল। ···অবন্তী মালহোত্রা।

অথচ বাংলায় টগবগ করে কথা বলেন, আচার-আচরণও বাঙালির মতোই। কিন্তু যতই সুশ্রী হোক ওই মুখই বলে দেয় মহিলা বাংলার মেয়ে নয়। বাংলাভাষা তাঁর করায়ত্ত হতে পারে, কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি এমন খাঁটি বাঙালি হয়ে গেলেন কি করে? নাড়ির যোগ না থাকলে তো এমনটা হবার কথা নয়।

...সাত বছর ফ্রান্সে কাটিয়ে একেবারে পরিণত যৌবনে দেশে ফিরেছেন। ফিরেছেন এই বেনারসে।.. বেনারস কি তাঁর আদি নিবাস? মনে হয় না। তাহলে কেউ না কেউ জানত, সমাচার সেনশর্মা অন্তত জানতেন। আর্ট ও কালচারের পাশ্চাত্য পীঠস্থান থেকে অবন্তী মালহোত্রা এ-দেশের কোনো শিল্প-সংস্কৃতির পটভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেননি।...সূর্য পাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত অন্তত তাঁকে অবন্তী মালহোত্রাই বলতে হবে।...এ-দেশে ফিরে বেনারসে এসে তিনি যুক্ত হয়েছেন কোনো এই ঊষা বাইজীর সঙ্গে, যার সঙ্গে সূর্য পাণ্ডের মতো মানুষের দহরম-মহরম। ফ্রান্স-ফেরত একত্রিশ বছরের মেয়ে কোনরকম ভাগ্যদোষে এমন সংশ্রবে এসে পড়েছেন, যার থেকে আর বেরুতে পারেননি—এমন হতে পারে না। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে সাত-সাতটা বছর ফ্রান্সে তিনি কার সঙ্গে কি সংশ্রবে কাটিয়েছেন? সেখানে কলাবিদ্যা যদি কিছু রপ্ত করেও থাকেন, সেটা কোন্ পর্যায়ের?...ছেলেরা বিদেশের কথা, বিদেশের গল্প শুনতে চাইলে তিনি বিরক্তির আড়ালে আত্ম-গোপন করেন কেন? এমনকি তাদের সামনে আমাকেও বিদেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করতে অনুরোধ করেছেন।...কিন্তু কেন? সেই স্মৃতি ক্লেদাক্ত না হয়ে গৌরবের হলে তো গর্ব করে বলার কথা!

...সমাচার সেনশর্মার অবন্তীর প্রতি কোনরকম ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। কিন্তু সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে ভদ্রলোক এখন পর্যন্ত তাঁকে বৈবাহিক পদবীর মর্যাদা দিতেও রাজি নন। অবন্তী মাল-হোত্রা কখনো অবন্তী পাণ্ডে হয়েছেন কিনা এ নিয়ে তাঁর সংশয় আছে।...বিমাতার প্রতি দুই পরিণত বয়েসের ছেলের ভক্তিশ্রদ্ধার কথা শুনে তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন, পরে কি হয়েছে তাঁর জানা

নেই, মহিলা যেভাবেই হোক ব্রহ্ম মহারাজের কৃপা পেয়েছেন, ব্রহ্ম মহারাজ সংস্কার ঊর্দ্ধের মস্ত সাধক একজন—এ-ও তিনি অস্বীকার করেননি।

সাদা কথায়, ফ্রান্স থেকে ফিরে তিন-চার বছর পর্যন্ত অবন্তী মালহোত্রা সূর্য পাণ্ডে নামের এক মদমত্ত পুরুষের ভোগের নারী ছাড়া আর কিছু ছিলেন না।···আজ যাকে দেখছি, তাঁর সাধিকার জীবন বললেও খুব অত্যুক্তি হবে না।

যেমনটি দেখেছি বা দেখছি, তা যদি কৃত্রিম হয়, তার থেকে বেশি দুঃখের আর কি হতে পারে? না, সেরকম ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে। আবার এ যদি কোনো পাপের পরিণতি হয়, তাহলে আমার বিবেচনায় এমন পাপ শত পুণ্যের বাড়া। কিন্তু তাই বা এত সহজে হয় কি করে? জীবন আর যাই হোক ম্যাজিক নয়।

যা-ই হোক, আমি পাপ-পুণ্যের বিচারক নই। জীবন সন্ধান আর সেই সঙ্গে হৃদয় সন্ধান আমার কাজ। সাহিত্যের পথে নেমে এ-যাবৎ এই সন্ধানটুকুই করে এসেছি। আজ আমার সামনে আর একজন দাঁড়িয়ে। সন্ধিৎসু হবার মতো, অন্বেষণ করার মতোই একটি জীবন।

রাতে খাবার টেবিলে তাঁর দেখা পেলাম। পাব জানা কথাই কিন্তু অনুভব করছি, সমাচার সেনশর্মা ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক একটু ক্ষতি করেছেন। আমার সহজ আচরণে সামান্য চিড় ধরিয়ে দিয়েছেন।

আজও রাতে স্নান করেছেন বোঝা যায়। পিঠে আর্দ্র চুল ছড়ানো। শুধু গলায় একটু ছোট্ট শালের মতো জড়ানো। ওটুকুও বোধহয় গানের গলা রক্ষা করার তাগিদে।

···নকুল বলেছিল, মায়ের যখন-তখন চান করা একটা প্যাশন। হঠাৎ মনে হল, মহিলা কি সত্যি শীততাপ জয় করেছেন, না এ রোগের মতো কিছু? কোনো গ্লানির স্মৃতি ধুয়েমুছে ফেলার তাগিদে এই স্নানের বাই নয় তো?

হেসে বললেন, রাত হয়ে গেল বলে সংকোচ করবেন না,

কালকের থেকেও আজ আরো বেশি ঠাণ্ডা—ইচ্ছে করলে আপনার জিনিস নিয়েই খাবার টেবিলে বসে যেতে পারেন।

বললাম, আপনাকে দেখে তো ঠাণ্ডার কোনো অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হয় না।···তাছাড়া আপনার ওই সামান্য খাবারের পাশে নিজের খাবারের সমারোহ দেখেই লজ্জা পাচ্ছি, এরপর ড্রিংক নিয়ে বসলে নিজেকেই নিজের পাষণ্ড বলতে ইচ্ছে করবে, অথচ লোভ যে হচ্ছে না এমন নয়।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার ঘরের দিকে চলে গেলেন। কালকের বোতল সহদেব আমার ঘরেই মজুত রেখেছিল। সেটা এনে একটা গেলাসে নিজেই ঢেলে দিতে দিতে জিগ্যেস করলেন, একটু বড়ই দেব তো?

বললাম, দিন, চক্ষুলজ্জার খাতিরে দ্বিতীয়বার অন্তত চাইব না।

বোতলটা অদূরের আর একটা টেবিলে রেখে এসে বসলেন। হেসে বললেন, কারো খাতিরেই নিজেকে কষ্ট দেবেন না।

গেলাসে জল ঢেলে ছোট একটা চুমুক দিলাম। বললাম, আপনার এই আহার, ভরা শীতে এই বেশবাস, আপনার মুখে এ-কথা ঠাট্টার মতো লাগছে।

—কেন? একই সঙ্গে বিস্ময় এবং প্রতিবাদ।—আমার কোনো ব্যাপারে কারো কোনো নিষেধ বা মাথার দিব্যি আছে নাকি! আমি যা-ই করি সব নিজের ভিতরের আনন্দের থেকে করি।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমি ওঁকেই দেখছি। ওঁর মধ্যে একত্রিশ বছর বয়সের কাঠামোটা বসাতে চেষ্টা করেছি। খুব অসুবিধে হচ্ছে না, খুব বেশি তফাৎ কিছু হবে মনে হচ্ছে না।···সেই যৌবনের স্ফুলিঙ্গ পুরুষের স্নায়ুতে আগুন ধরাতে না পারার মতো নয়, সেই কালো রূপের মহিমা কাউকে প্রবৃত্তির পাতালে টেনে না নিয়ে যেতে পারার মতো নয়, নাকের ওই হীরের ছটা সেই বয়সে পতঙ্গ পোড়ানোর মতো আরো দ্বিগুণ তিন গুণ ঝলসে উঠতে না পারার কথাও নয়। কঠিন সংযমে না বাঁধলে সেই যৌবনের আভাস এখনো কি সম্পূর্ণ অস্তমিত মনে হত? ··কানের দু'পাশে গোটাকতক করে মাত্র পাক-

ধরা চুল। মাথায় আরো দু'-চারটে থাকলেও চোখে পড়ে না। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই কানের দু' পাশের ওই ক'টা চোখে পড়ে। আমার হঠাৎ কেমন মনে হল, লোকের চোখে পড়বে বলেই ও দুটো ওখানে আছে। এ-বয়সের মহিলারা বয়েসের এ-চিহ্নটুকু সাধারণত নির্মূল করতেই চান। হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র, তুলে ফেললেই বয়সের ছায়া কিছুটা অন্তত কমে। কিন্তু ইনি যেন এই সাদা চিহ্ন সযত্নে রক্ষা করছেন। এর কারণ কি হতে পারে?···পুরুষের দৃষ্টির আঘাতে এই রমণী-দেহ কি অনেক ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে?·· সাদা চিহ্ন ক'টা কি নিষেধের নিশানা, বিরতির ঘোষণা?

—বিমনা দেখছি আপনাকে, কালকের ভাবণ নিয়ে ভাবছেন নাকি?

খাওয়া প্রায় শেষ। সোজা চোখ তুলে তাকালাম।—না, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

বেশ অবাক, আবার উৎসুকও।—আমার কথা কি ভাবছিলেন?

হালকা সুরে জবাব দিলাম, এত আদর-যত্ন পাচ্ছি, বলে শেষে না ট্রেসপাসের দায়ে পড়ে যাই।

—পড়বেন না, বলুন।

···দেখুন, সময় সময় আমার কিছু উদ্ভট চিন্তা মাথায় ঢোকে, যেমন ধরুন, আপনি আমার লেখা ভালবাসেন, তাই এত সমাদরে আপনি আমাকে এখানে এনে রেখেছেন·· তবু থেকে থেকে মনে হয়, সাহিত্য-প্রীতি ছাড়াও এর পিছনে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। নকুল বলছিল, চান করাটা আপনার একটা প্যাশন, ফাঁক পেলেই চান করেন, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এই চান করা আর শীত-তাপ সহ্য করার অভ্যাসের পিছনে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। ···আপনার বড় বড় দুটি ছেলে, আর এতগুলো আশ্রিত মেয়ে, এদের সামনে আপনার মায়ের মূর্তি ভালো লাগবে না এমন পাষণ্ড কেউ নেই, তবু আমার মনে হয়, এমন মাতৃত্বকে আঁকড়ে ধরার পিছনে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে।···বয়েস হলে চুলে পাক ধরা স্বাভাবিক, আপনারও কানের দু' পাশের মাত্র কয়েকটা চুল সাদা,

কিন্তু আমার কেমন মনে হয় আপনার ও-ক'টাকে উপেক্ষা করার পিছনে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। মুখের দিকে সোজাই তাকালাম আবার।

চেয়ে আছেন। আয়তপক্ষ্ম কালো চোখে কিছু যেন আকূতির আভাস। সহজ মৃদু গলায় বললেন, কাল সকালের সেশনের পরে আপনি কিছুটা ফ্রি তো?

—কিছুটা কেন, অনেকটাই, ওসব সাহিত্যসভা-টভা আমার ভালো লাগে না, বেড়াবার লোভে আসি।

হাসলেন একটু।—এবারে আপনি আমার ভাগ্যে এসেছেন, অনেক রাত হয়েছে, গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।—একটা আরজি আছে···কাল সকালে আপনিও আসছেন তো?

—আপনি কি বলেন শোনার জন্য কত আগ্রহ নিয়ে বসে আছি, আমি তো যাবই—কেন?

—তাহলে এক কাজ করুন, কাল দুপুরে বাড়িতে আমার আপনার দু'জনেরই নো মিল করে দিন, কয়েক বছর পরে পরে এসে দেখি বেনারস বদলেছে, তবু পুরনো বেনারস ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালো লাগে—বীরেশ্বরকেও ডেকে নেব, কোথাও খেয়ে নিয়ে একটু ঘুরে বেড়াব—কি বলেন?

—খুব ভালোকথা তো।

খুশি মনে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। শেষ ধন্যবাদ বীরেশ্বর ঘোষালেরই প্রাপ্য হোক, মনের তলায় এখন কেবল এটুকুই আশা।

৪

মঞ্চে ওঠার আগে এক ফাঁকে বীরেশ্বরকে ধরে বললাম, দুপুরে আজ বাইরে লাঞ্চ, তুমি কাটান দেবার রাস্তা করে রাখো।

—সে কি! আমার যে দু'-দু'জন প্রবীণ অতিথি?

—এই দুপুরের মতো তাঁদের সৎকারের ভার তোমার ছেলে

ছেলের বউয়ের—

—তোমার এত উৎসাহ কি ব্যাপার, সঙ্গে শ্রীমতীও থাকছেন নাকি ?

—থাকছেন।

হেসে উঠল।—তুমি চিরকালের নিরেট দেখছি, এর মধ্যে আবার তৃতীয় ব্যক্তিকে ডাকছ কেন ?

বললাম, শেষ ধন্যবাদ তৃতীয় ব্যক্তির প্রাপ্য, সেই কৃতজ্ঞতা বোধে।

—অ্যাঁ ? খুশির আতিশয্যে যে শব্দটা প্রয়োগ করল, আমার কান গরম।—পেনিট্রেশন কমপ্লিট ?

বললাম, তোমার মুখখানা রোজ গঙ্গাজলে ধোও, নয়তো আবার বিয়ে করো।

—আরে বাবা ওই হল, মহিলার অতীতের হদিস পেলে কিনা তাই জিগেস করছি।

—খুব আশা পাব, সেইজন্যই তোমাকে লাঞ্চে ডেকে আগাম ধন্যবাদের ব্যবস্থা।

বীরেশ্বর ঘোষাল হাসতে হাসতে চলে গেল। ওর ভিতরে বারাণসীর গঙ্গার জোয়ার লেগেই আছে।

শুধু একক ভাষণের ওপর নির্ভর না করে আজকের এই সাহিত্য সভাটিতে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ আনার তাগিদে আমার সঙ্গে প্রবীণতর সাহিত্যিকদের একজন আর সমবয়সী তির্যক সমালোচকটিকেও ডায়াসে তুললাম। তাঁদের সামনেও মাইক। অর্থাৎ তাঁরা কোনো কথা বললে শ্রোতাদের কানে যাবে। শ্রোতাদের জানালাম, কোনো বিষয় নিয়ে বক্তৃতার একঘেঁয়ে সুরটাই আমার ভালো লাগে না, তাই অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক আর সমালোচক বন্ধুকেও আমার সঙ্গে ডেকে নিলাম, রসের যোগান দেওয়া, বক্তব্যের প্রতিবাদ করা বা তাৎক্ষণিক প্রশ্ন তোলার অধিকার তাঁদের থাকল, এমন কি আপনারাও আমার সঙ্গে অংশ নিলে খুশি হব।

প্রবীণ সাহিত্যিক গম্ভীর মুখে মাইক কাছে টেনে নিয়ে বললেন, অর্থাৎ উনি বাদ-প্রতিবাদ খণ্ডন করে বীর বিক্রমে তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, সমালোচক ভায়ার কাছে আমার অনুরোধ, অস্ত্র হাতে তুলে দেওয়া হল বলে আসরটিকে তিনি যেন সাহিত্যের যুদ্ধক্ষেত্র করে না তোলেন।

সভার মৃদু গুঞ্জন থেকে বোঝা গেল এতবড় পরিবেশ ঘরোয়া গোছের হয়ে উঠছে। ডায়াসের জোবালো আলোয় সামনের সারির শ্রোতাদেরও মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু নাকের হীরের দৌলতে সামনের সারিতে একটি কালো মুখের হদিস পেলাম, তিনি আমার দিকেই চেয়ে আছেন। তাঁর পাশে বীরেশ্বর ঘোষাল।

সকলকে শুনিয়ে প্রবীণ সাহিত্যিককেই জিগ্যেস করলাম, আপনি হুকুম করুন, কি নিয়ে বলব?

তাঁর জবাবও সকলেরই শ্রুতিগোচর হল। বললেন, আমাদের সাহিত্যের, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করলেই তো ভালো হয়।

এবারের শ্রোতাদের দিকে চেয়ে আমি বললাম, ভালো তো হয়, কিন্তু আমাকে বাঁচায় কে? আমি নিতান্ত নিরীহ এক লেখক, সাহিত্যকে কোনো কামারশালায় নিয়ে গিয়ে হাতুড়িপেটা করে ভেঙে-চুরে তার ভেতর দেখা আমার কাজ নয়। এই আলোচনা নিয়ে শেষে একটা বিরোধের মধ্যে ঢুকে পড়লে এখানে আধুনিক সাহিত্যিক বা আধুনিক সাহিত্যের সমাজদার যাঁরা আছেন—তাঁদের হাত থেকে অব্যাহতি পাব কি?

এ-দিক ও-দিক থেকে অনেক উৎসাহী শ্রোতা সরব হয়ে উঠলেন, পাবেন, আমরা আছি—আমরা আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কেই শুনতে চাই!

উৎসাহ থামতে বললাম, তাহলেও মুশকিলের কথা, আধুনিক সাহিত্য ঠিক যে কাকে বলে তাই আমি এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারলাম না। প্রশ্নটা আমার কাছে যেন, একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে প্রসাধন-প্রলেপের আড়ালে ঢুকে গেলে বেশি আধুনিক হবে, না

প্রায় বিবস্ত্র হলে ?

শ্রোতাদের দিক থেকে হাত-তালি আর হাসির রোল পড়ে গেল। লক্ষ্য করলাম অবন্তীও নিঃশব্দে হাসছেন, আর তাঁর পাশে বীরেশ্বর ঘোষাল। হাত তুলে নীরবতার আবেদন জানিয়ে বললাম, আপনারা এত মজা পেলে এমন গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গ নিয়ে আমি এগোই কি করে। শুনুন, এক স্নেহভাজন তরুণ বিদ্রোহী লেখক আলোচনা প্রসঙ্গে তিক্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠেছিলেন, জীবন-যন্ত্রণা না থাকলে আজকের সংসারও আলুনি, বউয়ের সঙ্গে কিলোকিলি চুলোচুলি আমাদের হবেই—আমরা আধুনিক লেখক, আমাদের লেখাতেও সে-রকম জীবন-যন্ত্রণা আর কিলোকিলি চুলোচুলি থাকবেই। তাহলে সহৃদয় শ্রোতারা আমার অবস্থাখানা বুঝুন, ইমারত গড়ার শুরুতেই ভাঙার এই লক্ষ্য যদি আধুনিক সাহিত্যের আংশিক অঙ্গও হয়—আমি তার থেকে হাজার হাত দূরে।

নিজের কাছে আমার প্রশ্ন, কেন লেখা, কেন লিখি ?

রসনা সংযত করতে না পেরে তির্যক সমালোচকটি ফস করে বলে ফেললেন, টাকা রোজগারের জন্য।

হেসেই জবাব দিলাম, সে তো কর্মফল, কর্ম করলে কিছু না কিছু ফল ধরবেই—কলমের হুল গেঁথে কম হোক বেশি হোক আপনিও আপনার কর্মের ফল তুলছেন। কিন্তু আমরা এই কর্মের দিকে এগোই কোন্ তাগিদে ? টাকাটাই লক্ষ্য হলে কলমের বদলে কোদাল ধরলেন না কেন ?

হেসে হার স্বীকার করলেন, বেশ আপনি বলুন, কেন কোদালের বদলে কলম ধরেছেন।

—আমি বলব অমৃতের টানে—যে অমৃত জীবনের অজস্র অনুভূতি আর জটিলতাকে সিক্ত করে রাখে। জট পাকিয়ে নীরস নিষ্ফল একাকার হয়ে যেতে দেয় না। নিভৃতের কোনো প্রজ্ঞা অগোচরের কোনো আদর্শ আর রূপের কোনো তৃষ্ণা লেখককে এই অমৃত সন্ধানের পথে ঠেলে দেয়। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে আমরা এর স্বাদ জেনেছি। তাঁদের প্রেম-ভালবাসা, তাঁদের ঐতিহ্যচেতনা, মূল্যবোধ জাতির সত্তায়

শিহরণ এনেছে, মানুষের হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার তুলেছে।···আগেও যা এখনো তাই—এ অমৃত ভাগ না হলে ভোগ হয় না। সেই ভোগের দোসর পাঠক। এই ভোগের নৈবেদ্য পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া লেখকের অলিখিত প্রতিশ্রুতি। আর, পাঠকের নিবিড় প্রত্যাশা লেখকের মূলধন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি আজকের লেখক আমরা কতটা পালন করছি? পাঠকের প্রত্যাশার কতটুকু মূল্য দিচ্ছি? অমৃতের তো দুটি মানে। মৃত্যু নেই, এবং রস! রস রূপ ধরলে তবে সৃষ্টি। আনন্দের হোক বা শোকের হোক, তৃপ্তির হোঁক বা যন্ত্রণার হোক আমরা রসের ঝাঁপিটি বন্ধ করে রূপ ব্যবচ্ছেদের ছবি আঁকছি, আর অমৃতের নামে অনেক বিষও চালান দিচ্ছি—আজকের পাঠক যদি এ অভিযোগ তোলেন, আমরা কতটা জোরের সঙ্গে তা নাকচ করতে পারব?

সমর্থনসূচক হাত-তালি থামতে প্রবীণ সাহিত্যিক প্রশ্ন করলেন, আমাদের এই ব্যর্থতার কারণ কি?

—ব্যর্থতার বড় কারণ, আমাদের সাহিত্যের বাস্তব দিকটা যত অকরুণ সত্য এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, হৃদয়ের দিকটায় ততো-শুকনো টান ধরে যাচ্ছে। একজন সাঁতার না-জানা লোক জলে ডুবে মরছে, আর একজন সাঁতার-জানা লোক তাকে টেনে তুলছে। ডোবাটা বাস্তব, টেনে তোলাটা হৃদয়। কিন্তু নিজের সুবিধের জন্য জলে-ডোবা লোকটিকে আগে যদি গলা টিপে মেরে নেওয়া হয়, তাহলে ডাঙায় যাকে টেনে তোলা হবে সে কোন্ বস্তু? আধুনিক সাহিত্যেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা হৃদয়ের নামে এমনি এক হৃদয়শূন্যতার খেলায় মেতে উঠেছি।···সাহিত্যের আধুনিকতার মানেটা সত্যিই কি? সুন্দরকে বিদ্রূপ করব? প্রেমকে ব্যঙ্গ করব? মহত্বকে অস্বীকার করব? সে-ও তো সাহিত্যের ডাঙায় ওই শব টেনে তোলার মতোই হবে! আধুনিকতার খাতিরে সময় আর কালের প্রচ্ছদ নিশ্চয় বদলাবে, কিন্তু এর আড়ালে যাতে জীবন আছে, প্রাণময়তা আছে, তা-ই আধুনিক সাহিত্য।

শ্রোতাদের অনুমোদন সমালোচক বন্ধু বরদাস্ত করে উঠতে

পারলেন না। বললেন, আপনি দাদার প্রশ্ন গাল-ভরা কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? ব্যর্থতার কারণ যে আজকের সাহিত্যিকের 'বেস্ট সেলার' হবার শস্তা ফরমুলা খোঁজা, সেক্স ভায়োলেন্স আর পারভারশনই তাঁদের আসল পুঁজি—এটা কি স্পষ্ট করে বলার কথা নয়?

শুনে নিয়ে শ্রোতাদের দিকে তাকালাম।—বন্ধুর অভিযোগের জবাবে আমার বক্তব্য, এটা কোনো সমস্যাও নয়, গুরুতর চিন্তার বিষয়ও নয়।···একটা বাস্তব ঘটনা শুনুন। পৃথিবীর তিনটি বাঘা-বাঘা সাহিত্যিক—শেরউড অ্যাণ্ডারসন, আরনেস্ট হেমিংওয়ে আর সিনক্লেয়ার লুই একদিন ডিনারের আলোচনার ফাঁকে এক অবধারিত শিওর ফায়ার গোছের বেস্ট সেলারের ফরমুলা আবিষ্কার করলেন। নিজেদের অভিজ্ঞতায় তাঁরা দেখেছেন সাহিত্যে সব থেকে বেশি বিকোয় সেক্স অ্যাডভেঞ্চার আর সাকসেস অর্থাৎ সাফল্য। ঠিক হল তিনজনে মিলে এই তিনের ভিত্তিতে একখানি উপন্যাস লিখবেন। সেই উপন্যাসের সেক্সএর দিকটা লিখবেন অ্যাণ্ডারসন, হেমিংওয়ে লিখবেন অ্যাডভেঞ্চারের দিক আর সাকসেস মানে নায়কের সাফল্যের বনিয়াদ গড়বেন সিনক্লেয়ার লুই। মাস কয়েকের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনে মিলে সেই বই লেখা হল। এক নামী এজেণ্টের মারফৎ সেটা গেল প্রকাশকের কাছে—এজেণ্টকে তাঁরা শর্ত করিয়ে নিয়েছেন, বইটি ছদ্মনামে ছাপা হবে, লেখকদের নাম কাক-পক্ষীতে জানবে না—প্রকাশকও না। এজেণ্ট তো জানেন লেখক কারা, তাঁর বিশ্বাস একটা যুগান্তকারী কিছু হতে যাচ্ছে। হলও তাই। বিষম বিরক্ত হয়ে প্রকাশক তাঁকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়ে বললেন, আপনি বড় কাঁচা লেখক নিয়ে কারবার করেন দেখছি আজকাল। যে তিন আসল জিনিস নিয়ে এই বই, সেক্স-অ্যাডভেঞ্চার-সাকসেস—তার কোনোটার সম্পর্কে লেখকের মাথা মুণ্ডু জ্ঞান নেই। শ্রোতারা সমস্বরে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, জীবন আর স্বতোৎসারিত প্রাণময়তার দিক ছেড়ে বেস্ট সেলারের ফরমুলা খুঁজতে গেলে আমাদেরও একদিন পাঠকের কাছ থেকে এই প্রত্যাখ্যান আসবে।

সমালোচক খানিক গুম হয়ে বসে রইলেন।

বললাম আধুনিক সাহিত্যের সব থেকে বিতর্কিত বিষয় সম্ভবত নগ্নতা, অশ্লীলতা। কেউ যদি প্রশ্ন করেন সাহিত্যিককে সংযমের মধ্যে রাখার জন্য কোনো-রকম কড়া শাসনের প্রয়োজন আছে কিনা, আমি একবাক্যে বলব—নেই! মাথার ওপর কেউ নীতির ছড়ি উঁচিয়ে বসে থাকলে সৃষ্টি থেমে যায়।

উগ্র সমালোচক বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠলেন, আমি এটা মোটেই মানতে রাজি নই, এ-যুগে অত্যন্ত কড়া শাসন থাকা উচিত—আপনি বলতে চান ইদানীংকালের সেক্স সর্বস্ব বই পড়ে যুব-সমাজ ভ্রষ্ট হচ্ছে না?

সভা উদগ্রীব উৎসুক। জবাব দিলাম, আমি কিছুই বলতে চাই না, এ-সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কি বলে তাই সভাকে জানাচ্ছি। ইংল্যাণ্ডের ব্যুরো অফ সোশ্যাল হাইজিনের এক আন্তর্জাতিক গবেষণায় 'দশ হাজার স্কুল থেকে বারোশ' স্কুল গ্র্যাজুয়েট মেয়েকে ডেকে তাদের যৌন জ্ঞানের উৎস কি আর তাদের বিবেচনায় সব থেকে সেক্স-স্টীমুল্যান্টই বা কি জিগ্যেস করা হয়েছিল। বাহাত্তরটি মেয়ে জবাব দিয়েছিল বই। ভাগে ভাগে আরো অনেকে অনেক রকম উত্তর দিয়েছিল—যেমন, সিনেমা অপেরা ইত্যাদি। আর চার ভাগের তিন ভাগ মেয়ে জবাব দিয়েছিল, পুরুষ মানুষ (শ্রোতাদের মিলিত হাসি)। তারপর শুনুন, কীনসে রিপোর্ট কি বলে, গবেষণায় পর্নোগ্রাফি পড়ে পুরুষের বিকৃতি দেখা গেছে শতকরা একুশজনের, মেয়েদের শতকরা ষোলজনের। তিপ্পান্ন সালের অসলো কনফারেন্সে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট, মনের বিকার ঘটলে তবেই অবৈধ সাহিত্য পাঠের ঝোঁক বাড়ে আর এই ঝোঁক বাড়ছে বলেই এ-ধরনের গ্রন্থের প্রকাশও বাড়ছে। হ্যাভলক এলিসের মতে, শিশুদের জন্য যেমন রূপকথা দরকার, বয়স্কদেরও তেমনি দুর্ভার গতানুগতিকতা থেকে মুক্তির জন্য অবৈধ সাহিত্য থাকা দরকার—কদর্য অপরাধ বা পশু আচরণের বিকল্পে এ অনেকটাই সেফ্‌টি ভাল্‌ব্‌-এর কাজ করে।

সমালোচক বন্ধু মুখ লাল করে বসে রইলেন। সভা আমার অনুকূল অনুভব করতে পারি। উপসংহারের দিকে এগোলাম।—আজকের সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন। জীবনে সুন্দর আছে কুৎসিত আছে। ভালো আছে মন্দ আছে। এই জীবনকে সম্পূর্ণ করে দেখানোই আজকের দিনের সাহিত্য। তা বলে স্বাধীনতার নামে সাহিত্যের ব্যভিচার কাম্য নয়। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আজকের কালকের সর্বকালের সাহিত্যিকদের থাকতেই হবে।

পিছনের সিটে আমি আর অবন্তী, সামনে ড্রাইভারের পাশে বীরেশ্বর ঘোষাল। অবন্তী তাকে পিছনে বসতে ডাকা সত্ত্বেও সে গটগট করে সামনের দরজা খুলে ড্রাইভারে পাশের আসন নিয়ে ঘুরে বসে চোখ পাকালো, আপনার সাহস তো কম নয়, আমি দীর্ঘ-কালের উপোসী ব্যাচিলর জেনেও ডাকছেন!

অবন্তী মুখে আঁচল তুলে ফিসফিস করে বললেন, এই ড্রাইভার বাংলা বোঝে না—রক্ষা।

গাড়ি এগোতে তিনি ঘোষালকে জিগ্যেস করলেন, আপনার হাতে ব্যথা-টেথা হয়নি তো?

ঘোষালের প্রশ্ন, ব্যথা হবে কেন?

জবাবটা অবন্তী আমার দিকে ফিরে দিলেন, আপনার সভায় হাত তালি দেবার জন্য আপনার বন্ধু সারাক্ষণ দু'হাত তুলেই ছিলেন।

—না তো কি! ঘোষালের সগর্ব জবাব, সারাক্ষণ আসরটিকে ও কিরকম মাত করে রাখল বলুন—এত সুন্দর হবে আপনি ভাবতে পেরেছিলেন?

মৃদু হেসে অবন্তী বললেন, হ্যাঁ, ওঁর স্টেজ-ক্রাফট্ ভালো স্বীকার করতেই হবে।

—স্টেজ ক্রাফট্! ঘোষাল অবাক বেশ, কেন ওঁর বক্তব্য সম্পর্কে আপনি একমত নন?

হেসেই জবাব দিলেন, বক্তব্য মানে তো বুদ্ধিতে শানানো অনেক সুন্দর সুন্দর কথা···ওঁর সমস্ত বই-ই আমি পড়েছি, সেসবের থেকে ওঁকে কিছুটা চেনা যায়, কিন্তু আজ এতক্ষণের আসরের মধ্যে

কেউ ওঁকে চিনেছে? শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে তো এত কথা বললেন, কিন্তু নিজে উনি·কোন্ পর্যায়ের মানুষ নিয়ে কলম ধরতে পারেন? আজ বাড়ি ফিরে ওঁকে আমি ছাড়ব নাকি!

দিব্বি আত্মপ্রসাদ নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলাম, কিন্তু এ-কথার পর ভিতরে ভিতরে বেশ হোঁচট খেলাম। কিছু বলতে চেষ্টা করার আগে ঘোষাল তড়বড় করে উঠল, শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রসঙ্গে আপনি বাড়ি গিয়ে ওকে নিয়ে পড়বেন, আর আমি সেখানে থাকব না··কি আফসোস!

—আফসোস করার দরকার কি, আমাদের আলোচনা তো আর পর্ণোগ্রাফিক নয়, গোপনতার কিছু নেই, চলে আসুন।

—আ-হা-হা, লোভে বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে, আলোচনাটা কি তাহলে ওই মানে মুখুজ্জে সেক্স-টেক্স শব্দ দিয়ে কি যেন বলছিল—

ভয়ে ভয়ে পাশের দিকে চেয়ে সংকোচশূন্য হাসি-মুখই দেখলাম। অবন্তীর জবাবও কানে লেগে থাকার মতো।—আর বেশি নিজেকে জাহির করবেন না, আপনি একখানা মুখ-সর্বস্ব ভালো মানুষ, আজ দু'ঘণ্টা তো পাশে বসে থেকে দেখলাম—

—অ্যাঁ! বীরেশ্বরের দু'চোখ কপালে।—উইডোয়ার বাঘকে এমন অপমান! একটু আধটু অবাধ্য হলে ভালো হত বলছেন?

হাসতে লাগলেন, খুব খারাপ হত, কিন্তু যারা বাঘ তারা খারাপ ভালোর ধার ধারে না। আরো বেশি হাসতে লাগলেন। —আপনি আর যা-ই হোন বাঘ নন, লেখক একটা কথা ঠিকই বলেছেন, আপনার জিভখানা যে অশ্লীল হয়ে ওঠে, আপনার পক্ষে সেটা সেফটি ভাল্‌বই বটে।

—ড্রাইভার গাড়ি রোখো, হাম উতর যায়গা! ছদ্ম রাগে বীরেশ্বর আস্ফালন করে উঠল।

বেনারস শহরের রাস্তায় গাড়ি এমনিতে শম্বুক গতিতে চলে। এই হাঁক ডাকে হকচকিয়ে গিয়ে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে ফেলল। ব্যস্ততা গোপন করে অবন্তীকে তক্ষুনি আবার হুকুম দিতে হল, না ঠিক হ্যায়, চলো।

…মহিলা তাহলে কলকাতার স্কুল কলেজ য়ুনিভার্সিটিতেও পড়েছেন।

বেলা সবে সাড়ে বারোটা। ঘোষাল মাত্র ঘণ্টাখানেকের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে আসতে পেরেছে। বেচারার ঘাড়ে সত্যি অনেক দায়িত্ব, তার ওপর দু'দুজন বৃদ্ধ মানী অতিথির দায়িত্ব। আমার মুখ চেয়ে হলেও তার ফেরার তাড়া আছে। কাছাকাছির মধ্যে তার পছন্দের এক রেস্তোরাঁর দোতলায় এলাম।

এ-সময়ে লাঞ্চের ভিড় নেই-ই। দূরের দূরের টেবিলে কয়েক জোড়া লোক। তার মধ্যে আরো নিরিবিলি একটা কোণের দিক বেছে আমরা বসলাম। ঘোষাল অবন্তীর উদ্দেশে বলল, আপনি আমাকে যে অপমান করেছেন এখন গলা উঁচিয়ে বীরদর্পে আপনার ওপর চড়াও হলেও ও-দিকের কেউ শুনতে পাবে না।

আমি বললাম, নিজেই তাহলে স্বীকার করছ, তোমার চড়াও হবার ক্ষমতা গলাবাজী পর্যন্ত।

হতাশ চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলো একটু।—আমার দেখছি বেয়াকুফ হবারই দিন আজ, বো-য়!

রাগটা যেন বয়ের ওপরেই ঝাড়বে। অবন্তী হাসতে হাসতে বললেন, আপনি শুধু মুখ-সর্বস্ব ভালো মানুষ নন, খোলা মনের তাজা মানুষ।

ঘোষাল আমার দিকে তাকালো।—এটা ইমপ্রুভমেণ্ট হল না, বাড়তি এক ঘা হল হে?

বয় মেনু কার্ড নিয়ে আসতে সে আবার গম্ভীর। তার মর্জি মতো লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে অবন্তীর দিকে ফিরল।—মুখুজ্জে বলছিল আপনি স্বেচ্ছায় নিরামিষাশী, আমাদের অনুরোধে আজ কি আপনার স্বেচ্ছাচারিণী না হওয়া সম্ভব?

অবন্তী মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মাথা নাড়লেন। সম্ভব নয়।

মেনু কার্ডটা ঠেলে দিয়ে ও বলল, আপনার মেনু তাহ'লে আপনিই ঠিক করুন।

মেনুর দিকে না তাকিয়ে অবন্তী বয়কে বলল, রাইস বাটার বয়েলড্ পোটাটো অ্যাণ্ড ফ্রায়েড পী-জ।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, সব তো শুকনো, গলা দিয়ে নামবে কি করে।

হেসে এক মুহূর্ত ভেবে তিনি মেনু বাড়ালেন, আচ্ছা একটু টক দইও বলে দিন তাহলে···।

বয় চলে যেতে গোমড়া মুখ করে ঘোষাল বলল, আমি স্টুপিডের মতো নিজেদের অর্ডারটা দেবার আগে ওঁর অর্ডারটা শুনে নেওয়া উচিত ছিল।

নিজের খাওয়া নিয়ে কথা বাড়াতেই যেন অবন্তীর আপত্তি। বললেন, দেখুন, আমার খাওয়া-খাওয়া করে আপনারা যদি নিজেদের খাওয়া পণ্ড করেন তাহলে কিন্তু খুব রেগে যাব। বাড়িতে আমি কত কি খাই দেখেন নি? তাছাড়া একসঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দটাই বা কম কি?

বীরেশ্বর ভোজন রসিক। ধীরেসুস্থে আয়েস করে খায়। তার ওপর অতিথি আর ফাংশনের দায় মাথায় নিয়ে তৃপ্তির খাওয়া যাকে বলে তা নাকি ক'দিনের মধ্যে হয়ে ওঠেনি। আমার খাওয়ার গতি স্বাভাবিক। খুব ধীরেও নয় আবার তাড়াহুড়ো করেও নয়। তবু যথাসাধ্য আস্তে আস্তে খাওয়া সত্ত্বেও অবন্তীর যখন খাওয়া হয়ে গেল বীরেশ্বরের ডিশে তখনো অনেকটা মজুত। আমিই তাঁকে নিষ্কৃতি দিলাম, বললাম, আপনি উঠে মুখ হাত ধুয়ে এসে বসুন, ওঁর খাওয়া শেষ হতে হতে দুপুরের সেশন শুরু হয়ে যাবে—

অনুমোদনের আশায় অবন্তী বীরেশ্বরের দিকে তাকাতে সে-ও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

এই দুপুরের শীতটা বেশ মনোরম। সকাল থেকেই আকাশ একটু মেঘলা ছিল। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম সেই মেঘ এখন বেশ ঘন। ভর দুপুরেও একটা কালচে ছায়া পড়েছে। কিন্তু এখনি বৃষ্টি আসবে বলে মনে হয় না।

মুখ হাত ধুয়ে অবন্তী ফিরে এসে বসলেন। ডিশ থেকে একটু মশলা তুলে নিয়ে চিবুতে লাগলেন। তারপর সামনের জানলা দিয়ে একবার মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে সামান্য ভ্রূকুটি করলেন।

ফ্রায়েড রাইসসহ রোস্ট আয়েস করে চিবুতে চিবুতে ঘোষাল বলল, আমি আক্রমণের প্রতীক্ষায় ছিলাম, এবারে কৈফিয়ত দাখিল করুন দেবী—আপনাকে একটা খোলা মনের প্রশ্ন করছি, এখানে লোকপ্রবাদ অনেক বছর আপনি ফ্রান্স তথা প্যারিস অর্থাৎ এক কথায় যাকে আমরা সিটি অফ এনজয়মেণ্ট অ্যাণ্ড আর্ট অ্যাণ্ড কালচার বলে জানি সেখানে ছিলেন, আর এখানে আপনার স্বামী সূর্য পাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তাঁকে আমরা মোটামুটি জানতাম—তাই আমার জিজ্ঞাস্য, আপনার এই কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্মনিগ্রহ কেন ?

মশলা চিবুচ্ছেন। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি, চোখের কোণেও। নাকের হীরেতে তো বটেই।—শুনবেন ?

—সেই রকমই ইচ্ছে।

—মন দিয়ে শুনুন তাহলে। একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। মেঘলা আকাশের দিকে আর একবার চেয়ে মিষ্টি বরে গলা খাঁকারি দিলেন একটু। তাবপর গুনগুন আর তারপর অনুচ্চ সুরে দু'কান ভরে জবাবদিহি করলেন।

কভি ব্যয়ঠে বৈঠায়ে দিল্‌কি হালত্ অ্যায়সি হোতি হ্যায়,
তড়পকর চায়ন মিলতা হ্যায়, খুসি রোনেসে হোতি হ্যায়।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুরের মৃদু জাল বিস্তার করে মিনিট তিনেক গাইলেন।

—বুঝলেন কিছু ?

ঘোষাল মাথা নাড়ল, কিছু না। মানেটা কি দাঁড়াল ?

মশলা চিবুচ্ছেন, অল্প অল্প হাসছেন।—দাঁড়ালো এই, অবস্থা বিশেষে মন এমনও হতে পারে যে কৃচ্ছ্রসাধন বা কষ্ট করলে মনে শান্তি আসে, আর অঝোরে কাঁদতে পারলে ভিতরটা আনন্দে ভরে ওঠে।

বীরেশ্বর অপেক্ষা করল একটু। সময়োচিত গম্ভীর। বলল, দয়া করে আরো একটু বিস্তার করুন।

হাসি মুখেই অবন্তী বাইরের মেঘলা আকাশের দিকে তাকালেন একবার, আবার একটু গলা খাঁকারি দিলেন তারপর তেমনি

গুণগুণ সুরে কষ্ট থেকে শান্তি আর কান্না থেকে আনন্দের কারণটা বিস্তার করলেন যেন।

'ইস্ এতিয়াৎ কি ক্যা ববখ্ দাও দেতা হুঁ

কে তিন্‌কা তিন্‌কা বাঁচা মেরে আশিয়াঁকো সিবা।'

কৌতুক ছোঁয়া দু'চোখ বীরেশ্বরের মুখের ওপর। একটু টানা গলায় কষ্ট থেকে শান্তি আর কান্না থেকে আনন্দের কারণ বিশ্লেষণ করলেন হে ঈশ্বর, তোমার নিপুণ সতর্কতার জন্য বাহবা দিতে হয়—আমার ঘর লক্ষ্য করে তুমি এমন বহ্নি বজ্রবাণ নিক্ষেপ করেছ যে শুধু আমার ঘরটাই জ্বলে খাক হয়ে গেল, আশপাশে অন্য কুটোকুঠিরও এতটুকু ক্ষতি হল না।

রমণীর চোখের ওই হাসির গভীরে আমি কিছু খুঁজছি। বীরেশ্বর আড়চোখে একবার আমাকে দেখে নিয়ে ডিশের অবশিষ্টটুকু মুখে তুলতে তুলতে খুব হালকা গলায় বলল, বেশ, কেবল আপনার ঘরটাই জ্বলে গেল আর কারো এতটুকু ক্ষতি হল না, সেজন্য তাপ-পরিতাপ দূরে থাক আপনি কষ্ট থেকে শান্তি আর কান্না থেকে আনন্দ পেলেন কিন্তু এরপর আপনার দশাখানা কি হবে, জীবনের তো এখনো অনেক বাকি?

এবারে অস্ফুট শব্দ করে হাসলেন।—এর পরও কি দশা হবে ভেবে লাভ কি? আপনার এই মাংস চিবুনোর দশাই কি চিরকাল থাকবে না সেজন্যে আপনি ভাবছেন? খুশি মুখে গুণগুণ করে আবার দু' কলি গান ছড়িয়ে দিলেন,

'আপনি খুসি না আয়ে,
না আপনি খুসি চলে,
লাই হায়াৎ আয়ে,
কাজা লে চলি চলে।'

—বুঝলেন না তো? এর মানে হল, পৃথিবীতে নিজের খুশিমতো আসিনি, খুশিমতো যাবও না। জীবন হাত ধরে নিয়ে এসেছিল তাই এসেছি। মৃত্যু হাত ধরে নিয়ে যাবে, চলে যাবো। কি দশা হবে ভেবে আমি এখনই দুর্দশায় মরি কেন!

পালিয়ে বাঁচার মুখ করে বীরেশ্বর ঘোষাল উঠে মুখ-হাত ধুতে চলে গেল। অবন্তী পাশের বড় জানালাটা দিয়ে আবার মেঘলা আকাশ দেখতে লাগলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি লেগে আছে। আমি লক্ষ্য করছি আঁচ করেই এদিকে ফিরছেন না।

ঘোষালকে তার বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দেবার কথা ছিল। বাড়ির দোরগোড়ায় নেমে অতিথিদের কাছে ধরা পড়তে চায় না। গাড়ি থেকে নেমে সশব্দে দরজা বন্ধ করে এদিকের জানলায় এসে মুখ বাড়ালো। বলল, ম্যাডাম পেট ভরাট করলাম কিন্তু বুকের ভিতরটা ঠিক ততখানিই খালি করে ফিরলাম। যাক, আশা করছি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

গাড়ি চলল। অবন্তী হাসছেন। মন্তব্য করলেন, বড় ভালো মানুষ আপনার এই বন্ধুটি।

শুনে ভালো লাগল। সামনের রাস্তা দুদিকে বেঁকে গেছে, অবন্তী নির্দেশ দিলেন, গণেশ মহল্লা—

ড্রাইভার সেদিকে গাড়ি ঘোরালো। আমি জিগ্যেস করলাম, কোথায় চলেছি?

—আগে আমার গোডাউন বা অফিসে, ছেলেদের সেখানে থাকতে বলেছিলাম, আপনাকে ওদের খুব ভালো লেগেছে, আপনি ব্যস্ত, ওরাও সময় পায় না—

একটু পুরানো বাড়ির দোতলায় আড়ত। কর্ত্রীকে দেখে সকলেই তটস্থ এবং আনত। সমস্ত দোতলাটাই তাঁর দখলে। ছোট বড় অনেকগুলো ঘর। কোনো ঘরে বেনারসী শাড়ির রং পালিশ হচ্ছে, কোনো ঘরে সাদা জমিনের ওপর ছাঁচ ফেলে ডিজাইনের মক্স করা হচ্ছে। একটা ঘরে দেখলাম মেঝেতে চাটাইয়ের উপর স্তূপীকৃত বেনারসী শাড়ি। তিন চারজন বসে সেগুলো বাছাই করে দাগ দিয়ে রাখছে। রাস্তার দিক ঘেঁষে বেশ সাজানো গোছানো ছোট অফিস ঘর। নকুল আর সহদেব আমাকে দেখে হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। সহদেব জিগ্যেস করল, আজ ওঁর ফাংশন কেমন হল মা?

—আজ ওঁরই জয়-জয়কার, তোমরা আড়াই তিন ঘণ্টায় ক'খানা শাড়ি বিক্রি করলে আর কি-ই বা লাভ করলে—মিস্ করে তার থেকে ঢের বেশি লোকসান করলে। আমার দিকে ফিরলেন, আপনি বসে ওদের সঙ্গে কথা বলুন, আমি আসছি—

উনি চলে যেতে নকুল একটু মিষ্টিমুখ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ওদের খুশি করার জন্য এক পেয়ালা কফি শুধু খেতে রাজি হলাম।

ওদের ব্যবসার কথাই তুললাম। মাথার কাছে দেয়ালে ওদের ঠাকুরদার মস্ত অয়েল পেন্টিং ছবি টাঙানো। তাঁর মুখের আদল কিছুটা নাতিদের মতো, ওদের বাপের মতো নয়: প্রশান্ত মুখ, চাউনি কোমল, কপালে লম্বা গঙ্গা-মাটির তিলক। দেখলেই মনে হয় ধর্মভীরু মানুষ। শুনলাম তাঁর কাল থেকেই এই ব্যবসার সূত্রপাত। ঠাকুরদার জীবনে গুরুদেব আসার পর থেকেই তাঁর ব্যবসা অবিশ্বাস্যরকম জাঁকিয়ে উঠেছিল।

ঈষৎ আগ্রহ নিয়ে বললাম, তোমাদের মায়ের মুখে গুরুদেবের কথা কিছু কিছু শুনেছি, এই গুরুদেবকে তোমাদের ঠাকুরদা কোথায় পেয়েছিলেন?

লক্ষ্য করলাম গুরুদেব প্রসঙ্গে দুই ভাইয়ের মুখই উদ্ভাসিত। নকুল বলল, আমাদের ঠাকুমা মাঝবয়সে মারা গেছলেন। মন খারাপ নিয়ে ঠাকুরদা হরিদ্বারে বেড়াতে গেছলেন।···আমাদের বাবা একটু অন্য রকমের আর ভিন্ন মেজাজের মানুষ ছিলেন, তাঁর জন্যেও ঠাকুরদার খুব দুশ্চিন্তা। হৃষিকেশে এক সাধুকে ভারী মনে ধরেছিল ঠাকুরদার, দীক্ষা নেবার জন্য তাঁকে ধরে পড়েছিলেন। তিনি রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, দীক্ষা নেবার দিন বললেন, আমি না, তোমার গুরু তোমার জন্য উত্তর কাশীতে অপেক্ষা করছেন, সেখানে চলে যাও। আমার মুখের দিকে চেয়ে নকুল থমকালো একটু, আর না এগিয়ে হেসে বলল, এ যুগে এ-সব শুনে আপনার বোধহয় হাসি পাচ্ছে···

এই প্রসঙ্গ উঠতে আমি মনে মনে চাইছিলাম অবন্তী যেন একটু দেরি করে ফেরেন। লাঞ্চে বসে গুণগুণ সুরের ওই উর্দু শায়েরী

কটা শোনার পর থেকে আমার কৌতূহল অন্যরকম। তাছাড়া, যে কারণেই হোক, আমার মনে হয়েছে এই গুরুদেব সম্পর্কে আমার জানা দরকার। তাই তাগিদের সুরে বললাম, আমি এ-যুগের মানুষ নই, আর ওই জগতের মানুষদের সম্পর্কে আমার নিজেরও কিছু কৌতূহল আছে—

নকুল সোৎসাহে বলে গেল, ঠাকুরদা উত্তরকাশীতে গিয়ে ব্রহ্ম-মহারাজের দেখা পেলেন।···বয়সে ঠাকুরদার থেকে বছর কয়েক ছোটই হবেন'। কিন্তু তাঁকে দেখেই ঠাকুরদার ভিতরে যেন একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। গুরুদেব হাসি মুখে তাঁকে গ্রহণ করলেন, দীক্ষা দিলেন। আর বললেন, তোমার যা-কিছু আছে আর যা কিছু হবে, তুমি নিজেকে তার মালিক ভেব না, তহসিলদার ভেবো, তোমার কিছুই নয়—তুমি কেবল রক্ষক। আর স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন ছেলেকে নিয়ে যন্ত্রণা পেতে হবে, আর সব দিক ঠিক আছে।

আমি উৎকর্ণ। জিগ্যেস করলাম, তোমরা দু'ভাই গুরুদেবকে কতটা কিভাবে পেয়েছ ?

এবারে সহদেব জবাব দিল, আমাদের যা-কিছু সব তাঁর দয়ায়। নইলে পথেও ভেসে যেতে পারতাম। ঠাকুরদার যাবার সময় হয়েছে এ কেবল গুরুদেবই বুঝেছিলেন, উইল করে বাবার নামে ব্যবসার আট আনা আর আমাদের নামে চারআনা করে লিখে দিতে বলেছিলেন। বাবার এটা একটুও পছন্দ ছিল না, তিনি রেগেই গেছলেন, কিন্তু একমাত্র গুরুদেবকেই তিনি ভয় করতেন, কিছু বলার সাহস ছিল না। আমরা সাবালক হতেই গুরুদেব বাবাকে হুকুম করলেন, উইল অনুযায়ী ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে ওদের আলাদা করে দাও, ওরা যে-যার নিজের ব্যবসা করবে। খুব আপত্তি সত্ত্বেও বাবাকে মাথা পেতে তাই করতে হয়েছে, আর তাঁর হুকুমে ব্যবসা দাঁড় করানোর ব্যাপারে সাহায্যও করতে হয়েছে।···গুরুদেবের কৃপা দেখুন, এর দুই-এক বছরের মধ্যেই বাবার ব্যবসা যায়-যায়··অবশ্য বাবার দোষেই। তখন গুরুদেব আবার আমাদের হুকুম করলেন,

যেভাবেই হোক বাবার ব্যবসা টেনে তোলো—ওটা দেবোত্তর, নষ্ট হলে অনেক ক্ষতি।... এখন গুরুদেবের এ কথার অর্থ আমরা বুঝতে পারি। গুরুদেব যখন যা বলেছেন তা-ই হয়েছে, হাত ঠিকুজি কিছুই না দেখে আঠারো-উনিশ বছর বয়সে সহদেবের সম্পর্কে বাবাকে বলেছিলেন ওর বুকের দোষ হবে, সাবধান। বাবা গা করলেন না, সহদেবের যক্ষ্মা হয়ে বসল। শেষে গুরুদেবকে ধরে পড়তে উনি বললেন, চিকিৎসা করাও আর ওকে রাণীক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ছ' মাস রাখো, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। কত ব্যাপার বলব আপনাকে, আমার প্রথম সন্তান হবার সময় স্ত্রীর ভয়ংকর শরীর খারাপ, আশ্চর্য দেখুন গুরুদেব কখন কোথায় থাকেন আমরা জানতেও পারি না, কিন্তু সত্যিকারের সংকটের সময় তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হন। বললেন, বউমা ভালো হয়ে যাবেন, কিন্তু সন্তানের মায়া রেখো না, এ-ছেলে প্রারব্ধ কাটিয়ে যেতে এসেছে, থাকবে না। স্ত্রীকে কিছুই বলি নি, কিন্তু হলও তাই, তিন দিনের দিন ছেলে মারা গেল, স্ত্রী আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল।

সহদেব এইদিন বাধা না দিয়ে দাদাকে বরং উৎসাহ দিল, বাবার কথাও বলো ওঁকে।

নকুল ভাইয়ের সায় পেয়ে বলে গেল, একমাত্র বাবাকেই গুরুদেব খুব একটা পছন্দ করতেন না, বাবারও তাঁর প্রতি খুব একটা ভক্তিটক্তি ছিল না, কিন্তু গুরুদেবকে যমের মতো ভয় করতেন। একবার অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি বাবাকে বলেছিলেন, তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।... তা শেষের দেড় দু' বছর বাবা কি কষ্টই না পেয়ে গেলেন।

এবার আমি সাগ্রহে জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম ওদের এই মায়ের সম্পর্কে গুরুদেব কি বলেছিলেন, কিন্তু সে ফুরসত আর পেলাম না। অবন্তী ফিরে এসে ছেলেদের সম্পর্কে অনুযোগ করলেন, ওরা আমার সইয়ের জন্য একগাদা কাগজপত্র জমিয়ে রেখেছিল, দেরি হয়ে গেল—আসুন।

উঠতে হল। অবন্তীর খালি হাতের দিকে চেয়ে স্বস্তি বোধ করলাম। এখানে আসার সময়ে আর আসার পরেও যে কথা

মনে এসেছিল ভাগ্যিস আগ বাড়িয়ে কিছু বলিনি। নকুল আমন্ত্রণ জানালো, মন্দিরের রাস্তায় একবার মায়ের আর আমাদের দোকান দেখতে আসুন—

আমার হয়ে অবন্তীই জবাব দিলেন, কাল বাদে পরশু উনি ফেরার ট্রেনে চাপছেন, আর সময় পাবেন আশা কোরো না।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে চোখ দুটো ভালো রকম একপ্রস্থ হোঁচট খেল। বসার পিছনের জায়গায় সুন্দর কাগজে মোড়া দুটো কাপড়ের বাক্স। আমি আঁতকে উঠলাম, এ কি?

—এ আপনার কিছু নয়, উঠুন।

—তাহলে আমি ধরে নিলাম যাবার সময় আপনি আমার কাঁধে কিছু চাপাচ্ছেন না?

হাসলেন, তা চাপাব, এতে আপনার স্ত্রীর জন্য একটু প্রণামী আর মেয়ের জন্য একটু আশীর্বাদ আছে—আপনি কি এ নিয়ে এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্ক জুড়বেন নাকি! উঠুন—

অনুনয়ের সুরে বললাম, দেখুন আমার স্ত্রী বেনারসী মোটে পরেন না—

—আমি কিন্তু এবারে রেগে যাচ্ছি, গাড়িতে বসে তারপর কথা বলুন।

ও-দিক ঘুরে উনি আগে উঠলেন। অগত্যা আমিও উঠে বসলাম। হাল ছেড়ে বললাম, আমারই ভুল হয়েছে, এখানে আসার আগেই আপনাকে নিষেধ করে রাখার কথা আমার মনে এসেছিল, সংকোচে পারি নি।

হাসতে লাগলেন।

এখানে বলে রাখি, যাদের জন্য এ উপহার বাড়ি এসে তাদের ঘোষণা শুনেছি, কম হলেও হাজার টাকা করে দাম হবে এক-একটার। মেয়ের জন্য ছিল শাড়ি আর স্ত্রীর জন্য বেনারসী শাল।

মানুষ সাইকেল রিকশ আর যত্র-তত্র ষাঁড় ঠেলে গাড়িও প্রায় পায়ে-হাঁটা গতিতে চলেছে। বললাম, এ-সব জায়গায় এলে তবে কাশীতে এলাম মনে হয়।

এমন ভিড়ের রাস্তা অবন্তীর আদৌ পছন্দ নয়। বললেন, আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসে। আপনার বুঝি কাশী খুব প্রিয় জায়গা··· অনেকবার এসেছেন ?

—ছেলেবেলা থেকে ধরলে কতবার তার হিসেব নেই। ছেলেবেলার সেই চোখ বা মন কিছুই আর নেই। বইয়ে পড়তাম বেদের কাল থেকে সবচেয়ে বড় মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী। মহাভারত রামায়ণ সংহিতা উপনিষদ বেদান্ত-ব্রাহ্মণেও কাশীর মাহাত্ম্য আছে, ভাবতাম কাশী তাহলে কত পুরনো! তখন চোখ বুজে কাশীর কথা ভাবলেই রোমাঞ্চ হত।···বরণা আর অসির সঙ্গমস্থল, তাই বারাণসী···সপ্ততীর্থ আর একান্ন পীঠের অন্যতম, এই শহর ষোড়শ মহাজনপদের বিশেষ একটি গৌরবের শহর। চোখ বুজলে দেখতে পেতাম, উত্তরবাহিনী গঙ্গার বাঁ-কূলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসী—আর চোখ বুজে কল্পনা করতাম কাশীর আশিটি ঘাটে ঘাটে কোন এক কালের ঋষি আর ঋষি-বালকেরা চান করছে, কখনো দেখতাম গঙ্গার জলে ভেসে চলেছেন ত্রৈলঙ্গস্বামী··· কি যে আবেগপ্রবণ ছিলাম যদি জানতেন।

অবন্তী আমার দিকে ফিরে মুখ টিপে হাসছেন।—ওই আশিটা ঘাটে নিজেও চান করেছেন নাকি ?

—নাঃ, অনেকবারই চান করেছি, তবে কেবল একটিমাত্র ঘাটে—দশাশ্বমেধ ঘাটে।

অবন্তী সহাস্যে জানান দিলেন, আমি তাহলে আপনার থেকে পাঁচ গুণ এগিয়ে আছি, দীক্ষা নেবার আগে গুরুদেবের আদেশে পঞ্চতীর্থে চান করতে হয়েছিল।

মণিকর্ণিকা দশাশ্বমেধ অসি বরণাসঙ্গম আর পঞ্চগঙ্গা—এই পাঁচ ঘাট কাশীর পঞ্চতীর্থ। বললাম, কাশীতে পনেরোশ' মন্দির আছে জানেন তো, আমি একজনকে জানতাম যিনি বছরে দুবার অন্তত ওই পনেরোশ' মন্দিরেরই দেবদেবী দর্শন করতেন, কাউকে বঞ্চিত করতেন না—আপনার ক'টি দর্শন হয়েছে ?

হেসে জবাব দিলাম, পনেরো বছরে মাত্র একটি···যেখানে আপনি অধিষ্ঠিত আছেন। দিলেন

অর্থাৎ কেবল বিশ্বেশ্বর দর্শন করেছেন। কৌতুকের অর্থ, যিনি আশুতোষ—তিনিই বিশ্বেশ্বর। ফিরে ঠাট্টা করলাম, কিন্তু অন্য দেব-দেবীরা এমন পক্ষপাতিত্ব সহ্য করলে হয়—

—অন্য দেব-দেবীর মধ্যে আমার ভয় কেবল একটি দেবতাকে, তাঁর কথা মনে হলেই আতঙ্ক।

স্মরণেও শ্যাম-মুখশ্রীতে ভয়ের ভাব আনলেন একটু।

বললাম, কে সে দেবতা—আপনার ওপর চড়াও-টড়াও হয়েছিলেন নাকি?

হাসছেন। জবাব দিলেন, অপেক্ষায় আছেন, মরলে পরে হবেন।

আমি বললাম, কাশীতে মরলে তো অক্ষয় স্বর্গবাস শুনি?

—তাহলে কাশীর আপনি কিছুই জানেন না, কাশীতে নরক নেই বলেই লোকে বলে কাশীতে মরলে স্বর্গবাস। বাইরে থেকে হাজারো পাপ করে কাশীতে মরলেও তার রেহাই আছে, কারণ কাশী যমের এক্তিয়ার নয়, এখানে নরকও নেই। কিন্তু কাশীতে বসে পাপ করে মরলে এখানকার বিচারক কালভৈরব—যমের দশগুণ কঠিন। দয়ামায়াশূন্য রুদ্র বিচার তাঁর।

ভীতির ছায়া টেনে আনলাম, বলেন কি! আমি তো এখানে এসেই মস্ত পাপ করতে শুরু করেছি!

—কি পাপ?

—একটি পরস্ত্রীর কথা ভেবেছি, ভাবছি।

হেসে ফেললেন।—এমন পরস্ত্রীর কথা ভাবলে তার উদ্ধার আর আপনার পুণ্যি।

—আপনিই বা এমন কি পাপ করেছেন যে এত ভয়!

চটপট জবাব দিলেন, আর বলবেন না, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে পাপ। জানেন, গুরুদেবকেই একদিন এই কালভৈরবের কথা জিগ্যেস করে বসেছিলাম। শুনে প্রথমে হাসলেন খুব। তারপরেই তেমনি গম্ভীর। বললেন, খুব সাবধান, বড় ভয়ংকর দেবতা, ফাঁক পেলেই তাঁর মন্দির প্রদক্ষিণ করবে এমন কি ঘুমের সময়েও। আমি বললাম, তাহলে

সেই মন্দিরেই তো পড়ে থাকতে হয়! তক্ষুনি ফতোয়া দিলেন, তাই থাকবে, মন্দির তো তোমার বুকের তলায়, আর সেখানেই তাঁর বাস—দূরে তো নয়!

দু'কান ভরে যাবার মতো। বললাম, পড়ে থাকুন তাহলে।

—দূর! হয় নাকি? ছেলেদের চিন্তা, ব্যবসার চিন্তা, মেয়েগুলোর চিন্তা, আরো হাজারো চিন্তা—এমনিতে কত রাত ঘুম হয় না, বই পড়ে রাত কাটিয়ে দিই, কিন্তু তার মধ্যে যদিই বা গুরুদেবের কথা মতো চোখ বুজে সেই মন্দিরের দিকে যেতে চেষ্টা করি, মন লাগতে না লাগাতে চোখ তাকিয়ে দেখি সকাল, তখন কোথা থেকে ঘুম এসে যেন জাদুকাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে যায়।

ভিড়ের রাস্তা পেরিয়ে আমরা ইউনিভার্সিটির দিকে এসেছি। বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। তবু একটু হাঁটার ইচ্ছেয় আমরা গাড়ি থেকে নেমেছিলাম। কথা বলতে বলতে ইউনিভার্সিটির প্রাঙ্গণ ধরে কিছুটা এগিয়ে এসেছি। আকাশের দিকে চেয়ে অবন্তী সচকিত, ও-মা, আকাশ যে কালি, বৃষ্টি এলো বলে।

ফিরে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। কিন্তু বাতাস দিয়েছে, আর ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

গাড়িতে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অবন্তী বললেন, আমরা কোন্ রাজ্যে ছিলাম এতক্ষণ, আকাশের দিকে মোটে চেয়েই দেখিনি, ইউ. পি'র এই শীতের বৃষ্টিটা বড় বিচ্ছিরি।

তুমুল বৃষ্টিই শুরু হয়ে গেল। বাধ্য হয়েই গাড়ির গতি কমাতে হয়েছে। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা পার।

—আপনি গরম জলে মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করুন, আমার নামতে কিন্তু একটু দেরি হবে।....খাবার কি পাঠাব?

বললাম নির্দয় হবেন না, জঠরে এখনো ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন রোস্ট মজুত মনে হচ্ছে, রাত্তিরে যদি কিছু খাই তো নিরামিষ হলে ভাল হয়।

—তাহলে এক কাজ করি, রাতে খিচুরি আর ভাজাভুজির ব্যবস্থা করি।

—ওয়াণ্ডারফুল।

জামা-কাপড় বদল করে যে বেশ-ভূষা চড়ালাম, আয়নার সামনে দাঁড়াতে নিজের স্বাস্থ্যখানা দেড়া মনে হল। বাথরুমে এসে গরম জলে আর সাবানে হাত দুটো শুধু ধুয়ে নিলাম। যাকে বলে হাড় কাঁপানো শীত। বিছানায় এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে কম করে মিনিট পনেরো বসে রইলাম। শান্তি।

কম্বল ফেলে নেমে এলাম। টেবিলে জাগে জল আর গেলাস থাকেই। দ্বিধা কাটিয়ে দেয়াল আলমারি খুলে বোতলটা বার করলাম। আমার জন্যই যখন, এর থেকে উপযুক্ত সময় আর কি হতে পারে। আধাআধির বেশি আছে এখনো। কাল রাত পর্যন্ত ভালই চলে যাবে।

ধীরেসুস্থে প্রথম দফা গেলাস খালি হবার আগে অবন্তী ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন বাঃ, শুরু করে দিয়ে ভালই করেছেন, যে ঠাণ্ডা—

আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলাম। সাধারণ শাড়ি আর ব্লাউসের ওপর শালটা আজ অবশ্য গায়ে জড়ানো। তবু স্নান করে এসেছেন বোঝা যায়। হেসে বললাম, ও-কথা বলে ঠাণ্ডাকে আর লজ্জা দেবেন না—

একটু হেসে ও প্রসঙ্গে বাতিল।

চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলেন। বললেন, আমার থেকে-থেকে আপনার ফাংশানের কথাগুলো মনে পড়ছে···আর কিছু প্রশ্নও মনে আসছে।

মনে পড়ল রেস্তোরাঁয় যাবার পথে গাড়িতে ঘোষালকে বলেছিলেন, ওঁর স্টেজক্রাফ্‌ট ভালো স্বীকার করতেই হবে! বুদ্ধিতে শানানো অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন, ওঁর বইয়ের থেকে ওঁকে কিছুটা চেনা যায়, কিন্তু আজ এতক্ষণের মধ্যে কেউ ওকে চিনেছে—এত কথার মধ্যে নিজেকে উনি কোথাও ধরা দিয়েছেন? শেষের উক্তি, আজ বাড়ি ফিরে ওঁকে আমি ছাড়ব নাকি।

হেসেই বললাম, আজ আমার বক্তব্যের মধ্যে আপনার কাছে

অনেক ত্রুটি ধরা পড়েছে বুঝতে পারছি—কিন্তু সেগুলো কি?

—ত্রুটি একটুও ধরা পড়েনি, বরং কান পেতে শোনার মতো সব বলেছেন। কিন্তু নিজে আপনি এই শ্লীলতা অশ্লীলতার ফারাক কতটা কমিয়ে আনতে রাজি? কতটুকু স্বাধীনতা আপনি নিজে নিতে বা কোনো লেখককে দিতে রাজি?

মন বলছে, শুধু সাহিত্যের এই প্রসঙ্গটুকুই মহিলার লক্ষ্য নয়, এই আলোচনার সেতু ধরে তিনি অন্য কোনো লক্ষ্যে পাড়ি দিতে পারেন। ইন্ধন যোগাতে পারলে এই রাতটাই স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে।

হালকা সুরেই জবাব দিলাম, দেখুন এই শব্দ দুটোর সম্পর্কে মানুষের ধারণাই তো যুগে যুগে বদলে যাচ্ছে, কোথায় আপনি সীমারেখা টানবেন?

—কি রকম একটু বুঝিয়ে বলুন।

—যেমন ধরুন, ভিক্টোরিয় যুগে ঘরের টেবিল চেয়ারের পায়া অনাবৃত দেখলেও ভয়ংকর রকমের শালীনতার প্রশ্ন উঠত না।··· উনিশ শতকের পাশ্চাত্য ফ্যাশনের হাওয়ায় মেয়েদের ব্যায়াম করাটা চূড়ান্ত ভাললাগার ব্যাপার ছিল—মেয়েদের শোনা যায় ব্যাপক ডিসপেপসিয়ার যুগ গেছে সেটা।

অল্প হেসে অবন্তী সাগ্রহে সামনে ঝুঁকলেন।

বললাম, ওই শতকে যুক্তরাষ্ট্রের একখানা বিখ্যাত ম্যাগাজিনের নাম ছিল 'গডেজ লেডিজ বুক'। মেয়েদের নামকরা ম্যাগাজিন, ঘরে ঘরে তার সমাদর ছিল। তাতে ঘরের বই সাজানো সম্পর্কে উপদেশের একটু নমুনা শুনুন।

—কোনো বিচক্ষণ গৃহিণী তাঁর সেলফে লেখক আর লেখিকাদের বই কখনো পাশাপাশি বা কাছাকাছি রাখবেন না—যথেষ্ট ফারাক রেখে সাজাবেন। তবে যদি লেখক আর লেখিকা স্বামী-স্ত্রী হন, তাহলে তাঁদের বই কাছাকাছি বা পাশাপাশি রাখা যেতে পারে।

অবন্তী হেসে ফেললেন।—আপনি অনেক খবর রাখেন আর বলেনও বেশ।

খালি গ্লাস দ্বিতীয় দফা ভরাট করে নিয়ে প্রসঙ্গের উপসংহারে পৌঁছুলাম।—রীতিমতো রক্ষণশীল মনোভাবের লেখিকা ছিলেন জর্জ ইলিয়ট। তিনি 'অ্যাডাম বিড' নামে একটি বই লিখেছিলেন, যা নিয়ে নামকরা কাগজে পর্যন্ত হৈ-চৈ পড়ে গেল। স্যাটারডে রিভিউর মতো কাগজেও তার তীক্ষ্ণ সমালোচনা বেরুলো "গ্রন্থটিতে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন তারিখ এবং তার আগের পর্যায়গুলোর বিবরণ দেখে ভয় হয়, সাহিত্য অন্তঃসত্ত্বা হতে চলেছে। প্রাচীন বিলক্ষণ লেখকেরা শিশুর আবির্ভাব ঘটাতে হলে সরাসরি তাকে এনে ফেলতেন।" তারপর দেখুন ওই 'অ্যাডাম বিড'ই লেখিকাকে যশ আর খ্যাতির মুকুট পরালো। যুগ বদলের সঙ্গে আজ দেখুন লেডি চ্যাটারলিজ লাভারও শুধু মুক্তির ছাড়পত্র পেল না, দুর্লভ সাহিত্য সৃষ্টির স্বীকৃতি পেল।

গেলাসের গুণে মেজাজ বেশ ঝরঝরে এখন, নিজের কথাগুলো নিজের কানেই ভালো লাগছিল। কিন্তু অবন্তীর ঠাণ্ডা অথচ মোলায়েম কথায় একটু সচকিত হয়ে উঠলাম। বললেন, আপনি এখন সাহিত্য নিয়ে বিতর্কের সভায় বসে নেই আর আমারও অত বিদ্যে-বুদ্ধি নেই। আমার খুব সাদাসিধে প্রশ্ন। সভায় আপনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, জীবনে সুন্দর আছে কুৎসিত আছে, ভালো আছে মন্দ আছে—এই জীবনকে সম্পূর্ণ করে দেখানোটাই আজকের দিনের সাহিত্যিকের কাজ। আমার জিজ্ঞাস্য, জীবনের কোন্ পর্যন্ত কুৎসিত আর মন্দ আপনার মতো সাহিত্যিক দেখতে পারেন আর দেখাতে পারেন?

বললাম প্রশ্নটা আর একটু প্রাঞ্জল করুন।

অপলক চেয়ে রইলেন একটু।—আপনি উদার হয়ে সাহিত্যে যৌন সংবেদনার সৌন্দর্য প্রকাশের সুপারিশ করেছিলেন···কিন্তু জীবন যদি ভুলে হোক বা ভাগ্য বিড়ম্বনায় হোক, ব্যভিচারের বীভৎস প্রকাশ হয়? আপনি বলেছিলেন সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ লেখকের থাকতেই হবে—কিন্তু ওই রকম জীবনের প্রতি কি লেখকের কোন দায়িত্ব থাকতে পারে না?

মনে হল আমার জবাবের ওপর ওঁর অনেক আশা নিরাশা নির্ভর রছে! খুব সদয় সুরেই বললাম অবন্তী, আলোচনার এই একাডেমিক দিকটা একপাশে সরিয়ে রেখে আপনার মনে যা আছে তাই সাজাসুজি বলুন না। মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি এ বিশ্বাস যদি আপনার থাকে, আপনার জীবনের ক্ষতটাই আমাকে সোজাসুজি দেখতে দিন।...গত রাতের কথাগুলো আপনার মনে আছে? প্রকারান্তরে আপনি নিজেই তো স্বীকার করেছেন, আপনাকে নিয়ে আমার ভাবনাগুলো লেখকের নিছক ভাবনা বিলাস নয়।

চেয়ে আছেন। কালো মুখশ্রী কমনীয় হয়ে উঠতে লাগল। চোখেমুখে ঠোঁটে হাসির আভাস।—মরতে মরতেও দেমাক যায় না যে, কি করব? ঈষৎ আগ্রহভরে সামনে ঝুঁকলেন একটু।—আচ্ছা, কনফেশন ব্যাপারখানা কি বলুন তো? কিছু স্বীকার করার সত্যিকারের তাগিদ, না ভাবপ্রবণতা না আর কিছু?

হেসে জবাব দিলাম, নিজের কোনো অন্যায় বা মন্দ কবুল করা মানেই তার জীবনে ভালোর শুরু।

—থাক, আর ভালোয় কাজ নেই। সত্যি এ-যে কি একটা ঝোঁক! আমি বিশ্বাস করি আমাদের গুরুদেব সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা, তবু আমার সব শোনার জন্য গেলবারে তাঁকেই আমি ধরে পড়েছিলাম—তিনি হেসে বললেন আমাকে বলার দরকার নেই—বলার মতো লোক পেলে ব'লো, কিন্তু বে-দরদীর কানে কিছু দিও না। তা বলে কারো আলগা দরদও আমি চাই না, মানুষের প্রতি আপনার এত শ্রদ্ধা বলেই লেখক হিসেবে আপনার মধ্যে আপোস নেই—আপনি যেন দয়া করে আমাকে দয়া করবেন না।

৫

যাবার দিন এসে গেল। অবন্তীকে বলেছিলাম, যাবার আগে নকুল আর সহদেবের সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হত। অবন্তী যা-ই বুঝে থাক, মুখ ফুটে জিগ্যেস করেনি, কেন। চুপচাপ দুই ছেলেকে

খবর দিয়েছে। ট্রেনের সময় ধরে ওরা গাড়ি নিয়ে এসেছে। ওরাই আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

দোতলার সিঁড়ির বারান্দায় এলাম। ব্রহ্মমহারাজের ফোটোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি, তিনি আমার দিকে। ওই চাউনির স্নিগ্ধ স্পর্শটুকু অনুভব করতে চেষ্টা করছি। মনে হল, বস্তুসর্বস্ব হৃদয়শূন্য এই কালেও এমন মানুষেরা আছেন বলেই কলির ভারসাম্য বজায় আছে।

অবন্তীর মেয়েরা সার বেঁধে এসে প্রণাম করে গেল। শেষে নিঃশব্দে অবন্তীও।

ফেরার সময়ও সহদেবই গাড়ি চালাচ্ছে। একটু ঘেঁষাঘেষি হয়ে তিনজনেই সামনে বসেছি। আমার যেটুকু শোনার ছিল তা পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু সরল উৎসাহে ওরা সেটুকুকে পঁচিশ মিনিট অর্থাৎ প্রায় স্টেশন পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। এ-ও অনেকটা কনফেশনের তাগিদের মতোই।

ট্রেন ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে হাঁপাতে হাঁপাতে বীরেশ্বর ঘোষাল এলো। বেচারার আজও অবকাশ নেই। ওর দায়িত্ব কাল শেষ হবে। আমন্ত্রিতরা সব একজোটে কাল ফিরবেন। প্রয়োজনে আমার আজ ফেরাটা আগেই ঠিক ছিল।

নকুল সহদেবের কান এড়াবার জন্য পাশে বসে আমার মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, শেষ শোনা হল না, তোমার এক্সপ্লোরেশন কমপ্লিট তো?

হেসে জবাব দিলাম, একেবারে কমপ্লিট, তবে তাতে আমার আর কি কেরামতি, এক্সপ্লোরড্ হবেন বলেই তো মহিলা নিজে কোদাল শাবল হাতে তুলে দিয়েছেন।

ওরা নেমে গেল। ট্রেন ছাড়ল।...এবারে আমি কাশীতে এসেছিলাম বটে। কাশী ছেড়ে চললাম।

খুব ধীর গতিতে স্টেশন প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে গাড়ির গতি বাড়তে থাকল।

এয়ার কনডিশনড চেয়ার-কারের একটি চেয়ারও খালি নেই।

কিন্তু এত লোকের মধ্যে এবারে আমি নিঃসঙ্গ। এবং নিশ্চিন্তও। যে-জীবন চিত্র একে একে আমার চোখের সামনে সার বেঁধে আসছে, এরপর লেখকের হাতে পড়ে তাতে কিছু অনুপ্রাস ব্যঞ্জনা আর শিল্প-কল্পনা যুক্ত হতে পারে। কিন্তু এ-ব্যাপারেও যতটুকু সম্ভব সংযত হবার প্রয়োজন অনুভব করছি।··কারণ, অবন্তীর অনুরোধ কানে লেগে আছে—'আপনি যেন দয়া করে আমাকে দয়া করবেন না।'

অবন্তী মালহোত্রার জন্ম কলকাতায়। লেখা-পড়া গান বাজনা নাচ সবই কলকাতায়। তার বাবা কলকাতার এক মস্ত মাড়োয়ারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মে কাজ করতেন। নিজের গুণে কর্তাব্যক্তিদের চোখে পড়েছেন। তারপর বছর বছর পদস্থ হয়েছেন। সেই অনুযায়ী ঠাট বজায় রাখার খরচও বেড়েছে। মোটামুটি বড় চাকরি হলেও মাসের রোজগার সীমিত। কিন্তু স্ত্রীটি সর্বদা স্বামীর উপার্জনের সীমানার মধ্যে থাকতে পারতেন না। তাঁর গানের দৌলতে বাসের এলাকায় মহিলা মহলের তিনি প্রিয়জন। এই মহলেও অবাঙালী থেকে বাঙালীই বেশি। কিন্তু তাঁর গানের বিদ্যা অর্থকরী নয়। বাড়িতে গানের আসর বসত, ছোটখাটো নাটকের অনুষ্ঠানও হত। এই সংস্কৃতি প্রীতির দরুণ ঘরে কিছু আসত না, উল্টে ঘরের টাকা থোকে থোকে বেরুতো।

অবন্তীর বাবা লোক ভালো, কিন্তু রগচটা আর বদরাগী। স্ত্রীর গান-বাজনার ঝোঁক তাঁর অপছন্দ ছিল না। বরং পছন্দই করতেন। তিনি রূপসী কিছু নন, কিন্তু তাঁকে ঘরেই এনেছিলেন গান শুনে। বড়ঘরের মার্জিত রুচির মেয়ে। বাপ তাঁর খুব ঘটা করেই বিয়ে দিয়েছিলেন। যৌতুকের সঙ্গে দামী হারমোনিয়াম তবলা তানপুরাও ঘরে এসেছিল।

অবন্তীর বাবা মানুষটি অনুদার নন, কিন্তু বিচার-বুদ্ধির হিসেবী মানুষ। আর ভিতরে ভিতরে রক্ষণশীলও। খরচের দিকটা তাঁর ভাবতে হয়, কারণ তিন-তিনটে মেয়ে। ছেলে নেই। তাঁদের সমাজে এক একটি মেয়ে পার করতে অনেক খরচ। একটা বাঁচোয়া, বড় দুই মেয়ে বেশ সুশ্রী আর মোটামুটি ফর্সা। কিন্তু ছোট মেয়ে অবন্তীর মুখখানা

বড় দুজনের তুলনায় বেশি সুন্দর, অথচ বেজায় কালো। এ-দেশে কালোর কদর নেই। তিন মেয়ে নিয়েই বাপের চিন্তা ছিল, তার মধ্যে অবন্তীর জন্য চিন্তা বেশি ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে ভদ্রলোকের কেবল এই মেয়েদের নিয়েই মাঝে মাঝে খটাখটি লাগত। মেয়েদের গুণের দিকটা বড় করে তোলার চেষ্টায় মহিলা খরচের দিকটা ভাবতেন না, বাধা পেলে বলতেন, মেয়েদের ভালো করে লেখা-পড়া গান-বাজনা শিখিয়ে যোগ্য করে তোলো, ভালো বিয়ে আপনি হবে, দিন-কাল বদলাচ্ছে।

ভদ্রলোক তেতে উঠতেন।—অর্থাৎ লেখা-পড়া গান-বাজনা শিখে যে যার পছন্দ মতো প্রেম করে বিয়ে করবে, আর আমাদের তেমন খরচের দায় থাকবে না—কেমন ?

—অতটা বলছি না, কিন্তু ওদের বিয়ের ব্যাপারে আমাদের হাত তো না-ও থাকতে পারে···।

—আলবত্ থাকবে, না থাকলে আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না !

আড়াল থেকে অবন্তী বাবা মায়ের এই বিতণ্ডা শুনত আর খুব মজা পেত। আব তাকে নিয়ে বাবার যে সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তা তা-ও জানত। আর মনে মনে ভাবত, সে এমন একখানা বিয়ে করবে বড় হয়ে, যাতে বাবার একেবারে তাক লেগে যায়। না, খরচের মধ্যে বাবাকে ও কখনো ফেলবে না। মনে মনে বাবার থেকে অবন্তী মায়ের বিবেচনার বেশি দাম দেয়। কালো মেয়ের মুখখানা কি করে আলো করে দেওয়া যায় বাবার থেকে মায়ের সে জ্ঞান ঢের বেশি। বাচ্চা বয়সে দিদিদের মতন তাবও নাক ফুটো কবা হয়েছিল। দিদিদের নাকে ছোট মটরদানার মতো একটা করে সোনার নাকছাবি। আর অবন্তীর নাকে ছিল পল্‌কা সুতোর মতো ছোট্ট একটা সোনার রিং। চৌদ্দ বছর বয়সে মা ওকে এক ছুটির দিনের দুপুরে গয়নার দোকানে নিয়ে গেল। একটু বড় আকারের একটা সাদা পোখরাজ বাছাই করে সোনার রিং খুলে সেটা ওর নাকে বসিয়ে দেখল। তারপর আর না খুলে সেটা কিনে নিয়েই বাড়ি ফিরল।

বাবা রাগ করল। দাম তো কম নয়। কিন্তু মা নির্বিকার। বলল, রাগ না করে অত দাম দিয়ে কেন সাদা পোখরাজ দিলাম মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করো।

বাবা তখনকার মতো গোঁ-গোঁ করল বটে, কিন্তু তার রাগ পড়তে সময়ও লাগল না। অবন্তী তো আর বোকা মেয়ে নয়, অনেক সময়ই লক্ষ্য করেছে ওই নাকের গয়না হবার পর বাবা মাঝে-মাঝেই আড়ে আড়ে তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

সব থেকে বেশি অবাক হয়েছিল অবন্তী নিজেই। গায়ের রং নিয়ে যে যাই বলুক অবন্তী নিজেকে কখনো কুৎসিত ভাবত না। আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখত। দিদিদের রং ফর্সা বটে, কিন্তু তাদের তুলনায় নিজের চোখে নিজেকে বরং বেশি সুন্দর লাগত। দিদিদের কি তার মতো পেটানো স্বাস্থ্য? একজনের সতেরো আর একজনের উনিশ না পেরুতে মোটার দিক ঘেঁষছে। আর মাথায় তো এখনই ও বড়দির থেকেও লম্বা। গায়ের রং কালো বলে কি পাড়ার আর স্কুল এলাকার ছোঁড়াগুলো কম তাকায় না কম জ্বালাতে চেষ্টা করে? কিন্তু নাকের এই গয়নাটি পাওয়ার পর অবন্তীর ভিতরে একটা চাপা উল্লাস। ঘরের দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। নাকের ওই একফোঁটা সাদা জিনিসটার জলুসে তার সমস্ত মুখের শ্রী-ই যেন ফিরে গেছে। মায়ের বুদ্ধি আর বিবেচনা বটে! স্কুলেও এই জিনিসটা নতুন মর্যাদা দিয়েছে তাকে। মেয়েরা কতজনে বলেছে, কি সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে এখন ভাই। আন্টিরাও অনেকে আঁড় চোখে ওর এই নতুন গয়না লক্ষ্য করেছে। কিন্তু অবন্তী জানে সত্যিকারের যাচাই হয় ছেলেদের চক্ষু দিয়ে। আগেই যে-ছেলেগুলো হাভাতের মতো চেয়ে চেয়ে দেখত, ফাঁক পেলে গা-ঘষে চলে যেত, এখন যেন তাদের হায়নার চোখ। পারলে পাথরসুদ্ধ নাকটাই কামড়ে তুলে নেয়।

সব থেকে মজার যাচাই হয়েছে একতলার ওই বরুণ নচ্ছারটার চোখ দিয়ে। এটা কোম্পানির ভাড়া করা দোতলা বাড়ি। এক-এক তলায় বড় বড় চারটে করে ঘর। দোতলার ফ্ল্যাটে অবন্তীরা থাকে।

নিচের তলাটা বাবার অফিসেরই বন্ধু অর্জুন মেহ্‌রার। বরুণ তাঁর ছোট ছেলে। অবন্তীর থেকে বছর পাঁচেক বড়, হায়ার সেকেণ্ডারিতে পড়ে। পাশ করেই নাকি দাদার কাছে ওয়েস্ট জার্মানিতে চলে যাবে! অর্জুন মেহ্‌রার দুই ছেলে দুই মেয়ে। সকলের বড় ওই দাদা আর সকলের ছোট বরুণ। কিন্তু কথাবার্তা চাল-চলনে এমন লায়েক যেন দুনিয়ায় ওর থেকে বড় কেউ নেই।

দক্ষিণ কলকাতার এটা বাঙালী এলাকা। শতেকে আশীটি বাঙালী পরিবারের বাস। কিছু মাড়োয়ারি আর মাদ্রাজীও আছে। অবন্তীর বন্ধু বা বান্ধবীরা সকলেই বাঙালী। কিন্তু সকলের থেকে ওর ওপর মাতব্বরি আর সর্দারি যার সে ওই নচ্ছার পাজি বরুণ মেহ্‌রা। উনিশ বছর বয়স না তো যেন উনত্রিশ। গায়ের রং ফর্সা, সে-যেন ওরই কেরামতি। যত্নের চোটে সেই রং ভ্যাদভেদে সাদা করে তুলছে। আর অবন্তী তেমনি কালো এ-যেন ও-ছেলের কাছে খুব একটা মজার ব্যাপার। যখন তখন জোর করে ওকে কাছে টেনে নেয়, বুড়ো আঙুলে করে ওর বাহু গাল ঘসে ঘসে দেখে আঙুলে কালো রং ওঠে কিনা। হেসে-হেসে বলে, এমন একখানা পাকা রং কোত্থেকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে এলে?

নাকে ওই সাদা পোখরাজ ওঠার পর তারই অন্য রকম চাউনি। জিগ্যেস করল, ওটা কি পাথর?

—পোখরাজ।

—পক্ষীরাজ? তাই হবে, ওটা পরে মনে হয় তুমি উড়ছ। কাছে টেনে পাথরটা খুঁটে খুঁটে দেখল। পাজির পা-ঝাড়া একখানা, পাথরটা যেন এভাবে কাছে টেনে না এনে দেখা যায় না। ফর্সা মুখে হাসি চুয়ে পড়ছে। —সত্যি, বেড়ে দেখাচ্ছে তোমাকে মাইরি!

রাগের বদলে অবন্তীর সেদিন বেজায় আনন্দ হয়েছিল। নচ্ছার পাজি হলেও অবন্তী তাকে তার ওয়েস্ট জার্মানিতে থাকা দাদার সমজদার ভাই-ই ভাবত। তার প্রশংসার সব থেকে বেশি দাম দিত। দেবে না কেন, পাড়ার সকলেই ওকে একখানা উঁচু দরের ছেলে ভাবে।

দিদিরা অবন্তীকে হিংসে করত ওর প্রতি মায়ের একটু পক্ষপাতিত্ব

দেখে। গায়ের রং কালো, তার জন্যে ওর যেন বাবা মা ছু'জনের কাছ থেকেই একটু বাড়তি নজর প্রাপ্য। এই বাড়তি নজরটা বড় বোনেরা ছোটর আদর ভাবত না। তিন বোনই ভাল মাস্টারের কাছে গান শেখে, এর ওপর মা নিজেও যত্ন করে ছোটকে দেখে, তালিম দেয়, সুন্দর সুন্দর ভজন শেখায়। বড় ছু'জনের যে আগ্রহ কম সেটা তারা স্বীকার করবে না, কেবল মায়ের দোষ ধরবে।···বাবা নাচ পছন্দ করত না বলে বড় দুই বোনের নাচ শেখা হয়নি। কিন্তু অবন্তী যখন নিজের কৃতিত্বে স্কুল থেকে গান আর নাচ দুইয়েরই প্রাইজ নিয়ে এলো, বাবার কোনো কথায় কান না দিয়ে মা ওর জন্য নাম-করা একজন মহিলা নাচের মাস্টার রেখে দিল।

অবন্তী সতেরোয় পা দেবার আট-ন'মাস আগে-পরে দুই দিদিকে নিয়ে ওদের সংসারে বেশ ছু'ছুটো বড় রকমের কাণ্ড ঘটে গেল। প্রথমে বড়দি ধরা পড়ল। সে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। আর সেই প্রেম তড়িঘড়ি এগিয়েছেও। বড়দি তখন এম-এ পড়ে। ধরা পড়তে অতবড় মেয়েকে বাবা পারলে ধরে মারে। বড়দি আলটিমেটাম দিয়েছে ওই ছেলেকেই বিয়ে করবে। বাবার স্পষ্ট কথা, আমার বংশে এরকম বেলেল্লাপনা কখনো হয়নি, হবে না। তোমার বিয়ে আমি ঠিক করব, অবাধ্য হলে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক না থাকার দিকেই গড়াতো যদি না এর মধ্যে মা দিদির দিকে ঝুঁকত আর মামাবাড়ির লোকেরাও এসে বাবাকে বোঝাতো। স্বজাতের ছেলের সঙ্গে বিয়ে, ছেলের বাপ বড় ব্যবসায়ী, তাদের বড় অবস্থা—বিয়ে দিতে বাধাটা কোথায়?

···শেষ পর্যন্ত বাবাই দাঁড়িয়ে থেকে বড়দির বিয়ে দিল। কিন্তু খুব খুশি মনে নয়। ওই ছেলে বাবার অন্তরঙ্গ জামাই হয়ে উঠতে অবশ্য তিন চার মাসের বেশি সময় লাগে নি। অবন্তী তখন নিজের মনে হেসেছে। বড়দির বড় ঘরের জলুস দেখে বাবারও চোখ ঠিকরেছে।

ছ মাস যেতে আবার নাড়াচাড়া পড়ল ছোড়দিকে নিয়ে। আর তখনই বোঝা গেল, বড়দির বিয়ের ব্যাপারে ছোড়দির কেন অত উৎসাহ

আর বাবার ওপর অত রাগ দেখা গেছল। আসলে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো দুই ভাই দুই দিদির সঙ্গে প্রেম করছিল। এদেরও ব্যবসা, বড় অবস্থা। প্রস্তাবটা বড়দির মারফৎ এলো, সেই কারণে মায়েরও খুব আগ্রহ। বড় জামাই তো ততদিনে জামাইয়ের মতো জামাই! তার ওপর ছোড়দিও স্পষ্ট ঘোষণা করল, ওখানে ছাড়া অন্যত্র আর কোথাও বিয়ে করবে না। এবারে অবশ্য বাবার হম্বিতম্বি আর হুংকার শোনা গেল না, কিন্তু গুম হয়ে রইলো। তারপর নিজে দাঁড়িয়ে আবার এই বিয়েও দিল।

অবন্তী এবারও মনে মনে হেসেছিল। না, দু'বোনের একটা বরকেও ওর পছন্দ নয়। অবন্তী তাদের ঠোঁট উল্টে বাতিল করে দিত। টাকা গাড়ি বাড়ি ছাড়া আর কি আছে? ওর বিয়েটা বাবা মায়ের তাক লাগার মতোই হবে এ বিশ্বাস কেবল অবন্তীর নিজেরই ছিল। কেউ জানে না, খুব পরিচিত একজনকে ঘিরে ওরও একটা জগৎ গড়ে উঠেছে। পাজির পা-ঝাড়া হলেও যাকে বলে ঝকঝকে ছেলে। পাজি বলেই অবন্তীর কাছে তার কদর বেশি।...দু'দিন বাদে দাদার কাছে ওয়েস্ট জার্মানিতে যাচ্ছে। এখানকার কলেজের পড়া ছেড়েই চলল সে। সেখানে থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের বনিয়াদ গড়বে নাকি। তারপর দেশে ফিরে অবন্তীকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। এ-সব কথা-বার্তা ওদের মধ্যে পাকা।

...সেই ছেলে নিচের তলার বরুণ মেহরা। বাইশ বছরও বয়েস নয়, সে এখন দোতলায় এই কালো মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। বলে, তোমার মতো সুন্দর কেউ নয়, তুমি কালো না হয়ে ফর্সা হলে এত সুন্দর লাগত না। অবন্তী অবিশ্বাস করবে কেন? ওর বয়স এখন সতেরো পেরিয়েছে—নিজের কি চোখ নেই? আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে না?

চলে যাবে, তাই ফাঁক পেলেই অবন্তীকে ধরে একটা চুমু খেতে চায়। শুধু চায়? এ-জন্য হাত জোড়ও করেছে। কিন্তু অবন্তী ভিতরে নরম হলেও বাইরে দস্তুরমতো শক্ত। এখন পর্যন্ত অ্যালাউ করেনি। মতলব বুঝতে পারলে ছিটকে সরে গেছে।

কিন্তু ও দূরে চলে যাবে বলে অবন্তীর কি কম মন খারাপ ? কত দূরে চলে যাবে, কবে আবার দেখা হবে। তবে মন খারাপের ভাবটা অবন্তী ঝেড়ে ফেলতেই চেষ্টা করে। পুরুষ মানুষ বড় হবার জন্য দূরে যাবে না তো কি ? বাইরের দুনিয়াটা দেখার সাধ অবন্তীর কি কম নাকি। বড় জগতে যাবার মেজাজ দেখেই তো বরুণকে আরো বেশি পছন্দ।

…ভাবছে যাবার আগে একটা চুমু ওকে খেতে দেবে। কিন্তু ব্যাপারটা ভাবতে গেলেও যে দু'কান গরম হয়ে ওঠে। কোথায় এটা সম্ভব হতে পারে ? ওই ছেলে দুই একবার এই চেষ্টা করেছে ওকে নিজের ঘরে পেয়ে। কিন্তু দু'দিন বাদে চলে যাবে বলে এখন তো ওই ছেলে ওদের বাড়ির লোকের চোখের মণিটি। নিজে যেমন তোড়জোড়ে ব্যস্ত, বাড়ির লোকও তাকে সর্বদাই ঘিরে আছে। নিচে আর ওর ঘরেও সুবিধে হবে না। সন্ধ্যার পর কোনো এক ফাঁকে ছাদে ডেকে নিয়ে যেতে পারে, বাবা রাত সাতটা সাড়ে সাতটার আগে বাড়ি ফেরে না। মা এটা-সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবু দু'জনকে ছাদ থেকে নামতে দেখে ফেললে কার না সন্দেহ হবে ? আর, কেউ দেখে না ফেললেই বা কি। ব্যাপারটা ভাবতে গেলেই অবন্তীর মাথা ঝিমঝিম আর বুক দুরুদুরু।

বেশ একটা সমস্যার মধ্যেই পড়েছে অবন্তী। দুপুরে নিজের ঘরে শুয়ে একটা সমাধানের পথই খুঁজছিল। যাবার আগে ওই ছেলেকে একটু খুশি করার তাগিদটা বড় অদ্ভুত।

খুট করে কানে একটু আওয়াজ আসতে অবন্তী চমকে এ-পাশ ফিরল, তারপর ধড়মড় করে উঠে বসল। বরুণ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে। ঘুরে দাড়ালো। হাসছে মিটিমিটি। চোখে শয়তানি। দু'হাত জোড় করে সে নীরবে মিনতি জানালো, অর্থাৎ দয়া করে চুপ একেবারে। তারপরে কাছে এসে বলল, পরশু চলে যাচ্ছি কিন্তু তুমি বড় নিষ্ঠুর…

অবন্তী নেমে এসে রুদ্ধশ্বাসে বলল, তুমি একটা ডাকাত, শিগ্‌গির চলে যাও।

কানেই গেল না। বলল, আমি দেখে এসেছি তোমার মা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। তোমার কি-চ্ছু ভয় নেই, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে যাব।

চোখের পলকে দু'হাতে ওকে টেনে নিয়ে বুকে চেপে-ধরে চুমু খেল —একটা চুমুই যেন আর শেষ হয় না। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই তারপর ফিসফিস করে বলল, এবারে তুমি—

প্রাণের দায়ে অবন্তী মুহূর্তের মধ্যে সেরে ফেলে অব্যাহতি পেতে চাইলো। কিন্তু অন্যজনে তা হতে দিলে তো। এমন চেপে ধরে আছে যে মুখ তুলতেই দিচ্ছে না। তারপর মুহূর্তের মধ্যে যে কাণ্ড করল অবন্তীর হার্ট ফেল করা বিচিত্র ছিল না। বোকা বলেই ও খাটের পাশে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্রয়টুকু দিয়েছিল। চোখে লাল নীল সবুজ দেখছে। তারপর অন্ধকার। তারপর দিশেহারার মতো দেখে ওকে শয্যায় ফেলে দস্যু একেবারে ওর বুকের ওপর। চুমোয় চুমোয় ওর দম বন্ধ হবার দাখিল। সেই সঙ্গে আসুরিক তৎপর হাতে ওর শরীরটাকেও ইচ্ছেমতো দখলে আনার চেষ্টা।

—এই! মায়ের গলা! অবন্তী অস্ফুট স্বরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

চমকে ছেড়ে দিতেই অবন্তী টুক করে খাটের ওপাশ দিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। বোকা বনেছে বুঝতে পেরে বরুণ উঠে বসল। ফর্সা মুখ টকটকে লাল। রেগেই গেছে। সদর্পে বলল, আসুক তোমার মা, আমি নড়ছি না।

—পালাও, সাত্যি মায়ের ওঠার সময় হয়েছে!

—তাহলে কাল আবার আসব বলো—কালই তো শেষ দিন। রাগ নয়, গলার স্বরে এবারে মিনতি।

—না না!

—তাহলে কথা দাও, কাল দুপুরে তুমি আমার পড়ার ঘরে আসবে, আমি আগে থাকতে ঠিক অন্যদের হটিয়ে দেব—তুমি কথা না দিলে আমি যাচ্ছি না।

অবন্তীর সর্বাঙ্গে কি-রকম তপতপে স্পর্শ একটা। মুহূর্তের মধ্যে

ভেবে নিল, ওই ঘরে খাট-টাট কিছু নেই, তবু জিগ্যেস করল, এ-রকম বজ্জাতি করবে না তো?

—আচ্ছা ঠিক আছে, একটুও দুষ্টুমি করব না, শুধু ছোট্ট করে একটা বিদায়ী চুমু খাব। পার্টিং কিস্ না পেলে আমার যাত্রা শুভ হবে?

পরদিন বাবা অফিসে বেরুনোর পর থেকেই অবন্তীর মাথায় দুঃশ্চিন্তার বোঝা। বার বার ঠিক করছে, যাবে না, রওনা হবার সময় গিয়ে দাঁড়াবে শুধু। কিন্তু মনে ভয়ও কম নয়, ওই ছেলের ইচ্ছেটুকু পূরণ না করলে যাত্রা যদি সত্যিই অশুভ হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতাও বাড়ছে। ভয় আবার যাবার লোভও।

দুপুর আড়াইটে নাগাদ পা-টিপে নেমে এলো। কিন্তু একতলার কোথাও তার দেখা পেল না, নিজের ঘরে বা বারান্দায় কোত্থাও না। পা-টিপেই ফিরে আসছিল কিন্তু বরুণের এক দিদির হাতে ধরা পড়ে নাকাল হবার দাখিল। দিদিরা দু'জনেই শ্বশুর বাড়ি থাকে, ছোট ভাই চলে যাবে বলে এসেছে। মেয়েটাকে হকচকিয়ে যেতে দেখে জিগ্যেস করল, কি রে?

—ইয়ে, ব-ব্-বরুণ কাল চলে যাবে বলে এসেছিলাম।

—তা অমন চুপি চুপি যাচ্ছিস কেন? এক দিদির সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।—বরুণ তো এয়ার অফিসে কি-সব খবর-টবর নিতে গেছে, ফিরতে বিকেল হবে বলে গেছে।

অবন্তী ওপরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল, আবার ভিতরে ভিতরে রাগও হতে থাকল।

রাতে বরুণ নিজেই এলো দেখা করতে। বাবা মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মা ওকে কিছু না খাইয়ে ছাড়বে না। অবন্তীর ঘরেই ওকে বসতে বলল। আর মেয়েকেই বলল, নিয়ে গিয়ে বসাতে। এ-বেলায় একেবারে সুবোধ ছেলে, আগে আগে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল, তার পিছনে অবন্তী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা চুমু খেয়ে নিল। বড় জোর দুই কি তিন সেকেণ্ড।

দুঃসাহস দেখে অবন্তী তাজ্জব। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই পায়ের তলা

থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। বরুণ হাসতে হাসতে একটা চেয়ার টেনে বসল, দুপুরে নিচে গেছলে নাকি ?

—জানি না যাও! অবন্তী চাপা রাগে ঝাঁঝিয়ে উঠল, মা বা আর কেউ দেখে ফেললে কি হতো ?

—অমন কাঁচা কাজ আমি করি না, তোমার পিছনে কেউ আসছিল না আগেই দেখে নিয়েছিলাম, দুপুরে কথার খেলাপ করেছিলাম, সেটা কাটিয়ে দিলাম···সত্যি সকাল থেকে এমন যাচ্ছে না—ভুলেই গেছলাম।

দু'চার কথার পরেই খুশি মুখে বরুণ প্রস্তাব করল, ওয়েস্ট জার্মানি গিয়ে সে অবন্তীকে মাসে একখানা করে চিঠি লিখবে, আর অবন্তীকেও তাকে মাসে একখানা করে চিঠি লিখতে হবে। তা না হলে ও খুব রেগে যাবে।

অবন্তীর চক্ষু স্থির, তুমি এখানে চিঠি লিখলে বাবা মা টের পেয়ে যাবে!

—কি ভীতু মেয়ে না তুমি! ঠিক আছে, তুমি তোমার বন্ধু জয়া ঘোষকে বলে রেখো, তার ঠিকানায় চিঠি লিখব, ওপরের খামে তার নাম থাকবে, ভিতরের খামে তোমার নাম, আর তুমি সরাসরি আমাকে লিখবে।

পাশের বাড়ির জয়া ঘোষ অবন্তীর প্রাণের বন্ধু, কিন্তু ডাঁটিয়াল মেয়ে। ইংলণ্ডে আমেরিকায় তার পেন-ফ্রেণ্ড আছে, তার চিঠি এলে কেউ খোলে না।

অবন্তী মনে মনে বুদ্ধির তারিফ করল। চট করে এত সব তার মনে আসে না। দুপুরের ভুলে যাওয়া আর হাট করে খোলা ঘরে এসে পলকে ওই কাণ্ড করার মধ্যে ওর চোখে পুরুষের জোরালো দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে।

পরের মাসেও নয়, জয়া ঘোষের মারফত বরুণের চিঠি এলো মাস আড়াই বাদে। লিখেছে এর মধ্যে বেশ কয়েকটা দেশ ঘুরেছে। সে-দেশের মেয়েদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সব মেয়েই কি সুন্দর আর কত ফ্রি

কিন্তু অবন্তীর মতো সুন্দর মুখ সে নাকি এখানে এসে একটিও দেখল না। আর তার মতো মেয়ের কাছ থেকে জোর করে চুমু আদায় করার আনন্দও এখানে নেই। হ্যাংলা মেয়েগুলো নিজে থেকে মুখ বাড়িয়েই থাকে। লম্বা চিঠিতে অনেক উচ্ছ্বাস আর প্রতিশ্রুতি। সে অনেক বড় হবে, দেদার টাকা রোজগার করবে, তারপর দেশে এসে অবন্তীকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে ভোগের সমুদ্রে ডুববে। অবন্তী যেন সেই মতো নিজেকে তৈরি করে। নাচে গানে অদ্বিতীয়া হয়ে ওঠে।

তারপর আবার তিন মাস যায় ছ'মাস যায় বছর ঘুরে আসে। প্রথম চিঠির জবাব দেবার পর অবন্তী আরো দু'খানা চিঠি লিখেছিল। একখানারও জবাব নেই।

একে একে তিনটে বছর কেটে গেল। অবন্তী মালহোত্রা রবীন্দ্র ভারতী থেকে মিউজিক নিয়ে সসম্মানে বি, এ পাশ করল। একই বিষয় নিয়ে এম-এ'তে ভর্তি হয়েছে। নাচ আর গান ধ্যান-জ্ঞান। কোনো ফাংশনে গিয়ে নাচাটা বাবা এখন আর পছন্দ করেন না। কিন্তু গানে আপত্তি নেই। অথচ গানের থেকে অবন্তীর নাচ কম পছন্দ নয়।

এক মহিলার হা-হুতাশ থেকে বরুণ মেহরার খবর অবন্তীর একেবারে অজানা নয়। তিনি বরুণের মা। অবন্তীর গান তাঁর খুব ভালো লাগে। একতলায় এখন তো শুধু ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর বাস। ভজন বা কীর্তন শোনার ইচ্ছে হলে বরুণের মা দোতলায় উঠে আসেন, বাতের যন্ত্রণা বাড়লে অবন্তীকে ডেকে পাঠান। না, ছোট ছেলে এখন ঠিক কোথায় ওঁরাও জানেন না। খুব সম্ভব ফ্রান্সে। শেষ চিঠিতে বড় ছেলে তাই লিখেছিল। ছোট ভাইয়ের ওপর সে তিক্তবিরক্ত। ওখানে গিয়ে দেড় দুই বছর পড়াশুনা করেছিল। তারপর দাদার কাছ থেকে সরে গেছে। দাদা লিখেছে, রাতারাতি বড়লোক হবার নেশায় পেয়েছে ওকে, কোথায় আছে কি করছে কিছুই জানায় না। ফ্রান্সে আছে তা-ও এক দাদা তার বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছে।

···এ-দিকে বাড়িতে সকলে বেঁচে আছে কি নেই, এ খবরও ছেলে রাখে না।

এরপরে ঠিকানা পেয়ে ওর মা তিন চারখানা চিঠি লিখে একখানার

জবাব পেত কিনা সন্দেহ। কিন্তু আরো বছর খানেক বাদে ওই ছেলে বাড়িতে বেশ একটা চমক দিয়েছে। বাড়িতে মায়ের নামে হঠাৎ টাকা পাঠিয়েছে ফ্রান্স থেকে। কম টাকা নয়। এ-দেশের অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় পঁচিশ হাজারের মতো হবে। লিখেছে, মা, এ-দেশের একদল মানুষ বেজায় কুঁড়ে, আবার তার মধ্যে অন্য দলের কিছু মানুষ দু'দিকে দুটো ডানা লাগিয়ে টাকার পিছনে ওড়ে। তোমার ছেলে এই দ্বিতীয় দলে নাম লিখিয়েছে। মোটে বিশ্রাম নেই, কেবল কাজ আর কাজ। দাদা আমার ওপর রেগে আছে, তোমরাও এই অযোগ্য ছেলের আশা ছেড়ে দিয়েছ জানি। কিন্তু এটুকু শুধু বলতে পারি আমি বসে নেই। যতদিন কোনো খবর পাবে না ততদিনই ভালো আছি জেনো। দাদার কাছে গেছলাম, শিগ্‌গিরই সে ওয়েস্ট জার্মানি ছেড়ে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। সব শেষে লিখেছে, ওপর তলার মালহোত্রাদের খবর কি? অবন্তীর কি বিয়ে থাওয়া হয়ে গেছে? ওকে বোলো আমি কাউকেই ভুলিনি।

তারপর আবার দেড় দু'বছরের মধ্যে কোনো খবরই নেই। অবন্তী মালহোত্রা মিউজিকে এম-এ পাশ করেছে। এরও প্রায় সাত আট মাস আগে তার জীবনে আর একটি পুরুষ এসেছে। জোরালো পুরুষ নয়। কিন্তু তার নীরব, প্রায় ভীরু আবেদনের একটা জোর আছে। নামের চটক আছে। সমর সিংহ। বাঙালী। সগোত্রে স্বজাতের থেকে অবন্তীর বাঙালী প্রীতি বরাবরই বেশি। তা বলে কোনো বাঙালীকেই জীবনের দোসর করবে এমন চিন্তা মনের তলায় ছিল না। না থাকার প্রধান কারণ বাবা। এ-দিক থেকে বাবা কট্টর রক্ষণশীল। না থাকার দ্বিতীয় কারণ, বরুণ মেহেরাকেই তো সে তার জীবনের অবশ্যম্ভাবী পুরুষ ধরে নিয়েছিল। তাই বাঙালীর দিকে চোখ বা মন দেবার কোনো কারণই ছিল না। কিন্তু পরে দেখল চোখের বার তো মনের বার। এ-দেশ ছাড়ার পর বরুণ একটা মাত্র চিঠি লিখেছিল। কিন্তু ওই চিঠির জবাব ছাড়াও পর পর আরো দু'খানা চিঠি লিখেও কোনো উত্তর না পেয়ে অবন্তী মনে মনে হতবাক। তার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত ভাবতে

বা বিশ্বাস করতে পারে নি বরুণ তাকে ভুলে গেছে বা ভুলে যেতে পারে। একে একে এতগুলো বছর কাটতে মোহ ভেঙেছে।

সমর সিংহকে অবন্তী আগে থাকতেই চিনত। পাড়ার ছোট এক মিউজিক স্কুলের মালিক। নিজের উদ্যমে এই স্কুল খুলেছে। সেখানে মেয়েদের নাচ গান দুই-ই শেখানো হয়। কিছু ছেলেও আছে, শুধু গান শেখে। সমর সিংহও রবীন্দ্র ভারতীর ছাত্র কিন্তু অবন্তীর থেকে সাত আট বছরের সিনিয়র। বছর উনত্রিশ ত্রিশ হবে বয়েস। বিনয়ী এবং ভদ্র। দেখতেও সুশ্রী। অবন্তী যখন মিউজিক নিয়ে বি-এ পড়ে তখন গানের থেকেও তার নাচের কদর বেশি। কাছাকাছির মধ্যে ফাংশন হলে নাচের আমন্ত্রণ বেশি পায়। অবশ্যই অ্যামেচার আর্টিস্ট হিসেবে। কিন্তু যে কোনো আসরে নাচের থেকে গানের অ্যামেচার আর্টিস্টদের চারগুণ ভিড়। অবন্তী এজন্য মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। যারা গানে চান্স পায় তাদের বেশির ভাগের থেকেই ও ভালো গায়। হলে কি হবে, যার যেমন খুঁটির জোর। অবন্তীর হয়ে সুপারিশ করার আর কে আছে। যে ওস্তাদের কাছে বাড়িতে খেয়াল আর ভজন শেখে, এ-সব জলো ফাংশন তাঁর দুচক্ষের বিষ। তাঁর কেবল এক উপদেশ, সঙ্গীত সাধনার জিনিস, ফাংশনে গাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ো না।

এ-দিকের এলাকায় কোনো ফাংশন হলে সমর সিংহের প্রোগ্রাম তো থাকতই। পাড়ার ছেলেদের কাছে সমর সিংহ মস্ত গায়ক। তার গান অবন্তী অনেক শুনেছে। মাঝে মাঝে রেডিও প্রোগ্রাম থাকে। গলা ভালো আর মিষ্টি। কিন্তু কবিতার মতো আধুনিক গানই বেশি গায়। কখনো সখনো দুই একটা রাগপ্রধান শোনে। কিন্তু সেটা তেমন উঁচুদরের মনে হয় না।

রবীন্দ্র ভারতীতে সমর সিংহর কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, তাই যাতায়াতও আছে। সেখানে মাঝে মাঝে তার চোখের দেখা মেলে। আর, যে কারণেই হোক ভদ্রলোক তাকে লক্ষ্য করে সেটা অনুভব করতে পারে।

···তখন একুশ বছর হবে অবন্তীর বয়েস। সমর সিংহ একদিন সোজা ওদের বাড়িতে উপস্থিত। অবন্তীর সেটা এম, এ-র মাঝামাঝি

সময়। অবন্তী ভিতরে ভিতরে খুব অবাক। বাড়িতে ছেলেদের আনাগোনা বাবা এখনো তেমন পছন্দ করেন না। সেই সকালে তিনি অফিসে। অবন্তী তাকে খাতির করে বসালো। সমর সিংহ সবিনয়ে বলল, আশা করছি আমি একেবারে অচেনা লোক নই ?

খুব একটা ভক্ত না হলেও অবন্তী হেসে মাথা নাড়ল। সপ্রতিভ মুখে বলে গেল, না, আমি আপনাকে খুব চিনি। রেডিওতে আর ফাংশনে আপনার গান অনেক শুনেছি, আর এও জানি, আপনি আমাদের য়ুনিভার্সিটির পুরনো ছাত্র।

—সাত বছরের পুরনো, নাম ধরে আর তুমি করে বললে আপত্তি হবে কি ?

—মোটেই না। কিন্তু মনে মনে অবাক একটু, এই লোক ওর কাছে কি উদ্দেশ্যে ?

উদ্দেশ্য শুনল।—কয়েকটা ফাংশনে আমি তোমার নাচ দেখেছি। খুব ভালো লেগেছে। আমার একটা ছোট নাচ-গানের স্কুল আছে—

কথার মাঝেই অবন্তী বলল, জানি—

—তুমি একটু সাহায্য করতে পার কিনা এই আশা নিয়ে এসেছি, আমার বেশি দেবার ক্ষমতা নেই, মেয়েদের শনি-রবিবারে যদি নাচ শেখাতে···

হাসি মুখে অবন্তী তক্ষুনি বলল, য়ুনিভার্সিটিতে আমি গানের ছাত্রী, নাচের না।

—জানি গানের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর অভাব নেই, নাচের জন্য একজন আছেন, আরো একজন দরকার।

অবন্তী বলল, বেশ নাচ শেখাব, কিন্তু গান শেখানোর সুযোগও আমাকে একটু আধটু দিতে হবে—কোনোটার জন্যেই আপনাকে টাকা দিতে হবে না।

সমর সিংহ মাথা নাড়ল, একেবারে কিছু না নিলে তো অসুবিধে, দেবার ক্ষমতা খুবই কম বললাম তো, আমার দিক থেকে দরদটুকুই আসল দাবি, তবু···

—ঠিক আছে, আপনার যা সুবিধে তাই দেবেন তাহলে।

বাবার অমতেই কাজটা নিল অবন্তী। আর খোদ মালিকের খাতির কদর পেতে থাকল। সমর সিংহকে নিয়ে গান-বাজনার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা মাত্র পাঁচ, তার মধ্যে একজন সেতার শেখায়, বাকি চারজন গান। আর নাচের শিক্ষয়িত্রী অবন্তী ছাড়া আর একজন। আর দু'জন তবলচি। মোট সাতজন নিয়ে স্কুল। শনি-রবিবার ছাত্রীসংখ্যা দু'শিফটে আশি পঁচাশি জন।

...কিন্তু কিছুদিন না যেতে অবন্তীর মনে হল তাকে পেয়ে, সমর সিংহ যত খুশি আর উৎসাহিত, অন্য শিক্ষয়িত্রীরা যেন ততো নয়। মালিক আর দুই তবলচি ছাড়া বাকি সকলেই মহিলা। তাদের আচরণ অভব্য না হলেও অন্তরঙ্গ আদৌ নয়।

কথায় কথায় হাসি মুখেই সমর সিংহকে একদিন বলল, আপনার স্কুলের অন্য শিক্ষয়িত্রীদের আমাকে বোধহয় তেমন পছন্দ নয়। ...আপনি লক্ষ্য করেছেন?

সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা গম্ভীর। জবাব না দিয়ে ফিরে প্রশ্ন করল। কার কার পছন্দ নয় নাম বলো?

—না না, অবন্তী ফাঁপরেই পড়ল, এভাবে বলাটাই আমার খুব ভুল হয়েছে। আর আপনিও ভুল বুঝেছেন। হয়তো আমি অবাঙালি বলেই কেউ আমার সঙ্গে সেধে মেলামেশা করতে চায় না। আপনি যেন এ নিয়ে কাউকে একটি কথাও বলবেন না।

—বললে তোমার ভয়টা কি?

এই মেজাজ ভালো লাগল না অবন্তীর। হেসেই জবাব দিল, বললে আপনার স্কুলে আর আমাকে দেখবেন না।

সমর সিংহ থমকে চেয়ে রইলো একটু। বলল, তোমাকে অপছন্দ করার কারণ হিংসে। সেদিন তোমার গানের ট্রায়েল নিতে অনেকেরই মুখ শুকিয়েছে। তাদের স্বার্থে ঘা পড়ল ভাবছে। সুমিত্রা চক্রবর্তীর একটা গানের ক্লাস তোমাকে দিয়েছি বলে সে নাকি বলে বেড়াচ্ছে, এবারে তার চাকরি যাবার সময় ঘনাচ্ছে ··বোঝো, এদের কি রকম মন।

শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে সুমিত্রা চক্রবর্তীই বয়স্কা, বছর ছত্তিরিশ বয়েস।

মাস গেলে সমর সিংহ খামে পুরে অবন্তীর হাতে দেড়শ' টাকা দিয়েছে। বলেছে, খুব লজ্জার, এটা মাইনে ভেব না—স্কুল বড় হলে আমি কারো সাহায্য ভুলব না।

অবন্তীর হাঁসফাঁস দশা। আন্তরিক সুরেই বলেছে, আমার কাছে এ তো অনেক টাকা !

এই মাসেই ডাকে সে একটা চিঠি পেল। নিচে নাম স্বাক্ষর দেখল, তপতী মজুমদার। বক্তব্যের সার, আপনার নাচের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে নিয়োগ আর আমার সেই পদ থেকে বরখাস্ত একই সঙ্গে হয়েছে। হয়তো খবরটা আপনার এখনো অজানা। আমার তুর্ভাগ্যের কারণ আমি আজও জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। ওই স্কুলের শুরু থেকে আমি ছিলাম। আমি কোনরকম অভাব-অনটনের দরুন আপনাকে এ-চিঠি লিখছি না. ওখান থেকে আরো ভালো চাকরি আমার ইতিমধ্যে জুটেছে। কেবল শিল্পী-মালিকের অপমানটুকু বরদাস্ত হচ্ছে না। প্রার্থনা, ভবিষ্যতে আপনাকেও যেন এমন অপমানের স্বাদ পেতে না হয়।

চিঠিটা পেয়ে অবন্তী মালহোত্রা গুম হয়ে বসে রইলো খানিক। খুব ভদ্র চিঠি, ভদ্র অভিযোগ। কিন্তু কোথায় যেন একটু নোংরা ইঙ্গিত আছে।

অবন্তী বোকা একটুও নয়। তিন মাস না যেতে এই মানুষ তার অনেকটাই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। স্কুলে ঘুরেফিরে তার নাচের ক্লাস গানের ক্লাস নেওয়া দেখতে আসে। স্কুলের মালিক হিসেবে এটা তার কর্তব্যের অঙ্গ কিন্তু সবটাই নীরস কর্তব্যের তাগিদ মনে হয় না অবন্তীর। উৎসাহ বা উদ্দীপনার এমন একটু রং আছে যা অনুভবে ধরা পড়ে। ওই লোকের কাছে সে কিছুটা কৃতজ্ঞ তো বটেই। এরই মধ্যে কাছে-দূরের তু'-একটা বড় আসরে তার গানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যদিও তাতে সুনাম ভিন্ন আর কিছু প্রাপ্তিযোগ ছিল না। তাছাড়া তার আগ্রহেই রেডিওতে অডিশন টেস্ট হয়ে গেছে। আশা করা যায় প্রোগ্রামও পাবে। তবে অবন্তীর মনে একটু বিস্ময়, ওই লোকের কাছে এখনো গানের থেকে ওর নাচের কদর বেশি।

বিকেলের দিকে মাঝে মাঝেই তাদের বাড়িতে আসে। বাবা অফিসে থাকে, কিন্তু মা ঠিকই লক্ষ্য করে। লোকটির সম্পর্কে নানা কথা জিগ্যেস করে। অকারণ ভয়ের ছায়া না পড়লে আর মা কিসের জন্য এত খুঁটিয়ে খবর নেবে? মোট কথা এই লোকের ঘনঘন বাড়িতে আসার ফলে মা সন্দিগ্ধ। সমর সিংহ সেদিন আসতে চা দেবার কথা বলেই অবন্তী সরাসরি তাকে জিগ্যেস করল, আমার আগে তপতী মজুমদার নামে কোনো মেয়ে আপনার স্কুলে নাচের শিক্ষয়িত্রী ছিল?

সচকিত একটু।—ছিল। কেন বলো তো?

জবাবে অবন্তী চিঠিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

পড়ে থমথমে মুখ। —এ-চিঠির তুমি গুরুত্ব দিচ্ছ খুব?

—না, খুব খারাপ লেগেছে, আমার ঠিকানাই বা উনি পেলেন কোথায়?

—তেতো মুখ করে জবাব দিল, স্কুলেরই কেউ দিয়েছে, সকলেই তো খুব মিত্র আমার।

—কিন্তু তাঁর অভিযোগটা কি···আমার নিয়োগ আর তাঁর বরখাস্ত একই সঙ্গে হয়েছে—এর মানে কি?

—মানে খুব সহজ, তোমার কাছ থেকে কথা পেয়ে তাঁকে আমি নোটিশ দিয়েছি—শনি রবি আর ছুটির দিনের ভরসায় আমাদের স্কুল, এর মধ্যে যদি তাঁর অন্যত্র নাচের প্রোগ্রাম লেগেই থাকে, আমার পোষায় কি করে?

স্কুল যে এই লোকের প্রাণ এটা অবন্তী অনুভব করতে পারে। গানের কোনো শিক্ষয়িত্রী কামাই করলে নিজে তার ক্লাস নেয়, কিন্তু দরকার হলে নিজে তো আর নাচ শেখাতে পারে না।···এই মানুষ ক্রমে আরো অন্তরঙ্গ, আরো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। প্রায়ই বলে, স্কুলের জন্য কারো প্রাণ নেই, দরদ নেই, কারো মনে স্কুলটা বড় করার স্বপ্ন নেই, এটা যেন একটা ডিঙি নৌকো, সকলেই এখান থেকে ছুটে গিয়ে বড় নৌকোয় পা ফেলার অপেক্ষায় আছে। আমি কিচ্ছু কেয়ার করি না, কেবল তুমি ধৈর্য ধরে আমার সঙ্গে

থাকো, এটাকে নিজের প্রতিষ্ঠান ভাবো—এ অনেক, অনেক বড় হবে —হবেই।

অবন্তীর ভালো লাগত। বিশ্বাসও করত।

পাশ করে বেরুনোর একটা বছরের মধ্যে বিশ্বাস আর ভালো লাগা দ্রুত তালেই বেড়েছে। সেটা পরস্পরের হাত ধরে চলার দিকে খুব স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়েছে। না, স্কুলই তখন এই লোকের ধ্যান-জ্ঞান-নেশা নয়। অবন্তী তার জীবনে এলে তবেই সব সফল।

অবন্তী নিশ্চিন্ত বিশ্বাসেই এসেছিল। এম-এ পরীক্ষার পরে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছল। পরে জানাজানি। বিয়ের সময় অবন্তীর দিক থেকে একজনই মাত্র সাক্ষী। তার প্রিয় বান্ধবী জয়া ঘোষ, যে এখন জয়া মিত্তির। মস্ত বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। স্কুলে পড়তে তার মা চোখ বুজেছিল। বি-এ পাশ করার পরেই এক ব্যারিস্টার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছল। বিয়ের দেড় বছরের মধ্যে তার বাবা মারা যেতে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে সে নিজের বাড়ির দখল নিয়েছে। তার স্বামীর বাস আর দপ্তর এ-বাড়িতেই।

অবন্তীর বিয়ের তিন দিনের মধুযামিনী যাপন জয়া মিত্তিরের বাড়িতেই হয়েছে। অবন্তীর বাড়িতে জেনেছে, ও তিন দিনের জন্য দীঘা বেড়াতে গেছে।

খুব সাদামাটা দু' ঘরের একটা বাড়ি ভাড়া পেতে সমর সিংহর দিন পনেরো সময় লেগেছে। চার ভাইয়ের যৌথ পরিবারে তার পক্ষেও অবন্তীকে নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। মালহোত্রা কতটা বাঙালিনী আর কতটা নয় সেটা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অবন্তীর মনে এজন্য এতটুকু অভিযোগ ছিল না।

অবন্তীর বাবা জানার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিমূর্তি। তিনি তক্ষুনি ঘোষণা করেছেন মেয়ের সঙ্গে আর তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকল না। অবন্তী জানত এরকম হবে। কেবল একটু আশা ছিল সময়ে সব সয়ে যাবে। কিন্তু তার চিন্তায় একটু ভুল ছিল। অন্য দুই জামাই ধনী। টাকার জাদু সম্পর্কে অবন্তীর খুব ধারণা ছিল না।

অবন্তীর এই বিয়ে আট মাসের মাথায় বরবাদ। সংসার করা যাকে বলে—এই আট মাসের মধ্যে তিন মাসও তা করেনি।···সমর সিংহ তার গান নিয়ে এত ব্যস্ত যে কিছুদিন না যেতে বেশি রাতের আগে ঘরে ফেরে না। আবার মাসে চার-পাঁচদিনও বাইরের ফাংশনে যায়। এই ব্যস্ততা বা বাইরে যাওয়াটা যে সত্যি নয়, অবন্তী তা-ও জেনেছে। কোনো কোনো রাতে মদ খেয়ে ফেরে। তখন কথা বলতে গেলে স্বামী মুখের ওপর বলে দেয়, তার জীবনটা যে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে ভাবেনি।

অবন্তী ঠাণ্ডা মুখে একদিনই কেবল মুখের ওপর বলেছিল, তোমার মানসিক ব্যাধিটাই কাঁধে চেপে আছে বলে আমার বিশ্বাস, ভালো একজন ডাক্তার দেখাও না কেন ?

মানুষটা ইংগীত না বোঝার মতো বোকা নয়। সবল রমণীর শয্যাসঙ্গী হবার মতো পুরুষ সে নয়। সে-দিনই যাকে বলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। সভ্যভব্য বিনয়ের মুখোস খুলে একটা হিংস্র জানোয়ার বেরিয়ে এসেছিল। হিংস্র কিন্তু পুরুষাকারশূন্য। অকথ্য নোংরা গালগালই তার সেরা অস্ত্র।

দু' তরফের কোনো দিক থেকেই বাধা না থাকায় বিয়ে সহজেই ভেঙেছে। দু' মাসের বাড়ি ভাড়ার দায় পর্যন্ত অবন্তীর ঘাড়ে চাপিয়ে সমর সিংহ তার কোনো গৃহাশ্রয়ে নিখোঁজ হয়েছে। খুব অবাক হয়নি। কারণ স্কুলে এর আগেই অবন্তী এই লোকের সম্পর্কে অনেক খবর পেয়েছে।

পেয়েছে গানের সিনিয়র শিক্ষয়িত্রী সুমিত্রা চক্রবর্তীর মুখ থেকে। অবন্তী স্কুলে যাওয়া একেবারে বন্ধ করতে মহিলা বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তার সহানুভূতিটুকু অকৃত্রিমই মনে হয়েছে অবন্তীর। বলেছে, অবিশ্বাসের ভয়ে তারা তাকে সতর্ক করতে পারেনি। তাদেরও অভাবের সংসার, তাই ভয়।···অবন্তীর আগের নাচের শিক্ষয়িত্রী তপতী মজুমদারের চাকরি গেছে, কারণ সে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। বিয়ে না করলে অবন্তীকে পাওয়া সম্ভব নয় বুঝেই অতটা উদার হতে চেয়েছিল। এর আগে তিন-

চারটি সুশ্রী মেয়ে নিজে থেকেই চাকরি ছেড়ে গেছে। এদের মধ্যে একজনের তরফ থেকে কড়া উকিলের নোটিস পর্যন্ত এসেছিল, শেষে কি করে মিটেছে সমর সিংহ-ই জানে।

বিয়ের সময়ে সমর সিংহ খুব আগ্রহ করে নতুন খাট, ড্রেসিং টেবিল আর একটা ছোট আলমারি কিনে দিয়েছিল। সেসব বিক্রি করে অবন্তী দু' মাসের ভাড়া মেটালো। সমর সিংহর মৃত মায়ের একছড়া হার, দুটো বালা অবন্তীর ভাগে জুটেছিল। আঙটি, চারগাছা করে সরু সোনার চুড়ি আর দুটো দুল সমর সিংহ বিয়েতে উপহার দিয়েছিল।

সেসব একটা পুঁটলি করে নিয়ে সকালে অবন্তী স্কুলে এসে হাজির। তার এখানে আসাটা সকলের কাছেই অপ্রত্যাশিত, কিন্তু সমর সিংহর মুখ দেখে মনে হয়েছে, পালাবার গর্ত পেলে সে তাতে সেঁধিয়ে গিয়ে বাঁচত।

অবন্তী বসল না। পুঁটলিটা তার সামনে রেখে বলল, তোমার আর তোমার মায়ের গয়না।...আসবাবপত্র সব বেচে দু' মাসের বাড়ি ভাড়া দিয়েছি। আরো শ' আড়াই টাকা আমার কাছে আছে...স্কুল থেকে আমার আট মাসের মাইনে পাওনা আছে, তার বদলে এ-ক'টা টাকা নিজের কাছে রাখলাম।...আর একটা কথা তোমাকে বলি, ভবিষ্যতে আরো ডুবতে না চাইলে ভালো একজন ডাক্তার দেখিও, আমার ধারণা তোমার কিছুই হয়নি।

চলে এলো। সঙ্গে একটা সুটকেস।...এতবড় কলকাতার শহরে তার যাবার মতো জায়গা নেই। বাপের বাড়ি না, দিদিদের বাড়িও না। তারা অনেক আগে থেকেই বিরূপ। আশ্রয় পাবার মতো জায়গা একটাই। বন্ধু জয়ার কাছে।

জয়া মিত্তির ওকে দেখে হাঁ। —সুটকেস হাতে তুই, কি ব্যাপার?

দিব্বি রসিকতার সুরেই অবন্তী বলতে পেরেছে, আনন্দ করে দুটো দিন তোর কাছে থাকতে এলাম, কিন্তু তুই যেমন হাঁ হয়ে গেলি, ফিরে যাব কিনা ভাবছি।

জয়া ওকে জড়িয়ে ধরল।—বলিস কি রে, এত ভাগ্য আমার! আয়, আয়—এলি তো যুগলে এলি না কেন?

অবন্তী তার সঙ্গ নিয়ে আলতো করে বলল, যুগলের গাঁট ছিঁড়ে গেছে।

জয়া ঘুরে দাঁড়ালো। দু'চোখ বিস্ফারিত। না, অবন্তীর মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। —তার মানে?

—এখানে দাঁড়িয়েই মানেটা হবে?

—আয়, আয়। ব্যস্ত হয়ে তাকে ঘরে নিয়ে গেল।

নিজের শোবার ঘরে এসেই এক হাতে জড়িয়ে ধরে বসল।—কি হয়েছে বল্, তোর মুখ দেখে তো ভয়ংকর কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

—না, ভয়ংকর আর কি, ডিভোর্স তো আকছারই হচ্ছে, এ একটু বেশি তাড়াতাড়ি হল।

—ডিভোর্স! বলিস্ কি? হয়েই গেছে?

—গেছে।

—কেন, কেন? এরই মধ্যে এমন কি হল যে, একেবারে ডিভোর্স?

—আগে আমাকে একটু চা আর কিছু খেতে দে, কাল রাত থেকে কিছু খাওয়া হয়নি।

জয়া অপ্রতিভের মতো উঠে দাঁড়ালো।—আমি একটা যাচ্ছেতাই—

ছুটে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে চাকরের হাতে একরাশ জলখাবার দিয়ে নিজেও সঙ্গে এলো। —খা, চা আসছে।...এবারে খেতে খেতে বল্, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, তুই ছাড়লি, না ও ছাড়ল?

—ও-ই ছাড়ল বলতে পারিস, আমি কেবল ব্যাপারটা সহজ করে দিলাম।

—কেন, কেন ছাড়ল?

অবন্তী আঙুল তুলে ওদের পালঙ্কের শয্যাটা দেখিয়ে দিল। —ওটার ভয়ে।

জয়া বিমূঢ় খানিক। চট্ করে মাথাতেই ঢুকল না। বোঝার পর বলে উঠল, বলিস্ কি। ইয়ে নাকি লোকটা ?

অবন্তীর ঠাণ্ডা মুখ, ঠাণ্ডা জবাব।—মনে হয় না, তবে স্বভাবের দোষে আর ভয়ে অনেকটা তাই।

—তাহলে ডাক্তার দেখালি না কেন, তড়িঘড়ি সব চুকিয়ে দিলি কেন ?

—সে-ই চুকিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। …স্বভাবের দোষটা তো নতুন নয়, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখবে কি করে। যাক, তুই বাপু আর যা-ই করিস, সহানুভূতি দেখাস না।

জয়া মিত্তির অনেকক্ষণ তাকে চেয়ে দেখল। এখনো মনে হল এই মেয়ে ওর থেকে ঢের বেশি শক্ত। জিগ্যেস করল, এখন তাহলে কি করবি তুই, বাপের বাড়িও তো যাবি না ?

—তুই তাহলে ঘাবড়ে গেছিস, ভেবেছিলাম তোর কাছে দিন-কয়েক থাকা যাবে, তারপর ভাবব…।

জয়া দু' হাতে আবার জাপটে ধরল তাকে। —তোর কথা ভেবে আমারই মাথা খারাপ হবার দাখিল, যতদিন খুশি নিজের ঘরবাড়ি ভেবে এখানে থাকবি—

অবন্তী হাসল। —তা কি ভাবা যায় রে…তার থেকে তুই আমার একটা চাকরির যোগাড় ছাখ, তোর তো অনেক কানেকশান—একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। তারপর আর থাকার ভাবনা কি, মেয়েদের কত হস্টেল আছে।

জয়া আনন্দে লাফিয়ে উঠল।—আমার বুদ্ধি ছাখ, তোর মতো মেয়ের আবার চাকরির ভাবনা! একটা মস্ত মেয়ে স্কুলের নাম করে বলল, আমি তো সেখানকার ম্যানেজিং কমিটির একজন জাঁদরেল মেম্বর!

হ্যাঁ, চাকরি অবন্তীর খুব সহজেই হয়ে গেল। আপাতত ছোট মেয়েদের নাচ আর গান শেখানো কাজ। জয়া আশ্বাস দিল, তোর যা গুণ, পরে তুই সর্বেসর্বা হয়ে যাবি দেখিস।

এখনই মাইনে মাসে পাঁচশ'। এর মধ্যে জয়াই আবার তাকে

দুটো ভালো গানের টিউশানি জুটিয়ে দিল। দুই বড় লোকের দুই মেয়েকে সপ্তাহে দু'দিন করে সন্ধ্যায় গান শেখানো। দেড়-দেড় তিনশ' টাকা মাইনে। মাসে আটশ' টাকা অবন্তীর কাছে অভাবিত অঙ্কের টাকা বইকি।

মাসখানেক বাদে অবন্তীই বলল, তুই আমার পূর্বজন্মের বোনের থেকেও বোধহয় বেশি ছিলি ভাই, কিন্তু আর ভালো দেখায় না, আমি মোটামুটি একটা ভালো হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি।

জয়া চেয়ে রইলো খানিক, তারপর খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, তুই আমার পূর্বজন্মের সতীন ছিলি! জড়িয়ে ধরল।—একটা কথা বলব, রাগ করবি না?

—রাগ করার মতো কথা তুই তো কখনো বলিসনি···।

—হস্টেলে যাবি যা, আর বাধা দেব না, তোর মধ্যে কেমন ধার-ধার অথচ গম্ভীর-গম্ভীর ব্যাপার আছে যা পুরুষ মানুষের চোখ টানে—আমার ব্যারিস্টার সাহেবও দেখি দিনে তিনবার করে তোর কথা না তুলে পারে না, সমর সিংহর মধ্যে না আছে সমব না সিংহ—তাই ছাড়া পেয়ে গেলি—কে কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক নেই বাপু, সাবধানে থাকিস।

অবন্তী মালহোত্রা, এখন ফিরে আবার সে মালহোত্রা, হাসল খুব, বলল, তোর বরকে নিয়ে অন্তত তুই খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।

৬

একটা বছর মোটামুটি নিরুপদ্রবে কেটে গেল। অবন্তী মালহোত্রার বয়েস এখন চব্বিশ। স্কুলের আর টিউশানির বাইরে একমাত্র মায়ের সঙ্গে যা একটু যোগাযোগ আছে। কিন্তু সে-ও বাবার অগোচরে। বাবা এখনো ছোট মেয়ের মুখ দেখতে রাজি নন। অবন্তী শুনেছে, বাবার গত এক বছর এক্সটেনশনে চলছিল, এবারে রিটায়ারমেণ্ট। ব্যারাকপুরের দিকে ছোট একটা জমি কেনা হয়েছে, দুই জামাইয়ের তত্ত্বাবধানে সেখানে বাড়ি উঠেছে। রিটায়ারমেণ্টের

পরেই মা-কে নিয়ে বাবা সেখানে থাকবেন। তারপর মায়ের সঙ্গেও হয়তো আর যোগাযোগ থাকবে না। দিদিদের সঙ্গে অবন্তীর একে-বারে যোগাযোগ নেই। বাবার থেকেও বোনেরা ওর ওপর আরো বেশি বিরূপ। অবন্তীর মায়ের কাছেও যেতে ইচ্ছে করে না খুব। ওকে দেখলেই মা বড় কাঁদে, বলে, কি হবে রে তোর! তবু যেতে হয়। না গেলে মা আরো বেশি উতলা হয়ে স্কুলে ফোন করে।

স্কুলে অবন্তীর নির্বিঘ্নেই দিন কাটে। অন্য শিক্ষয়িত্রীরা ওকে একটু অহংকারী ভাবে। তাদের ধারণা, গভর্নিং কমিটির মান্যগণ্য মেম্বার জয়া মিত্রর ক্যানডিডেট বলেই সকলের সঙ্গে মন খুলে মেশে না। অবন্তীর নির্ভেজাল কালো গায়ের রং নিয়েও তারা আড়ালে কথা বলে, এত কালোর ওপর এমন মুখশ্রী হয় কি করে সে-ও যেন একটু বিস্ময়ের ব্যাপার।...টিউশনির দুই ছাত্রীর বাড়িতে অবন্তীর নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে চলার দায় বাড়ছে। এক ছাত্রীর মামা আর এক ছাত্রীর কাকার আগ্রহ একটু একটু করে বাড়ছে। মামাটি যখন তখন এসে আগে দুই একটি গান শোনানোর বায়না ধরে। অবন্তী ইদানীং কোথাও নাচের ফাংশান করে না, কেবল স্কুলে মেয়েদের নাচ শেখায়। দ্বিতীয় ছাত্রীর কাকার বিশেষ ইচ্ছে ভাইঝি বাড়িতে গানের সঙ্গে নাচও আরো ভালো করে শিখুক। অবন্তীর নাচের খবর ভদ্রলোক ভাইঝিটির কাছেই শুনে থাকবে। এই কাকাটি বিবাহিত আর দুই বাচ্চার বাপ।

সেদিন সন্ধ্যার পর হস্টেলে ফিরতে ফিরতে অবন্তী ভাবছিল কাকার ভাইঝি-অলা বাড়ির টিউশনিটা ছেড়ে দেবে কিনা। কারণ কাকাটি সেদিন ভাইঝিকে নাচ শেখানোর জন্য একটু বেশিই পীড়াপীড়ি করেছে। আরো একশ' টাকা বেশি দেবার লোভও দেখিয়েছে।

হস্টেলে ঢুকেই দারোয়ানের মুখে শুনল, ভিজিটিং রুমে এক সাহেব অপেক্ষা করছেন।

অবন্তী অবাক। কে হতে পারে! জয়ার বর নয়তো? এত-দিনের মধ্যে দুই-একবার জয়ার সঙ্গে সে-ও এসেছে। অবন্তীর

যা বরাত, জয়া শত্রু হলে তো ভরাডুবি।

…না, অন্য কেউ। জানলার দিকে মুখ করে সিগারেট টানছে। মুখের যেটুকু দেখা গেল, তাতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িই শুধু চোখে পড়ল অবন্তীর।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াতেই অবন্তী হাঁ।…খুব চেনাই তো কিন্তু… অমন সুন্দর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির জন্যই ধোঁকা লাগছে একটু।

—বরুণ! কি কাণ্ড…তুমি!

আধ-খাওয়া সিগারেটের টুকরোটা বরুণ মেহ্‌রা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। মেয়ে হস্টেলের ভিজিটিং রুমের টেবিলে অ্যাশপট নেই। এক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। হাসছে। আর নির্নিমেষে দেখছে। হ্যাঁ, সেই বরুণই বটে। বলল, এত দূরে সরেছি যে চট করে চিনতেও পারলে না?

রং কালো না হলে অবন্তীর মুখে রক্তকণার ওঠা-নামা চোখে পড়ত বোধহয়। আত্মস্থ হতে আরো একটু সময় লাগল। বলল, বোসো, চিনতে পারা একটু কঠিন কিনা সেটা সাত বছর বাদে এসে হঠাৎ বুঝবে কি করে?

বরুণ মেহ্‌রা সুচারু ব্যস্ততায় বসার জন্য আগে অবন্তীর চেয়ারটা সামনে টেনে আনল। এটা বোধহয় বাইরের ভব্যতা। তারপর নিজের চেয়ার কাছে টেনে বসে হাসতে হাসতে জিগ্যেস করল, কঠিন কেন, খুব বদলেছি?

—এখন খুব লাগছে না, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দেখে একটু ধাঁধায় পড়েছিলাম। তুমি কবে এলে?

—মাত্র আড়াই দিন। এর মধ্যে চল্লিশটা ঘণ্টা তোমার খোঁজে কেটেছে বলতে পারো।

—বড় ভাগ্য। আমার হদিশ কোথায় পেলে—বাড়িতে?

—বাড়ির কেউ তোমার হদিশ রাখেই না। মা বলল, তুমি একটি বাঙালীকে বিয়ে করেছ, কোথায় আছ জানে না। তোমার বাবাকে জিগ্যেস করতে যে জবাব পেলাম আমার চোখই ছানা-বড়া—বললেন, এ-নামে কাউকে চেনেন না, কোথায় আছে বেঁচে আছে কিনা সে-খবরও রাখেন না। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা

করতে চাইতে বলে দিলেন শরীর খারাপ, অর্থাৎ ঘুরিয়ে আমাকে বিদায় হতে বললেন। আজ সকালে হঠাৎ জয়া .ঘোষের কথা মনে পড়ে গেল। তার বাড়ি এসে শুনলাম সে জয়া মিত্র হয়েছে। কার্ড পাঠাতেই ডেকে পাঠালো। তারপর তোমার সমাচার শুনলাম আর ঠিকানা পেলাম।

অবন্তী মুখের দিকে চেয়ে আছে, হাসছেও একটু একটু।—সমাচার শুনলে?

—শুনলাম। শুনে আনন্দে মনে মনে নাচলাম।

—নাচলে! ও-দেশ থেকে নাচও রপ্ত করেছ বুঝি?

হেসে উঠল, ওটা তো নাচেরই দেশ, তবে আমার নাচটা অন্য রকম, বুকের তলার নাচ।

অবন্তী দেখছে। আগের থেকেও সুন্দরই হয়েছে বটে। আর আগের থেকেও বাকপটু হয়েছে হয়তো। বুকের তলার নাচ শুনেও নাড়া-চাড়া খেল না। তরল সুরেই জিগ্যেস করল, অমন নাচ কোথায় রপ্ত করলে, ছিলে কোথায়?

—ফ্রান্সে। ছিলাম আর আছিও। তবে বুকের তলাব নাচটা এ-দেশ থেকেই রপ্ত করে গেছলাম।

কথার ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু অবন্তী কি আর কথায় ভুলবে? ওই সপ্রতিভ সুন্দর মুখ দেখে ভুলবে? জিগ্যেস করল, এখানে মায়ের কাছে আছ?

—ছিলাম। কাল সকাল থেকে গ্র্যাণ্ডে একটা সুইট ভাড়া করেছি, ছেলেমেয়ে নিয়ে দুই দিদিই এখন এখানে—আমার খুব অসুবিধে হচ্ছিল, আর বাবা-মা টাকা পেয়ে এত খুশি যে হোটেলে থাকার কথা বলতেই ব্যস্ত হয়ে সায় দিল, বলল, যেখানে তুই ভালো থাকবি আরামে থাকবি সেখানেই থাক্ বাবা—আমরা চোখের দেখা দেখতে পেলেই হল।

অবন্তী জিগ্যেস করল, এখানে আর তাহলে বেশি দিন থাকছ না?

বরুণ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল, কয়েক পলক অবন্তীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিল, তিন মাসের ভিসা।···একটি

কার্যোদ্ধারের আশায় এসেছি, সেটা হলেই চলে যাব।

—এমন কি কার্যোদ্ধার ?···বলতে বাধা আছে ?

—বাধা ! তোমাকে বলতে বাধা ? যাক, আমার সঙ্গে তোমার এখন বেরুতে বাধা আছে ?

অবন্তী অপলক চেয়ে রইল একটু। জিগ্যেস করল না কোথায়। নরম অথচ স্পষ্ট করেই জবাব দিল, আছে।

আহত মুখ। —কি বাধা ?

—সমস্ত দিন পরিশ্রম গেছে, খুব ক্লান্ত।

বরুণ মেহ্‌রা অবাক যেন।—সমস্ত দিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তি মুছে দেবার জন্যই তো সামনে রাত !

মৃদু হেসে অবন্তী বলল, এটা ইণ্ডিয়া, ফ্রান্স নয়।

বরুণ থমকালো একটু। পলকে সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। হেসে সায় দিল, তা বটে···শুনলাম তুমি স্কুলে মেয়েদের নাচ আর গান শেখাও ?

—ঠিকই শুনেছ, এ ছাড়া দু'দুটো টিউশনি করি।

—নাচ গানের ?

—শুধু গানের।

—আঃ, আজ মনে হচ্ছে কতকাল তোমার গান শুনি না·· নাচও সেই ছেলেবেলায় ফাংশনে দেখেছিলাম। আবার চোখ বুলিয়ে নিল, সমজদারের মতো বলল, নাচ রেখেছ বলেই তোমার শরীর এখনো দারুণ ফিট।

অবন্তীর অস্বস্তি হচ্ছে। কারণ তার মনে হচ্ছে মস্ত টাকার মানুষ হয়ে এই ছেলে সাত বছর বাদে দেশে ফিরে তার সঙ্গে সরলতার অভিনয় করছে!

—কি দেখছ ? বরুণের অন্তরঙ্গ প্রশ্ন।

—তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করছি।

হেসে উঠল, বোঝানোর সুযোগ পাচ্ছি কোথায় !···কাল সকাল থেকে তোমাকে ফ্রি পাব নিশ্চয় ?

—কি করে পাবে, স্কুল আছে···।

—ও···! থমকালো একটু।—আর বিকেল সন্ধ্যায় টিউশনি আছে ?

অবন্তী থামল।—সপ্তাহে দু' দিন দু' দিন করে টিউশনি, কাল টিউশনি নেই।

উঠে দাঁড়ালো।—ঠিক আছে, বুঝতে পারছি আমার কিছু কৈফিয়ত দাখিল করার আছে, সাতটা বছর তোমার কাছে ভয়ানক লম্বা সময়, এত লম্বা যে আমার খেয়ালশূন্য ছন্নছাড়া স্বভাবখানাও তুমি ভুলতে বসেছ—ওয়েল আই অ্যাম এ বর্ন ফাইটার অ্যাণ্ড রেডি টু ফেস্ এনি স্টর্ম্—কাল কখন আসব, বিকেল পাঁচটা ?

দ্বিধার সুরে অবন্তী জিগ্যেস করল, কোথায় যেতে হবে ?

হাসছে। আগের মতোই দুষ্টু মিষ্টি হাসি। জবাব দিল, দেখার পর থেকে তুমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করালে বলতাম, টু মেক দ্য হেল্ আ হেভেন···কৈফিয়ত দাখিল করে খালাস না পাওয়া পর্যন্ত সবিনয়ে বলছি, আমার হোটেলের সুইটে, নির্ভয়ে এসো, আমি এখনো ভদ্রলোকই আছি—দয়া করে এখানে তোমার ডিনার অফ করে রেডি থেকো।

ঘুম ভেঙে অবন্তী ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল। অন্ধকার ফুঁড়ে শয্যার এদিক ওদিক তাকালো। না, শূন্য শয্যা। কিন্তু তাজা স্পর্শটুকু যেন আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। সেই সাত বছর আগের দুরন্ত বেপরোয়া স্পর্শ।···বরুণ মেহ্‌রার বাইরে যাবার দু'দিন আগের দুপুরে পুরুষের প্রথম দুর্বার আবেগের স্পর্শ। সাত-সাতটা বছর নয়, যেন এই মুহূর্তের ঘটনা।

·· আশ্চর্য, এর থেকে অনেক পরিণত বয়সে অবন্তীর জীবনে আর যৌবনে পুরুষ এসেছে। অক্ষমতার ক্ষোভে সে এই নারীদেহে·যন্ত্রণার স্পর্শ কায়েম করতে চেয়েছে। কিন্তু সেই স্পর্শের স্মৃতি মনের কোনো কোণে নেই। অথচ সাত বছর আগের সেই দুপুরটা হঠাৎ রাতের স্বপ্নে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অবন্তী অন্ধকারেই হাত-ঘড়ি দেখল। রাতে ঘড়ি হাতে শোয়া

অভ্যাস হয়ে গেছে। রাত এখন সাড়ে তিনটে। আর ঘুম এলো না। আসবেও না।

ঘুরে ফিরে সমস্ত দিনই মনে হল তার সামনে আবার একটা পরীক্ষা উপস্থিত। অবন্তী ভাবতে চেষ্টা করছে এই লোককে নিয়ে তার আর কোনো কৌতূহল নেই। বেশ শক্ত মন নিয়েই এর মুখোমুখি হওয়া দরকার। অথচ আজ মনে নিশ্চিন্ত ভাবটুকুই আনতে পারছে না।

পাঁচটা বাজার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। অবন্তী দোতলার জানলায় দাঁড়িয়েছিল। বরুণ মেহরা নেমে ওপরের দিকে তাকাতে চোখাচোখি। অবন্তী একটা হাত তুলল, অর্থাৎ আসছি।

শীতের ছোট বেলা। এরই মধ্যে বাইরের আলোয় বেশ টান ধরেছে। বরুণ মেহ্‌রা সপ্রতিভ হাসি মুখে বাহু ধরে অবন্তীকে আগে তুলল তারপর নিজে উঠে বসল। বলল, কতকাল দেশ ছাড়া, এক্ষুনি হোটেলে ফিরে কি হবে—একটু ঘুরে ফিরে যাই ?

—বেশ তো। অবন্তী খুব সহজেই থাকবে, তাই নিঃসংকোচ।

পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে হুকুম করল, প্রথমে লেকে চক্কর দিয়ে তারপর গঙ্গার ধারের দিকে যেতে। অবন্তীর ভিতরে ভিতরে আবার নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা। বরুণ তার দিকে ঘুরে বসল।—তুমি কিন্তু আগের তুলনায় একটু গম্ভীর হয়ে গেছ।

—আগে বাচাল ছিলাম ?

—বাঃ, গম্ভীরের উল্টো কি বাচাল হল ? আগে তুমি আরো হাসি খুশি ছিলে।

—আগের বয়েসটা অনেক দিন পার হয়ে এসেছি।

হেসে উঠল, আমার থেকে তুমি পাঁচ বছরের ছোট, আমার উনত্রিশ, তোমার তাহলে কত ?

—মনের বয়েস উনপঞ্চাশ হতে পারে।

আবার হাসি।—আর শরীরের উনিশ ?

—এটা কি ফ্ল্যাটারি ফ্রেঞ্চ স্টাইল ?

বরুণ হেসে বলল, ফ্রেঞ্চ স্টাইলে ঘেন্না ধরে গেছে, অবন্তী

স্টাইল ও-দেশে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এ ক'বছরে আগের থেকে কিন্তু তোমাকে আমি অনেক বেশি সুন্দর দেখছি···যাকে বলে ম্যাচিওরড্ বিউটি।

—এ ক'বছরে তোমার চোখও কিছু খারাপ হয়ে থাকতে পারে। হেসেই বলল।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাফেরার পর বরুণ মেহ্‌রা তাকে নিয়ে চৌরঙ্গীর নামী হোটেলে এলো। রিসেপশান থেকে চাবি নিয়ে এবারে ওর বাহু ধরেই লিফ্‌ট-এ উঠল। তারপরেও হাত নামল না। এক হাতে চাবি লাগিয়ে ভিতরে ঢুকল।

···না এ-রকম স্যুইটে অবন্তী কখনো আসে নি, নরম পুরু কার্পেটে পা ডুবে যাচ্ছে। পিছনের দরজা আপনি একটু শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছিল, এবারে কাঁধ ছেড়ে বরুণ সুইচ টিপে শেড দেওয়া দুটো নিয়ন আলো জ্বেলে দিল। মস্ত-মস্ত জানালা দুটোর পর্দা টেনে সরিয়ে দিল। তারপর সোজা কাছে এসে অবন্তীর দুই বাহু ধরে তাকে তক-তকে নরম শয্যায় বসিয়ে নিজে তার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দু' হাতে কোমর বেষ্টন করে সোজা মুখের দিকে তাকালো।—আমাকে ক্ষমা না করে তুমি পারবে?

দরকারের মুহূর্তে অবন্তী কি মনের জোর খুইয়ে বসছে? মোটেই না। ঠাণ্ডা অথচ সহজ গলায় জিগ্যেস করল, কিসের ক্ষমা···কেনই বা ক্ষমা?

—ছাখো, সাত বছর খুব লম্বা সময় বুঝতে পারছি, কিন্তু সাতটা বছর আমার কাছে সাত মাসের মতো কেটে গেছে। চিঠি লেখা-টেখা আমার অত ধাতে নেই, এক-এক রাতে ভাবতাম চিঠি লিখব, সকালে উঠে ভুলে যেতাম।···অবন্তী, প্লীজ্ বিশ্বাস করো ও-দেশে সাতটা বছর অপেক্ষা করা কিছুই নয়, আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম কোনো এক ফাঁকে এসে তোমাকে নিয়ে যাব···এর মধ্যে মায়ের একখানা চিঠিতে জানলাম, তোমার মা-বাবা তোমার বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার খুব রাগ হয়ে গেছল। মা-কে টাকা পাঠিয়ে রাগ আর ঠাট্টা মনে চেপে লিখেছিলাম, তোমার বিয়ে হয়ে

গেছে কিনা, আর লিখেছিলাম তোমাকে বলতে যে আমি কাউকেই ভুলিনি। ভেবেছিলাম এটুকু থেকেই তুমি যা বোঝার বুঝে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে। কিন্তু এসে বুঝছি, তোমাকে চিঠি না লেখাটাই আমার মস্ত ভুল হয়েছে।

অবন্তী চেয়ে আছে। চোখে পলক পড়ছে না। এমন কোনো যন্ত্র তো নেই যা দিয়ে মানুষের ভিতর দেখা যায়।

একটু আবেগের সুরেই বরুণ মেহরা বলে গেল, এবারে আসব ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে সে কি তাড়া যদি বুঝতে! এখানে এসে তুমি নেই শুনে হতভম্ব। তারপর জয়ার মুখে সব খবর শুনে আরো হাঁ। তোমার ডিভোর্সও হয়ে গেছে শুনে তবু একটু নিশ্চিন্ত, তা না হলে তোমার ওই স্বামীকে খুন করে আমাকে হয়তো জেলে পচতে হত। কোথায় আমি তোমার ওপর রাগ করব, না এখনো তোমার আমার ওপর রাগ! ঠিক আছে, আমার দোষ হয়েছে—ক্ষমা করে দাও, মাঝের সাতটা বছর ভুলে যাও!

অবন্তী কতটা ফাঁপরে পড়েছে মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না। তেমনি ঠাণ্ডা অথচ সহজ গলায় বলল, প্রথম আর ওই একখানা চিঠিতে তুমি লিখেছিলে, আধ-ঘণ্টা আলাপের পরেই ও-দেশের মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া সহজ (চুমু খাওয়া সহজ এ-কথাটা মুখে এলো না), আর তুমি সাতটা বছর মরুভূমিতে কাটিয়ে এলে বলতে চাও?

—দূর দূর, ওটা প্রথম আবেগের কথা—ওরা খেলার পুতুল, আমোদ-আহ্লাদ সর্বস্ব, এ-দেশের মেয়ের পায়ের নখের যোগ্যও কেউ নয়—বুঝলে?

বোঝার চেষ্টায় অবন্তীর দু' চোখ অপলক এখনো। স্পষ্ট অথচ মৃদু সুরে বলল, যা বলছ তা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কত কঠিন এটুকু তুমি বুঝতে পারছ?

বরুণ মেহরা বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইলো খানিক। তারপর অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, কি-চ্ছু বুঝতে চাই না—বিশ্বাস তোমাকে করতে হবে। পরের মুহূর্তে মনে পড়ল কিছু। চকিতে উঠে দেয়াল-ঘেঁষা ডেস্কের ওপর থেকে ছোট পাউচ-ব্যাগটা

নিয়ে এলো। অসহিষ্ণু আর দ্রুত হাতে তার ভিতরে কি খুঁজল। পেল। ছোট্ট ফোটো একটা।

—ছাখো, এই মেয়েটিকে চিনতে পারো?

দেখে অবন্তী সত্যি হতবাক। তারই সতেরো বছর বয়সের বেণী দোলানো ফোটো। কিন্তু এ কি করে সম্ভব, ওর রঙিন ফোটো কে কবে তুলল!

বরুণ এতক্ষণে হাসছে।—তোমার ঘরের টেবিল থেকে ফোটো-স্ট্যাণ্ডসুদ্ধ তোমার ফোটো নিপাত্তা হয়ে গেছল মনে আছে?···ওটা আমি নিয়েছিলাম। ফ্রান্সে গিয়ে ওটার থেকে কালারড্ নেগেটিভ করিয়েছি। তারপর কত বার যে এই নেগেটিভ থেকে এ-রকম ফোটো করিয়েছি ঠিক নেই—কি করব, চুমু খেতে খেতে এক একটা ফোটো নষ্ট হতে কতদিন আর লাগে?

অবন্তী নির্বাক চেয়ে আছে। সম্বিত ফিরল যখন নিজেকে উদ্ধারের আশা নেই বা সে রকম চেষ্টাও নেই। পুরুষের দুই বাহুবন্ধনে বন্দী, একই সঙ্গে তার আপন রমণী জয়ের দুর্বার আকৃতি।

অবন্তী এবারে অবন্তী মেহরা। আবার জীবন।

মানুষটা তৎপর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টাকার জোরে হোক বা যে করেই হোক, রেজিস্ট্রি বিয়ের পর দেড় মাসের মধ্যে অবন্তীরও পাসপোর্ট ভিসা বার করে তাকে নিয়ে আকাশে উড়ল। দুটি প্রাণ বাধাবন্ধশূন্য মুক্ত বিহঙ্গ।

অবন্তী মালহোত্রা যখন আট মাসের জন্য শ্রীমতী সিংহ হয়েছিল, তার জীবনে বা যৌবনে সিংহ ছেড়ে নিরীহ গোছের কোনো পুরুষের আবির্ভাবও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। এবারের মিসেস মেহ্রা হবার পর একটি প্রত্যয়ী পুরুষের আবির্ভাব অন্তত ঘটেছে। অবন্তীর যেটুকু বুদ্ধি বা বিবেচনা, তা দিয়ে একবারও মনে হয়নি এই পুরুষের জীবনে সে-ই প্রথম রমণী। বরং তার নিভৃতেব রীতিতে ভোগের সুর বেশ উঁচু তারে বাঁধা মনে হয়। কিন্তু অবন্তী কিছুই গায়ে মাখেনি, বা তা নিয়ে নিজের স্নায়ু বিড়ম্বিত করেনি।

ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল, কালো বউ নিয়ে তো যাচ্ছ খুব, এরপর ও দেশের লোক নাক সিঁটকোলে তোমারই না মেজাজ বিগড়য়।

জবাবে যা বলেছিল কান পেতে শোনার মতোই। শুনে বরুণ প্রথমে দস্তুর মতো অবাক। তারপর হেসে হেসে ওই শোনার মতো কথাগুলো।—শাদা চামড়ার নেকড়েগুলোর থেকে তোমাকে কি করে আগলে রাখব আমার তো সেই চিন্তা। ফ্রান্সের মানুষগুলো দুই ব্যাপারে নিজেদের পৃথিবীর সেরা সমজদার ভাবে। এক, সাহিত্য শিল্প-কলা আর রসবোধের, দুই মেয়েদের রূপের। কিন্তু সাদা চামড়ার রূপসী মেয়ে দেখে দেখে তাদের চোখ পচে গেছে, কালো মেয়ে সুঠাম সুন্দরী হলে তারা পাগল—সাদা চামড়ার দেশে কালো সুন্দরী মেয়ের কদর সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই।

মিথ্যে যে বলেনি এটা অবন্তী লণ্ডনে এসেই বিলক্ষণ টের পেয়েছে। কয়েকটা জায়গায় বেড়িয়ে তারপর তাঁদের ফ্রান্স মানে প্যারিসে আসার কথা। লণ্ডনে বরুণের এক বিশেষ বন্ধু থাকে, সে ভারতীয়, নাম জগদীশ কাপুর—কিন্তু ফ্রান্সে বা লণ্ডনে সে জর্জ কাপুর নামে পরিচিত। তার সহকর্মীর নাম পিয়ের ট্রুফোঁ, সে ফরাসী। সে-ও বরুণের বন্ধু। শহর থেকে অনেক দূরে মস্ত অ্যাপারটমেন্ট ভাড়া করে জর্জ আর পিয়ের এক সঙ্গেই থাকে। সস্ত্রীক বরুণ মেহেরা কয়েক দিনের জন্য লণ্ডনে তাদের অতিথি। গাড়ি নিয়ে তারা এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসেছে। পরিচয় করিয়ে দেবার পরেই অবন্তীর একটা হাত পিয়ের ট্রুফোঁর দখলে। বছর বত্রিশ তেত্রিশ হবে বয়েস। অবন্তীর হাতে বার তিনেক চুমো খেলো। আর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলতে লাগল, লাঁভলি··· এঁক্সখুঁইজিট···

ধমকের সুরে বরুণ বলে উঠল, চোখ দিয়ে আর কত চাটবে, ছাড়ো এখন, বেচারী ঘাবড়ে যাচ্ছে—

হাত ছেড়ে পিয়ের শশব্যস্ত।—খুব দুঃখিত, ভাঙা ইংরেজিতে তার বক্তব্য, যাবার সময় মেহ্‌রা বলে গেছল সে তার ব্ল্যাক-জেম

আনতে যাচ্ছে, তা বলে তুমি এত সুন্দর ভাবতে পারি নি।

গাড়িতে উঠে সে আবার জর্জকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের ইণ্ডিয়ার মেয়েরা বেশির ভাগ এ-রকম সুন্দরী?

জর্জই গাড়ি চালাচ্ছে। হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ, তুমি এক্ষুনি ইণ্ডিয়ায় ছোটো।

নিঃসংকোচে অবন্তীর বাহু ধরে জর্জ তাকে সামনে অর্থাৎ নিজের পাশে বসিয়েছে। পিছনে পিয়ের আর বরুণ। সকলেরই ফুর্তির মেজাজ। ঘাড় ফিরিয়ে অবন্তীকে একবার দেখে নিয়ে সাবধান করার সুরে বলল, পিয়েরকে দেখেই বুঝে নাও ম্যাডাম মেহ্‌রা তোমাকে কোন দেশে নিয়ে চলেছে, ও তো বেশির ভাগ সময় অফিসের কাজে আর বিজ্‌নেসে ব্যস্ত থাকবে—তোমাকে কে রক্ষা করবে ঈশ্বর জানে—

জর্জের কথা-বার্তা ইংরেজিতে। বাংলা জানে না এটুকু বোঝা যায়। কি বলল পিয়েরের বুঝতে অসুবিধে হল না। বেশ মোলায়েম বিনয়ে পিছন থেকে ফোড়ন কাটল, মাদামকে রক্ষা করার জন্য মেহ্‌রা তা বলে তোমার কাছেও রেখে যাবে না।

...চার দিন ছিল লণ্ডনে। অবন্তীকে দেখানো শোনানোর বেশির ভাগ সঙ্গী পিয়ের ট্রুফো। চোখের তৃষ্ণা যতই মেটাক, আচরণে ভদ্র। কিন্তু জর্জটাকে একটা পাজির পা-ঝাড়া বলতে হবে। মুখ সর্বস্বই নয় কেবল, অন্য দু'জনের সামনেই দিব্বি জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে। কিন্তু লণ্ডন ছাড়ার আগের রাতে যাকে বলে শয়তানিই করল। ওদের খাতিরেই বাড়িতে পার্টি। বাইরের আমন্ত্রিত দেখা গেল কেবল জনাকতক পুরুষ—চারজন ইংরেজ, দু'জন চাইনিজ আর একজন ফরাসী। অনেক রাত পর্যন্ত দেদার মদ গিলল সকলে। অবন্তীর খুব ভালো লাগছিল না, মাঝে মাঝে আসর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, আবার খানিক বাদে ফেরে। এতই মশগুল সব, কেউ খুব লক্ষ্যও করছে না। কিন্তু অবন্তীর এ ধারণা ভুল। জর্জ খুব ভালো করেই লক্ষ্য করছিল। একবার বেরিয়ে এসে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে দেখে জর্জ। তারপরেই অবন্তী দিশাহারা। কাছে এলো।

দু'হাতে বুকে জাপটে নিয়ে চুমু খেতে লাগল। তারপর পাশের একটা ঘরে নিয়ে যাবার জন্য দস্তুর মতো টানাটানি।

কোন রকমে ছাড়িয়ে ফিরে এলো। ওরা বিদায় হবার আগে আর ঘর ছেড়ে নড়লই না। ওই রাতে বরুণকেই বা কি বলবে, আকণ্ঠ মদ গিলে প্রায় বেহুঁশ। পরদিন সকলের সামনেই জর্জ ঘটা করে অবন্তীর কাছে মাপ চাইলো, মাত্রা একটু বেশি চড়ে গেছল ম্যাডাম, ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট।

বরুণ কি ব্যাপার জানতে চাইতে হ্যা-হ্যা করে হেসে সে-ই জানান দিল, রঙের ঘোরে ভেতরটা আনচান করে উঠেছিল বন্ধু, তোমার বউকে ধরে একটু টানা হেঁচড়া করেছিলাম, সী স্ল্যাপড্ রাইট অন মাই চিক্—

বরুণ একটু যেন আঁতকে উঠে অবন্তীর দিকে তাকালো। কিন্তু কি জন্য অতটা সচকিত অবন্তী তখন বোঝেনি। টেনে-টেনে পিয়ের মন্তব্য করল, রাইটলি সারভড্—।

একটু বাদে ওকে নিরিবিলিতে পেয়েই বরুণ জিগ্যেস করল, সত্যি তুমি ওকে চড় মেরেছ নাকি?

অবন্তী উষ্ণ জবাব দিল, মারি নি, মারা উচিত ছিল।

নিশ্চিন্ত হয়ে বরুণ হাসতে লাগল, বলল, আরে দূর! ও-সব ছোট-খাটো ব্যাপারে এখানে কেউ কিছু মনে করে না।

—কোনটা ছোটখাটো ব্যাপার? বুকে জাপটে ধরে চুমু খাওয়াটা, না পাশের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করাটা?

অবন্তী খুশি হতে পারে নি। বরুণের এত মদ গেলাও পছন্দ হয়নি।

সুইজারল্যাণ্ড ওয়েস্ট জার্মানি হয়ে তারা প্যারিসে এসেছে। এ-দিকের সর্বত্রই অবন্তী রূপ বিচারের তফাৎটা অনুভব করেছে। পুরুষেরা ওকে দেখে দেখে চোখের তৃষ্ণা মেটাতে চেষ্টা করেছে। অনেকে যেচে আলাপ করতে চেয়েছে। বরুণ মেহরা হেসে হেসে মন্তব্য করেছে, এখানে রূপের কদরই আসল, রঙের নয়—কালো রূপসী দেখলে এখানকার মানুষ পাগল কিনা বুঝছ?

খুশি হয়ে অবন্তীও ভ্রূকুটি করেছে, খুব বেশি বোঝার ভয় নেই তো?

প্যারিসে এসে অবন্তী কিছুটা ধাঁধার মধ্যে পড়ল, কিছুটা বা ধোঁকা খেল। অভিজাত এলাকায় মস্ত মস্ত বাড়ি, হোটেল রেস্তঁরায় রাতে আলোর বন্যা রঙের বন্যা। যত বড় বাড়ি বা হোটেলেই হোক, ছাদগুলো সব দু' দিকে তাঁবুর মতো নেমে এসেছে। শুধু ফরাসী দেশে নয়, অন্যত্রও এরকম দেখেছে। শুনেছে বরফ পড়ে বলেই এ-ধরনের ছাদ। দিনের বেলায়ও মানুষগুলো বিলাসী আয়েসী। দু'দিকে রাস্তা, মাঝে সারি সারি খোলা রেস্তঁরা। লোকে আড্ডা দিচ্ছে, খাচ্ছে।

অবন্তী ধোঁকায় পড়েছে কারণ বরুণের টাকার জোরে আছে দেখতেই পাচ্ছে···অথচ এভাবে থাকে কেন! ব্যাগে সর্বদা গোছা-গোছা নোট, ওকে নিয়ে নামী-দামী রেস্তঁরায় খায়, অপেরায় যায়। কিন্তু থাকে খুব একটা মধ্যবিত্ত এলাকার দু'খানা খুপরি ঘরের অ্যাপার্টমেণ্টে। এক-একটা গাড়ি দেখলে চোখ ঠিকরে যায়, কিন্তু এই লোকের নিজের গাড়িটা পুরানো ঝরঝরে। ড্রাইভার অবশ্য এখানে কারোই থাকে না, তারও নেই। অফিসের লোক বলে যাদের সঙ্গে অবন্তীর আলাপ হল, তারাও খুব সাধারণ চাকুরে মনে হল। এ-দিকে এই মানুষের খরচের হাত দেখে অবাক হতে হয়। অবন্তী আসার উপলক্ষে কেবল অফিসের সময়টুকু বাদ দিয়ে সন্ধ্যা থেকে আর ছুটির দিনে দু'বেলাই কিছুদিন তো ছোট-বড় নানা মহলে পার্টির ওপর দিয়েই কাটল। আর মুঠো মুঠো টাকা খরচ কেবল বরুণ মেহরাই করে। আরো আশ্চর্য, এ-সব পার্টির কেউই অফিসের লোক নয়। সবারই শোনে 'বিজনেস'। অথচ বরুণ নিজে করে চাকরি। বিজনেসের বন্ধুদের হাব-ভাব চাউনি খুব একটা ভালো লাগে না অবন্তীর। লোভের চাউনি তো এখানে পা দিয়ে পর্যন্ত দেখছে। ঠিক সে-রকমও নয়। ভদ্র, অমায়িক, কিন্তু অন্যের বউ হলেও ও যেন তাদের হাতের মুঠোয়, এমনি হাব-ভাব।

এর মধ্যে একটি লোককে অনেকবার অনেক পার্টিতে দেখল।

অবন্তী। কেবল পার্টি'তেই নয়, ভাড়াটে ক্যাবে চড়ে মাঝে মাঝে অ্যাপার্টমেণ্টেও হানা দেয়। বরুণের সঙ্গে তার বেজায় ভাব। তাকে দেখলেই খুশি আর শশব্যস্ত। হয়তো অফিসে বেরুনোর আগেই এসে হাজির হল, বরুণের সেদিন অফিস কামাই—তার সঙ্গে মনের আনন্দে ক্যাবে গিয়ে উঠে বসল, অবন্তীকে বলে গেল, ফিরতে দেরী হলে ভেবো না, রজার একটা ভালো খবর এনেছে—

লোকটার নাম রজার বারডেঁ। (বারডোট—ট-এর উচ্চারণ নেই)। দশাশই চেহারা। যেমন দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থে। এমন লোকের একটাই পেশা হওয়া উচিত। কুস্তি। মস্ত মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রং লালচে। মাথায় ছোট চুল। পার্টি'তে প্রথম দিনের আলাপেই এই লোকটা অবন্তীর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। খাওয়া দেখলে মনে হবে খাওয়াই তার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। মানুষের 'হাতির খাওয়া' কথাটা অবন্তীর কেবল শোনাই ছিল। এখানে স্বচক্ষে দেখল। খাওয়ার সঙ্গে সমান তালে মদ চলে। এত মদও কেউ খেতে পারে ধারণা ছিল না। কিন্তু এ-দুটোই কেবল অস্বস্তির কারণ নয়। প্রথম আলাপের পর হাতও বাড়ায়নি, বিশাল দেহের মাথা থেকে কোমর পর্য্যন্ত একবার আনত হয়েছে শুধু। তারপর একটু দূরে গিয়ে বসেছে। কথা বলার চেষ্টা করেনি, কিন্তু অবন্তীর যতবার তার দিকে চোখ গেছে, দেখছে লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে। খাবার চিবুচ্ছে মদ গিলছে কিন্তু চোখ দুটো ওর দিক থেকে সরছে না, নড়ছে না। অবন্তীর সমস্ত গা শিরশির করে উঠেছে কেমন। কলকাতার হস্টেলের দেয়ালে একটা গোদা টিকিটিকিকে প্রায়ই লক্ষ্য করত। দেওয়ালের এক-একটা পোকামাকড়ের দিকে চেয়ে নিশ্চল পড়ে থাকত আর ঠিক এমনি করেই যেন চেয়ে থাকত। শিকার ধরার জন্য কোন রকম তাড়াহুড়ো করত না। যখন ধরত অব্যর্থভাবেই ধরত। এই দশাশই লোকটাকেও সেই টিকটিকিটার মতো নির্মম ঠাণ্ডা শিকারী মনে হয়েছিল অবন্তীর।

বার কয়েক লোকটাকে দেখার পর বরুণকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই লোকের এত কদর কেন, দেখলে তো ভয় করে।

—কে? ও রজার? আরে ও একটা দারুণ গুণী লোক, সবাই ওকে খাতির করে—ওকে দিয়ে লিয়াজোঁর কাজ যা হয় তেমন কম লোককে দিয়েই হয়।

বরুণের অনেক ব্যাপারেই অবন্তীর খটকা লাগে। সোজাসুজি জিগ্যেস করেছে, আচ্ছা তুমি এত টাকা ওড়াও ছড়াও—কিন্তু এমন পাড়ায় এ-রকম অ্যাপার্টমেন্টে থাকো কেন, তোমার গাড়িরই বা এই দশা কেন?

বরুণ মেহরা হেসে জবাব দিয়েছে, চাকরি অনুযায়ী ঠাট বজায় রেখে চলতে হয়, নবাবী চালে থাকতে দেখলেই ইনকামট্যাক্স আর কাস্টমস-এর টিকটিকি পেছনে লাগবে।

—কেন লাগবে, তুমি কোথায় কি চাকরি করো?

—কেন, এমব্যাসিতে সাধারণ কেরানীগিরি।

—তাহলে তুমি এত টাকা পাও কোথায়?

বুক ফুলিয়ে জবাব দিল, বিজনেস ইনকাম।

—কি বিজনেস?

—মিড্‌লম্যান বলতে পারো।

—কিন্তু এতে রাখা-ঢাকার ব্যাপার কি আছে, ইনকাম ট্যাক্স বা কাস্টমস-এর লোক পিছনে লাগবে কেন—রোজগার করলে ইনকামট্যাক্স দেবে—চুরির ব্যবসায় তো লোক এদের ভয় করে।

বরুণ গভীর। আবার একটু যেন বিরক্তও। ভুরু কুঁচকে জবাব দিয়েছে, দ্যাখো অবন্তী, এসব নিয়ে মাথা ঘামালে তুমি অথৈ জলে পড়ে যাবে। সেখানে যত বেশি দুর্নীতি সেখানে ততো বেশি নীতির আড়ম্বর। যেমন ধরো, মদ খাওয়া খারাপ সবাই জানে, কিন্তু দেশ থেকে কি মদের দোকান উঠে যাচ্ছে?

অবন্তী আর কিছুই বলে নি। কিন্তু মন বেশ খারাপ হয়ে গেছে। ও ঝগড়া না করতে পারে, বোকা নয়।...যে ব্যবসাই করুক সেটা সাদা রাস্তার ব্যবসা নয় এটুকু বুঝেছে। কিন্তু এরকম ব্যবসাদারই নাকি এখানে ঝুড়ি ঝুড়ি।

আব একটি লোকের সঙ্গে অবন্তীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বরুণ

মেহরা। নাম সঠিক কি সে নিজেও জানে না, কিন্তু সকলের মুখেই তার একটাই নাম শোনা যায়। ইয়ানিক। বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়স। ক্লাউনের মতো ঢিলেঢালা বেশবাস। মিষ্টি দোহারা চেহারা। সুন্দর হাসে। অবন্তীর এ-দেশের নাচ শেখার আগ্রহ। তাই বরুণ একে ধরে এনেছিল। বরুণের দুই একটা পার্টিতেও অবন্তী একে দেখেছিল। প্রথম দর্শনেই লোকটা যেন অবন্তীর প্রেমে পড়ে গেছল। ঠিক হাঙর কুমিরের প্রেম নয়, একটু সাদা সিধে ভাব আছে। কথা বার্তায় সরল মনে হয়। নাচ শেখাবার প্রস্তাব পেয়ে দারুণ খুশি। বলেছে, চিপ রেস্তরাঁর এণ্টারটেনমেণ্টের নাচ থেকে রাজ-রাজড়ার ঘরের মেয়েদের নাচও আমি শেখাতে পারি। তবে আমার পরামর্শ চাও তো অপেরার নাচ শেখো, বড় বড় জায়গা থেকে তোমাকে লুফে নেবে।

কোথাও থেকে কেউ লুফে নিক এমন আগ্রহ নেই, কৌতূহল বশে অবন্তী জিগ্যেস করেছিল, সেটা কি রকম নাচ?

—ধাপে ধাপে অনেক রকমের আছে। অম্লানবদনে বলে বসল, আচ্ছা, আগে তোমার জামা কাপড় সব খুলে ফেলো, কি রকম নাচে তুমি সব থেকে বেশি অ্যাট্রাকশন ড্র করতে পারবে আমি দেখলেই বুঝতে পারব।

অবন্তীর দু' কান ঝাঁ ঝাঁ। অথচ লোকটা শয়তানি করে সব জামা কাপড় খুলে ফেলতে বলছে না। ঘরে কেবল বরুণ মেহ্‌রা। সে মজা পেয়ে হাসছে খুব। অবন্তী প্রায় ধমকের সুরে বলল, তুমি বড় ঘরের নাচই শেখাও আমাকে, অন্য কোনো নাচ শিখতে হবে না!

ইয়ানিক রাগের কারণ বুঝল না। বেজার মুখ করে বলল, সে-তো কেবল একটু সখের নাচ শেখা হবে, তোমার এমন ডার্ক বিউটি, এমন ফিগার—

—তাহলে আমার নাচ শিখে কাজ নেই, তুমি যাও।

ইয়ানিক অবন্তীর রাগ দেখেও মুগ্ধ। সে সখের নাচ শেখাতেই রাজি। কিন্তু তা শিখতে গিয়েও অবন্তীর এক-এক সময় দু' কান গরম।

তার ছাত্রী যে মেয়ে একটা এ-যেন ভুলেই যায়। লোকটাকে জো:
করে তফাতে ঠেলে সরাতে হয়। এরপর একদিন লোকটা কিছুট
উদার মুখ করেই অমায়িক প্রস্তাব দিল, তুমি কেন যে খুব সহজ হতে
পারছ না...তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে, যদি চাও তুমি
আমাকে এমনিতেই পেতে পারো। তার জন্য তোমার থেকে আমি
টাকা নেব না।...তাহলে তোমার আড়ষ্ট ভাব কেটে যাবে।

অবন্তী হাঁ হয়ে চেয়ে ছিল খানিক। তারপর হনহন করে চলে
এসেছে। বরুণকে বলেছে, লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াও
শিগগীর—ও আমাকে এই এই বলেছে।

রাগ দূরের কথা, বরুণ মেহরা হেসে বাঁচে না। অবন্তীকে কাছে
টেনে গলা খাটো করে বলেছে, তুমি একটা নির্দোষ লোকের ওপর
রাগ করছ, তোমাকে পছন্দ হয়েছে বলেই তার দিক থেকে সে উদার
প্রস্তাব দিয়েছে, লোকটা নাচও শেখায় বটে কিন্তু আসলে ও পুরুষ
দেহ-ব্যবসায়ী, এখানকার মেয়েদের কাছে ওর কদর আছে, উপার্জন
ভালো করে।

বিস্ময় কাটতে অবন্তী রেগে আগুন।—এই লোককে তুমি আমার
কাছে এনেছ নাচ শেখার জন্য—আর এসব লোকদের সঙ্গে তোমার
মেলামেশা?

বরুণের হাসির মধ্যে কদর্য কিছু নেই। সরল তরল হাসি
বলেছে, আরো কিছুকাল যাক, এ-সব ব্যাপার তুমিও চোখ বুজে
উড়িয়ে দিতে পারবে।

একে একে চার বছর কেটেছে। এর মধ্যে অবন্তী মেহরা অনেক
কিছুই চোখ বুজে উড়িয়ে দিতে পেরেছে, অনেক কিছু বা উড়িয়ে
দিতে চেষ্টা করেছে। এখন সে মোটামুটি জানে কোথা থেকে বরুণের
এত রোজগার আর কেনই বা তার এত খরচের ঝোঁক। টাকা কেন
জমাতে পারে না, কেন ব্যাঙ্কেও রাখতে পারে না। লোকটার স্বভাবও
অবশ্য এর জন্য অনেকটাই দায়ী, তার হাতে টাকা এলেই সে-টাকার
পাখা গজায়। এ ক'বছরে অবন্তী কত অজানা অচেনা মুখ দেখল

তার ঠিক নেই। তবে পুরুষ দেহ-ব্যবসায়ী ইয়ানিক আর হাতি-মার্কা খাইয়ে রজার বারডোঁর তার ঘরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। অবন্তীর মনে হয় ওই দুটো লোক যেন পুরনো ঘায়ের মতো বরুণের সঙ্গে লেগে আছে। তবু ইয়ানিককে অবন্তী বরদাস্ত করে, কিন্তু রজার বারডোঁকে দেখলে আজও তার বুকের তলায় গুরগুর করে। অথচ লোকটার দিক থেকে কোনো পরিবর্তন নেই, গায়ে পরে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা তো নেই-ই। কেবল মদ গেলে আর আয়েস করে খায়, খায় আর মদ গেলে আর অবন্তীকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তখন কলকাতার হস্টেলের সেই টিকটিকির কথা মনে পড়েই।

এমন দুটো মানুষের সঙ্গে বরুণের হৃদ্যতা কেন অবন্তী এখন ভালোই জানে। কোন্ ব্যবসার ভালো লিয়াজোঁ এরা তাও অজানা নয়। গোড়ায় গোড়ায় খুব দুশ্চিন্তা হত, ভয় করত। এখন সবই চোখ বুজে উড়িয়ে দিতে হয়। বুকের তলায় ভয়ের বাসা নিয়ে ক'দিন চলতে পারে? উড়িয়েই দিতে হয়।

...সব পশ্চিম দেশগুলোতেই নেশার ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকাচ্ছে, গোপন গর্তের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে যেখানে দরকার সেখানে অনায়াসে পৌঁছে যাচ্ছে। চৌদ্দ-পনেরো বছরের স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত এই নেশার বলি। পথের অতি সাধারণ রেস্তরাঁগুলোও এরই জোরে জাঁকিয়ে ব্যবসা করেছ—কিন্তু বাইরে কোনো ঠাট নেই জাঁক নেই। কে কাকে ধরে? ব্যাঙের ছাতার মতো ড্রাগ-রিং গজিয়েছে, গজাচ্ছে। কেবল ফ্রান্স নয়, সমস্ত সভ্য জগতের সামনে এটাই গুরুতর সমস্যা। কোকেন পিসিপি হেরোইন হাসিস এল এস ডি —এসব কত রকমের 'কোড' নামে কিভাবে চালান হচ্ছে তার হদিশ পাওয়া সহজ নয়। তুমি আর তোমার পাশের লোকটিই যে একই ড্রাগ-রিঙের বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে বসে, সে তুমি জানো না তোমার পাশের লোক জানে? তুমি ধরা পড়লে তুমি মরবে। সে ধরা পড়লে সে মরবে, তোমার জন্য সে মরবে না বা তার জন্য তুমি মরবে না—ভয়টা কি? কেউ বিপাকে পড়লে তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

লিয়াজোঁ বা সংযোগের কাজ যারা করছে তারা চুনো পুঁটি। রিং-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কেন পরোক্ষ যোগও নেই কারো। হোটেল রেস্তরাঁ এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরও চাহিদার খবর রাখা পর্যন্তই এই মাঝের লোকদের কাজ। কি বা কোন জিনিসের চাহিদা কোড্-নাম থেকে তারাই কি তা সব সময় বুঝতে পারে? বা পারলেও তা নিয়ে মাথা ঘামায়? খবর পাচার করার মধ্যেও কত রকমের ছলা-কলা কারসাজি।

তবু পুলিশ বা কাষ্টমস-এর জালে কি কেউ পড়ে না? অনেক সময়েই পড়ে।

যাক, অবন্তী মেহ্রা এত সব খুঁটিনাটি কিছুই জানে না। কিন্তু এটুকু খুব ভালো করে আঁচ করতে পারে বরুণের মিড্লম্যানের বিজনেসটা জটিলতামুক্ত বা নিরাপদ আদৌ নয়। রজার বারডোঁকে দেখলে আরো মনে হয় না। বরুণ এমনিতে দিলদরিয়া, কিন্তু তার ব্যবসার কথা তুললে খুব বিরক্ত হয়।

…বরুণ মেহরার সব থেকে সুবিধে সে এমব্যাসির চাকুরে। এই সুবিধেটা অবন্তী ভালো করেই বুঝেছে। অতি নিরীহগোছের সাদামাটা চাকুরে সে। রাজনৈতিক জটিলতা ভিন্ন আর কোনো জটিলতার বাতাস এদিকে কমই ছড়ায়। এমব্যাসির চাকরি এমব্যাসিব মানুষ—ব্যাস ধোয়া তুলসী পাতার জল। এক রাজনীতি ভিন্ন এমব্যাসির লোক সমস্ত চক্র-জালের বাইরে।

…কিন্তু চার বছর যেতে অবন্তী বিপদের গন্ধ পেল। চুপচাপ লক্ষ্য তো করেই যাচ্ছে, মানুষটার কেমন যেন দিশেহারা ভাব। কলিং বেল বাজলেই সচকিত হয়ে ওঠে। কিছুদিন ধরে অফিসেও যাচ্ছে না দেখছে। অসময়ে রজার বারডোঁ আর ইয়ানিক ঘনঘন আসছে। তুজনে একসঙ্গে নয় অবশ্য। কিন্তু সমস্যা এক রকমেরই মনে হয়। তাদের কেউ এলে বাড়িতে বসে কথা হয় না, বেরিয়ে যায়, এক দেড় তু'ঘন্টা বাদে ফেরে…রজার এলে ফিরতে আরো দেরি হয়। ভাবলেশ-শূন্য এই লোকটাকে দেখলে অবন্তীর এখন আরো বেশি ত্রাস। বরুণের সামনেই অপলক চেয়ে থাকে, তাকে পরোয়া করে না।

বড় রকমের দুর্যোগ কিছু মাথায় ভেঙেছে বোঝা গেল। একদিন ব্যস্ত হয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেই বলল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নাও, আমরা বেরিয়ে পড়ব কিছুদিনের জন্য, এয়ার প্যাসেজ বুক করেই এসেছি—

অবন্তী চেষ্টা করে কোনো কিছুতে খুব অবাক না হতে। এই লোকের এখন তাতেও বিরক্তি। দেখল একটু, জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

—আপাতত আমস্টারডম, কয়েকজন বন্ধু অনেকবার যেতে লিখেছে, হয়ে ওঠেনি।

অবন্তী তারপরেও সোজাসুজি চেয়ে রইলো।—আমার শরীর খারাপ জেনেও এমন তড়িঘড়ি বেরুতে চাইছ, কি ব্যাপার?

অবন্তী অন্তঃসত্ত্বা। চার মাস চলছে। কোন রকম উপসর্গ নেই অবশ্য। বরুণ ঝাঁঝিয়ে উঠল, পৃথিবীর কোথায় না ভালো নার্সিং হোম আর ভালো ডাক্তার আছে, অত ভয় পাবার কি আছে?

অবন্তী আর কিছু বলল না। যাবার আগে ইয়ানিক এলো। বরুণ বাড়ি ঘরের চাবি তার হাতে দিয়ে দিল। বাইরে থেকে যেমনই হোক, ভিতরে শৌখিন দামী জিনিস কম নেই। অবন্তীর কেমন ধারণা হল, এখানে আর তারা ফিরছে না, জিনিসপত্র হয়তো বেচে দেওয়া হয়েছে। ইয়ানিকের কথায় আরো খটকা লাগল। ইতস্তত করে বরুণকে বলল, রজার তো জানে তুমি একলাই যাচ্ছ, তোমার বউ এখানে থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এই লোকের মুখে অসহিষ্ণু ক্রোধ দেখে থেমে গেল। অবন্তীর দিকে ফিরে ইয়ানিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, গুড লাক ম্যাডাম, ফুটফুটে একটা বাচ্চা নিয়ে ফিরে এসো।

অবন্তীর কাছে এটুকু পরিষ্কার, শিগগীর অন্তত তারা ফিরছে না। নইলে এ-রকম শুভেচ্ছা জানাতো না। বাচ্চা আসতে এখনো ঢের দেরি।

প্লেনে কারো বাংলা বোঝার ভয় নেই। তবু এ-দিক ও-দিক একবার দেখে নিয়ে অবন্তী খুব ঠাণ্ডা সুরে জিগ্যেস করল, ভালো রকম গণ্ডগোলে পড়েছ তাহলে?

বরুণ মেহ্‌রা আর ঢাকতে চেষ্টা করল না।—হুঁ…কেউ বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে, নইলে এমব্যাসির লোককে কারো সন্দেহ হবার কথা নয়।

—ইয়ানিক বা রজার?

—ইয়ানিক তো নিজের পেশা ছেড়ে আমার দৌলতেই ভালো রকম করে খাচ্ছিল, এখনো আশা করছে দুর্যোগ কেটে যাবে রজার হতে পারত কারণ গোড়া থেকেই তোমার দিকে ওর চোখ… কিন্তু আমি ধরা পড়লে ওর বিপদ আমার থেকে বরং বেশি, ধরা পড়ছিই বুঝলে ও আমাকে খুন করেও নিজে বাঁচতে চাইতো।

—এমব্যাসির চাকরি গেছে?

—না, উড়ো চিঠি পেয়ে ওরা জাল ফেলার আগে আমি রিজাইন করে সরে এসেছি। তারা জানে আমি ইণ্ডিয়ায় ফিরব।....কিন্তু আশ্চর্য, উড়ো চিঠিতে এত সব পাকা খবর কে দিল!

অবন্তীকে স্থাণুর মতো বসে থাকতে দেখে ঈষৎ তিক্ত গলায় বরুণ বলল, তোমার জন্যও কেউ শয়তানি করে থাকতে পারে—আজ পর্যন্ত কতজন তোমাকে পাবার জন্য টোপ ফেলেছে খবর রাখো?

অবন্তী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো।—টোপ না গিলে নিজেকে বাঁচানো এত উদার তুমি? না কি এ-রকম বিপদ হতে পারে বোঝোনি বলে টোপ গেলো নি?

বরুণ মেহ্‌রার রাগে মুখ লাল। কিন্তু চোখে চোখ পড়তে মিইয়ে গেল। একটা হাতে চাপ দিয়ে বলল, তুমি আমাকে এ রকম ভুল বুঝো না, একটু ধৈর্য ধরো আর বিশ্বাস রাখো, আমি এ-ভাবে মুছে যাবার জন্য দুনিয়ায় আসিনি—দেখতে পাবে।

চার পাঁচ মাস ধরেই দেখতে পেল। আমস্টারডম হল্যাণ্ডের পর ডেনমার্ক ঘুরে শেষে ওয়েস্ট জার্মানিতে। সব জায়গাতেই চেনা জানা লোক কিছু আছে। অবন্তীর ধারণা, ধারণা কেন, বিশ্বাস এরাও নেশাখোরের দল। এই লোকদের আচার আচরণে কি মিল দেখে জানে না। কিন্তু আতিথ্য নেবার না হোক দেবারও সীমা আছে। সঞ্চিত টাকা বরুণ সহজে এখন খরচ করতে চায় না। অনায়াসে

হাত পাতে, ধার চায়। হঠাৎ অসুবিধে পড়ার কথা বললে কেউ অবিশ্বাস করে না। কিন্তু আতিথ্য নেবাব বা ধার পাবার লোক ফুরালে আবার অন্যত্র পাড়ি দেয়। যেখানেই যায়, তার প্রথম কাজ প্যাবিসে ইয়ানিককে চিঠি লেখা। অবন্তীর ধারণা সেখান থেকে গ্রীন সিগন্যাল পাবার আশায় আছে।

ওয়েস্ট জার্মানিতে এসেই অবন্তী হাসপাতালে ভর্তি হল। শরীর একটু আগেই বিকল হয়েছে। তাকে হাসপাতালে দিয়েই বরুণ মেহ্‌রা তিন-চারদিনের জন্য কোথায় আবার ঘুরে আসতে গেল। জিগ্যেস করলে সত্যি জবাব পাবে না ধবে নিয়ে অবন্তী কিছু জিজ্ঞেস করে না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। মৃত। মৃতও ঠিক নয়, অবন্তী শুনেছে জন্মাবার ঘণ্টাখানেক বাদে অর্ধ-মৃত থেকে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছেছে। বরুণ মেহ্‌রার ধারণাও নেই গত ক'মাস ধরে অবন্তী নিঃশব্দে কত ধকল সহ্য করেছে, দেহটা কত সময় বিদ্রোহ করেছে। মৃত শিশু সামনেই শয়ান। তার আট আঙুল শরীরেব নরম হাতের কব্জিতে একটা টিকেট বাঁধা। টিকেট বাঁধা কারণ যে এসেছে সে বেঁচে নেই। আশ্চর্য রকমের নিস্পন্দ, ঠাণ্ডা, অবাক চোখে দেখার মতো। অবন্তী মন দিয়ে দেখছে, কারণ সে কিছু ভাববে না, ভাবতে চায় না।... জানালা দিয়ে কাছে দূরের কয়েকটা বাড়িও এই সদ্যজাত মৃতের মতো নিশ্চল, নিস্পন্দ। অবন্তী দেখছে কারণ সে কিছু ভাববে না।

ছাড়া পেতে দিন-কতক সময় লাগল। আগের ব্যবস্থা মতো অবন্তীর ছোটখাটো একটা অপারেশন হয়েছে। আর যাতে সন্তান না হয় সেই অপারেশন। আব সন্তান হবে না। বরুণকে কিছু বলেনি, ডাক্তারকে বলে নিজেই ব্যবস্থা করেছে।....এই ছেলে বাঁচবে না অবন্তী জানত না...জানলে কি করত? না ভাববে না।

বরুণ মেহ্‌রা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আগেই ফিরে এসেছে। খুব বিমর্ষ। খুব বিষণ্ণ। অবন্তী কিছু জিগ্যেস করেনি। ওকে নিয়ে একটা খুব শস্তার আস্তানায় উঠেছে। ওয়েস্ট জার্মানিতে

গরিব অনেক, এ-রকম আস্তানাও অনেক। বরুণ নিজে থেকেই জানিয়েছে, খুব গোপনে সে প্যারিসে গেছল। কিন্তু প্যারিস তার কাছে এখন আরো বিপজ্জনক। ইয়ানিক যতটা পারে সাহায্য করেছে। বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রির গচ্ছিত টাকা ছাড়াও আরো কিছু পাওনা টাকা দিয়েছে। আর রজার নাকি তাকে দেখেই ক্ষেপে গেছল, বরুণ ধরা পড়লেই তার বিপদ।

আরো পাঁচ ছয় মাস বাদে অবন্তীর শরীর স্বাস্থ্য আবার ঠিক আগের মতোই। আশ্চর্য, শরীরটা তার কি ধাতুতে গড়া? বরুণ তো এতদিনে আধখানা হয়ে গেছে।

…পুঁজির টাকা খরচ করার ব্যাপারে সাবধান, তবু খরচ তো হচ্ছেই। অবশ্য ধারও সমানেই চলেছে, এমন অনায়াসে হাত পাতে লোকটা যেন ধার পাবার অধিকার আছে।

…হঠাৎ সে বেজায় হাসি খুশি একদিন। আবার যেন পুরনো উৎসাহ পুরনো উদ্যম ফিরে পেয়েছে। কারণ? কারণ লণ্ডন থেকে জগদীশ কাপুর অর্থাৎ জর্জ তার চিঠির জবাব দিয়েছে। সে নাকি এই চিঠিরই অপেক্ষায় ছিল। জর্জ লিখেছে এখানে চলে এসো, একটা ভালো কাজের ব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক হয়েছে। আপাতত একলাই এসো, তোমার বউকে এখন এনো না, তার এখন প্যারিসেই থাকা দরকার। আমার যেটুকু খবর, তোমার দুর্যোগ শিগগীরই কেটে যাবে আর বহাল তবিয়তে তুমি আবার ফ্রান্সে ফিরে যাবে। নানা কারণে তোমার বউয়ের এখন প্যারিসেই থাকা দরকার। ইত্যাদি—।

….টাইপ করা চিঠি। তলায় কলমের আঁচড়ে লেখা ইয়োরস 'জি'। খামটা বেশ পুরনো মনে হল অবন্তীর। সে নির্বাক নিস্পন্দ ঠাণ্ডা। আশ্চর্য, অবন্তীর এমন ভিতর দেখা চোখ কবে থেকে হল হতে পারে জর্জই লিখেছে, লিখলেও শেখানো চিঠি। আর নয়তো নিজেই টাইপ করে নিচে 'জি' বসিয়ে দিয়েছে। মোট কথা লোকটা পালাচ্ছে। নিজের কাছ থেকেও পালাচ্ছে, ওর কাছ থেকেও পালাচ্ছে। উৎসাহ আর খুশির এমন বীভৎস কৃত্রিমতা অবন্তী আর কি দেখেছে?

চোখে চোখ রেখে খুব ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করেছে প্যারিসে আমি কোথায় থাকব—কি করে চলবে?

—তোমার কিছু চিন্তা নেই, সেখানে এখনো আমার পনেরো বিশ হাজার ফ্রাঁ লোকের কাছে পাওনা আছে, ইয়ানিক আর রজার সে টাকা আদায় করে তোমাকে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। জর্জের চিঠি পাব ধরে নিয়েই ওদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছি—রওনা হবার আগে ইয়ানিককে আমি টেলিগ্রাম করে দেব, সে এয়ারপোর্ট থেকে তোমাকে নিয়ে যাবে। তাছাড়া কিছু টাকাও তোমার সঙ্গে আমি দিয়ে দিচ্ছি, ইয়ানিকের ঠিকানাটাও নোট করে নিও।

অবন্তী আর কিছুই বলেনি। কি বলবে? বলবে, তুমি আমাকে ছেড়ে পালাচ্ছ? বলে কি লাভ হবে?

....দু'চোখ মেলে আরো কিছু দেখার ছিল অবন্তীর। অবাক হবার ছিল। অবন্তী ঠাণ্ডা সহিষ্ণুতার ঠাট বজায় রাখতে পেরেছিল বইকি। স্টেশনে বরুণকে বিদায় দিতে গেছল। ট্রেনে কোথায় হয়ে লণ্ডনে যাবে। ট্রেন ছাড়ার আগে লোকটার চোখে জল দেখেছিল অবন্তী। ওকে বার বার করে বলছিল, লণ্ডনেই যদি থেকে যাই তোমাকে শিগগীরই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব—নয়তো আবার প্যারিসেই ফিরে আসব। তোমাকে নিয়ে ফ্রান্সের অন্য কোথাও থাকব।

এয়ারপোর্টে ইয়ানিক বা রজার বারর্ডো কেউ আসেনি। কেউ আসবে না অবন্তী ধরেই নিয়েছিল। ইয়ানিকের ঠিকানা তাকে দেবার কারণ যাতে প্যারিসে এসে ও নিজেই তার খোঁজ পেতে পারে।

না, অবন্তী সে চেষ্টা করেনি। এতদিনে বরুণ জানে তার মতো মেয়ের এ-জায়গায় বেঘোরে মারা পড়ার কথা নয়।

কিন্তু সে ভাবে বাঁচার ইচ্ছেও নেই অবন্তীর। দরকার মতো ঘুমিয়ে পড়ার রসদ তার ব্যাগেই আছে। পুরো একটা ফাইল। ঘুমিয়ে পড়বে বলেই ওটা সংগ্রহ করে রাখা। যে ঘুম আর ভাঙবে না সেই ঘুম। সদ্যজাত সেই একটু মানুষের আকারের মাংসখণ্ডের মতো

নির্বাক নিশ্চল পড়ে থাকবে। ...কিন্তু আবার ভেবেছে এ-ভাবে চলে যাবার জন্যই কি সে পৃথিবীতে এসেছে। জীবনে কিছু ভুল হয়তো করেছে, অপরাধ কি করেছে? আর ভুলটাও মানুষকে বিশ্বাস করার ভুল।

কিন্তু পাঁচ সাতদিনের মধ্যেই ভয়ানক ক্লান্ত। স্যুটকেস দুটো একটা স্টোর-শপে জমা রেখে টিকিট নিয়েছে। সকালের দিকে কোনো শস্তার রেস্তরাঁয় বসে যতক্ষণ পারে কাটায়। কখনো অনির্দিষ্টের মতো ঘোরে। সন্ধ্যার পর থেকে খুব একটা ভাবতে হয় না। কোনো রেঁস্তরায় গিয়ে জায়গা বেছে বসলেই হল। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করার পরেই কেউ না কেউ আসে। সে একলা কেন জিগ্যেস করে। প্রিয়জন আপাতত বাইরে শুনে সবিনয়ে জিগ্যেস করে সঙ্গ দিতে পারে কিনা। অবন্তী হাসে। খানাপিনা চলে। তার পরে আরো অন্তরঙ্গ হতে চাইলে অবন্তীর কিছু একটা অজুহাত দেখাতে হয়।

কোনো কোনো পরিচিত বা অল্প-স্বল্প চেনা-জানা লোকের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে অবন্তী দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাবে ঢুকবে কিনা। ভাবে আশ্রয় আর কিছু খাবার চাইবে কিনা। কিন্তু বরুণের সঙ্গে থেকে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারপর এ রকম চেষ্টা করেনি।

...প্যারিস যেমন ছিল তেমনি আছে। আজ যেমন কালও তেমনি। অবন্তী শুধু কাল যা ছিল আজ তা নয়। যেদিকে তাকাও, মানুষজন ঘর-বাড়ি। তার মধ্যে সে নিঃসঙ্গ একা। হতাশার বাষ্পের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। প্যারিস নাকি আলোর শহর, প্রেমানুরাগের শহর, প্রেমিক দম্পতীর স্বপ্নের শহর। বরুণ মেহ্‌রার সঙ্গে যে সব রাস্তায় পুরনো গাড়িতে চড়ে বেড়াতো সে-সব জায়গায় পায়ে হেঁটে ঘোরে। এমন নিঃসঙ্গ হাঁটার অর্থ অনেকে বোঝে।...এই দেহ, ব্ল্যাক জেম অনেক অনেক চোখ টানে। অনেকে এগিয়ে আসে।

...রাতে, বেশি রাতেও নিজের মনে হেঁটে যাও, কোন দিকে না তাকালে অসুবিধে নেই। তাকালে আবছা বাড়িগুলোকে এক-একটা স্থির দানবের মত মনে হবে। তোমার টাকা আছে? কিছু বড়লোক

বন্ধু আছে? এগুলো তখন দানব নয়—বাড়িই। সিঁড়ি ধরে ওঠো, বেল বাজাও। দরজা খুলে যাবে, মিষ্টি হেসে কেউ এগিয়ে আসবে। কিন্তু তোমার সম্বল আছে কি নেই তারা খুব জানে, দেখলেই বুঝতে পারে। তুমি মেয়েছেলে বলেই সম্মান দেখিয়ে একটু সরে দাঁড়াবে তারপর সবিনয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করবে, আগের পরিচয় স্মরণ করতে চেষ্টা করেও পারবে না।

···এখানে নয়, আশ্রয় যদি পেতে চাও, শস্তার হোটেল রেস্তরাঁয় যাও, নিজে হাসো আর ফূর্তি করো, আর ফূর্তির রসদ যোগাও, ফ্রান্স সত্যিই প্রেমিক-প্রেমিকার শহর। সেই প্রেমের মেয়াদ যদি দু-দশ ঘণ্টা ধরে নাও, তোমার মতো মেয়ের ভাবনা কি? মিসট্রেস হবে? অভিজাতদের মিসট্রেস হওয়া এখানে তো অগৌরবের কিছু নয়।

চিন্তার শেষ। ভাবনার শেষ। এক বিকালে অবন্তী ইয়ানিকের কাছে গিয়ে হাজির। তাকে দেখে সে লাফিয়ে উঠল। একটু হয়তো বা আঁতকেও উঠল। ··· তুমি মাদাম! কবে এলে? মেহ্‌রা কোথায়?

অবন্তীর মাথা ঘুরছে। সকাল থেকে খাওয়া হয়নি। বসল।— তুমি কিছু জানো না?

সে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল, তুমি এখানে আসছ লিখেছিল, তোমার কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধও করেছিল··· কিন্তু সে কি তোমাকে ছেড়ে পালিয়েছে?

অবন্তী চুপচাপ চেয়ে আছে।

—বুঝলাম। ইয়ানিকের চোখে মুখে দরদের ছোঁয়া, গলার স্বরও মোলায়েম নরম।—দেখো মাদাম, আমি যতটা পারি তোমাকে সাহায্য করব, তার আগে তুমি মন স্থির করো কি চাও, কিন্তু খুব উঁচু মহলে ভিড়তে চাইলে কিছু সময় লাগবে···তবে তার আগে তোমার থাকার মত একটা নিরাপদ জায়গা চাই—তুমি এখানে আসছ জেনেই একজন অন্তত বেড়ালের ইঁদুর-খোঁজা চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকেও খুব বিশ্বাস করে না, ভাবে কোথাও তোমাকে লুকিয়ে রেখেছি। কবে এসেছ, কোথায় আছ এখন?

অবন্তী তক্ষুনি বুঝল কে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রজার বারডোঁ ছাড়া আর কে হতে পারে?—মাসখানেক হল…থাকার কিছু ঠিক নেই। চাউনি তির্যক একটু, তুমি আমাকে কোথায় রাখতে চাও?

ইয়ানিক হাসতে লাগল।—ছাখো মাদাম, মেয়েদের জন্য আমার এ দেহটা এতদিন ধরে এত খেটেছে যে তোমার ওপর আমার কোনো লোভ নেই…কিন্তু তোমাকে আমার ভালো লেগেছে, একজন আর্টিস্টের ভালো লাগার মতো। তোমার উপযুক্ত বাগানে তোমাকে হাঁটতে দেখলেই আমি খুশি হব।

অবন্তী অপেক্ষা করছে। কথাগুলো কানে একটা আওয়াজের মতো লাগছে। না বোঝার মতো কথা নয়, কিন্তু কিছু না খাওয়া পর্যন্ত কিছুই মাথায় ঢুকছে না…কিন্তু খায়ইনি বা কেন! ভ্যানিটি ব্যাগে তো খাবার টাকা নেই এমন নয়!

ইয়ানিক নিজের আবেগে বকেই চলেছে।

হঠাৎ কিছু কানে আসতে চমকে উঠল লোকটা। তু'কান খাড়া করে কিছু বুঝতে চেষ্টা করল। তারপরেই আড়ষ্ট। মচমচ জুতোর শব্দ তুলে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে অবন্তীও কাঠ একেবারে।

রজার বারডোঁ।

লাল লোমশ তু'হাত কোমরে তুলে অপলক চোখে অবন্তীর আপাদমস্তক দেখল।

—কবে এসেছ?

অবন্তী নিরুত্তর। সে-ও চেয়েই আছে।

ইয়ানিক চিঁ চিঁ করে জবাব দিল, মাসখানেক হল…

সঙ্গে সঙ্গে থাবার মতো তু'হাত বাড়িয়ে ওর গলাটা ধরে বসা থেকে একেবারে তুলে ফেলল রজার বারডোঁ।—একমাস ধরে তুই আমার চোখে ধুলো দিয়ে আসছিস?

ইয়ানিকের তু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম। অবন্তীর এই মাথায়ও রক্ত উঠল কি করে জানে না। উঠে দাঁড়িয়ে রজারের গলা-ধরা হাতে গায়ের জোরে একটা চাপড় বসিয়ে দিল।—ছাড়ো বলছি—ওর সঙ্গে আজই আমার প্রথম দেখা হল!

ছেড়ে দিল। আবার দেখতে লাগল। পুরু ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস। আরাম করে বসল। বিশাল বুক ঠেলে ফোঁস করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ঠেলে বেরুলো।—আরো তুমি স অগে তোমাকে আমার কাছে এখানে পাঠিয়ে মেহ্‌রাকে ওয়েস্ট জার্মানি থেকে সরে পড়তে লিখেছিলাম। আমার খবর আছে সে সেখানে নেই, কোথায় আছে? এখানেই যদি এসে থাকে তাকে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না।

ইয়ানিক কাঠ-শুকনো গলায় জানান দিল, মেহ্‌রা ফ্রান্সে আসেনি, সে এখন লণ্ডনে।

...টাউস টিকটিকির অপলক দু'চোখ খুব ধীরে সুস্থে অবন্তীর সর্বাঙ্গে ওঠা নামা করল একবার। তারপর হঠাৎ একটু অন্যরকমের অনুযোগ।—তোমার শরীর টলছে কেন—হাংরি?

অবন্তী অনেকটা নিজের অগোচরেই মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, ক্ষুধার্ত।

—কাম অন্। উঠে হাত ধরে টানল, ইয়ানিককে বলল, তুমিও এসো।

বাধা দেবার শেষ চেষ্টা অবন্তীর—ধন্যবাদ, তোমার সঙ্গে কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই, তুমি যেতে পারো।

জবাবে বাহু ধরে একটা হ্যাচকা টান দিল। ধরা না থাকলে অবন্তী মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ত। টানা যান্ত্রিক গলায় ইয়ানিক বলল, বস্‌-এর অবাধ্য হয়ো না ম্যাদাম, চলো—

না অবন্তীর আর বাধা দেবার শক্তি নেই।

প্রায় দশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যে রেস্তরাঁর সামনে ক্যাব থামল সেটাকে দরিদ্র এলাকাই বলা যেতে পারে। রজার নেমে হাত ধরে অবন্তীকে নামালো।

সন্ধ্যা রাতেই এখানে ভিড় মন্দ নয়। রজার তার বাহু খামচে ধরে এগিয়ে চলল। অর্ধনগ্ন দুটো মেয়ে নাচছে।

রারডোঁকে দেখে স্টুয়ার্ড নয়, কর্তাব্যক্তির মতোই একজন লোক এগিয়ে এলো। তার ফিটফাট বেশবাস। সে তুলনায় রজার বা ইয়ানিকের যা চেহারা আর বেশবাস, এই দলকে দেখে কারো খুব

একটা ব্যস্ত হবার কথা নয়। কিন্তু যে এলো সে-ই যেন এখানকার মুরুব্বি। রজারের পছন্দের জায়গাও লোকটা জানে। সাদরে এনে বসার ব্যবস্থা করল। ইশারায় তাদের বসতে বলে রজার লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল।

ফাঁক পেয়ে ইয়ানিক একটু ঝুঁকে অবন্তীকে বলল, আপাতত তোমার আমার সব প্ল্যানই বরবাদ, তুমি ধৈর্য খুইয়ে বোসো না মাদাম, খুব অনুগত ধৈর্য ছাড়া এই লোকের চোখে তুমি ধুলো দিতে পারবে না।

অদূরে একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়ে যে লোকটার সঙ্গে কথা বলছে রজার সে একটু পরেই ঘাড় ঘুরিয়ে বেশ করে একবার অবন্তীকে দেখে নিল। তারপর আবার রজারের দিকে ফিরে সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে আরো একটা লোককে ডাকল। রজার ফিরে আসছে।

খেতে খেতে অবন্তীর মনে হচ্ছিল অনেক দিনের মধ্যে এত ভালো খায়নি। অথচ এমন আহামরি খাবার নয় কিছু। খাওয়ার কথাটা সকাল থেকে মনেই পড়েনি কেন আশ্চর্য। আজ আর রজারের হাতির খাওয়া দেখে অবন্তীর গা ঘিনঘিন করছে না। কেবল এটুকু লক্ষ্য করেছে, লোকটা শুধু খাবারই খাচ্ছে, মদ না। অথচ তারই পয়সায় ইয়ানিকের বেশ মদ চলছে। চার পাঁচটা শেষ করেছে। তার কথায় অবন্তীও একটা নিয়েছে। শুধু খাদ্যে এত অবসাদ যাবার নয় বলেই আপত্তি করেনি। দেহটা অনেকদিন ধরে একটা যন্ত্রের মতো চলছিল। এখন আস্তে আস্তে চেতনার জগতে ফিরছে।

রেস্তোরাঁর বেশ কাছেই একটা বাড়ি। সেকেলে পুরানো বাড়ি। দেখলে মনে হবে হা-ঘরে লোকদেরই বাস এখানে। কিন্তু যে অ্যাপার্টমেন্টে রজার তাদের নিয়ে ঢুকল সেটা বেশ বড়সড় আর পরিচ্ছন্ন। অল্প আসবাবপত্র সাজানো গোছানো। দেয়ালের ধারে প্রশস্ত শয্যা, গোটা দুই কুশন চেয়ার। কাঁধে সামান্য চাপ দিয়ে রজার অবন্তীকে একটা কুশনে বসিয়ে দিল।

ইয়ানিক আর রজার এক-হাত ফারাকে মুখোমুখি। একজন বিরাট জানোয়ারের মতো পুরুষ, আর একজন মেয়েদের পুরুষ।

রজারের পুরু ঠোঁটে টিপটিপ হাসি, চোখদুটো হুলো বেড়ালের মতো ঝকঝক করছে।

—আমি খুব সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম, কেমন?

ইয়ানিক সুবোধ ছেলের মতো মাথা নাড়ল। তাই।

—গিয়ে না পড়লে তুমি কি করতে?

—মাদামকে দেখে তখন পর্যন্ত আমি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসতে পারিনি—কি করতাম ভাবিনি, তবে খুব দুর্মতি না হলে তোমার কাছেই নিয়ে আসতাম বোধহয়।

ঠোঁটের হাসি আর একটু স্পষ্ট হল।—কারো কাছ থেকে টাকার টোপ গিলে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না আশা করি?

ইয়ানিক মজার কথা শুনেছে যেন।—আমার প্রাণের মায়া আছে।

—তোমাকে কিছুদিন এখন আমার দরকার হবে, কাল আজকের এই সময়েই রেস্তরাঁয় এসো—এখন সরে পড়ো।

ইয়ানিক দরজার দিকে এগোতেই অবন্তী ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো।—ও যাচ্ছে কোথায়, আমিও যে যাব!

রজার সোজা ওকে আগলে দাঁড়াল। ঝাঁঝালো গলায় অবন্তী বলল, সরো!

জবাবে দু'হাতের থাবা তার দুই কাঁধে উঠে এলো। অবন্তী নিজের অগোচরে পায়ে পায়ে পিছু হটছে, তাকে তেমনি ধরে রেখেই রজারও এগোচ্ছে। তারপরেই দিশেহারা, গলা দিয়ে অস্ফুট একটু আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। ওই দুই হাতের ধাক্কায় দেহটা পরের মুহূর্তে বুঝি চুরমার হয়ে যাবে, ভয়ে অবন্তী দু' চোখ বুজে ফেলল।

না—সে শয্যায় আছড়ে পড়েছে। খুব নরম গদীর শয্যা। অবন্তী চোখ মেলে তাকালো। ইয়ানিক চলে গেছে। রজার বন্ধ দরজার ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে।

দেয়ালের গায়ের ঢাউস টিকটিকি নয়, শয্যার দিকে মানুষের আকারের একটা দানব এগিয়ে আসছে।

দিন মাস বছরের খুব হিসেব নেই অবন্তীর। তার এই জীবনের সঙ্গে কেবল রাতের যোগ। দিনে ঘুম। রেস্তরাঁয় রাতের রানী সে।

সেই রেস্তরাঁরই। সেখানে মাঝরাত পর্য্যন্ত দফায় দফায় নাচতে হয়। সমঝদারের দল বেশি জুটলে সে-রকম বিশ্রামও মেলে না। দেহসৌষ্ঠবের লীলা দেখিয়ে মানুষকে কাচপোকার মতো আটকে রাখতে হয়। নগ্ন নাচ অবশ্য নয় তবে খুব একটা তফাতও নেই। অবন্তীর ধারণা সে ভালো টাকাই রোজগার করে। কিন্তু যা পায় সেটা সোজা রজারের হাতে চলে যায়। রজার কি ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সাজসজ্জা আরাম বিলাসের জন্য কম খরচ করে? মোটেই না। অবন্তীর ধারণা বেশিই খরচ করে। কিন্তু এমন প্রেয়সীর হাতে কাঁচা টাকা তুলে দেবার মতো বোকা সে নয়।

এক দেড় মাসের মধ্যে ইয়াসিন ওকে ভালোই নাচ শিখিয়েছে। এই দায়িত্ব নেবার জন্যই তাকে আসতে বলা হয়েছিল। দায়িত্ব সে ভালোই পালন করেছে। ওই রেস্তরাঁর ওপর রজারের এত প্রতিপত্তির রহস্য অবন্তীর আজও অজানা। আজও বলতে প্রায় দু'বছর তো হতে চলল। ইয়াসিক ফাঁক পেলে আফশোসের কথা শোনায়। কত বিরাট বিরাট মানুষের আদরের মিসট্রেস হতে পারতে তুমি, আর কি বরাতই না করে এসেছ—কবে যে তোমার ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে।

অবন্তী এখন একটু-আধটু রসিকতাও করতে পারে।—কেন, রজারও তো বিরাট মানুষই।

রেস্তরাঁ জমিয়ে রাখা অবন্তীর কাজ। কিন্তু কারো ব্যক্তিগত মনোরঞ্জনে কঠিন অলিখিত নিষেধ। লুব্ধ হয়ে কতজনে এগিয়ে এসেছে, এই লৌহ প্রমোদ বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তলায় তলায় অবন্তীও কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু স্পষ্ট বুঝেছে তাতে প্রাণটি যাবে। যাবেই। রজারের হয়ে অনেক চক্ষু তার প্রহরায় মোতায়েন। যারা এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছে তাদের পিছু হটাতে সময় লাগেনি। ইয়াসিকের কথা সত্যি কিনা জানে না, তাদের কারো কারোকে নাকি দেড় দু'মাস করে হাসপাতালেও থাকতে হয়েছে। খুব বেশি এগিয়েছিল একজন। তারও পয়সার জোর ছিল। খুব সংগোপনে দিন গোনার সময় এগিয়ে আসছিল অবন্তীর। তারপর হঠাৎই দেখা

গেল সেই লোক একেবারে নিখোঁজ। ওই লোকের কোনো অস্তিত্বই যেন কারো জানা নেই বা ছিল না। অবন্তী এটুকু বুঝেছে রজার বারডোঁর এমন কিছু পরিচয় আছে যা জীবন-প্রিয় লোকের কাছে ত্রাসের মতো। অবন্তীর এই দেহের ওপর কেবল একজনের অধিকার। রজার বারডোঁর। সে খুব ভোরে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যার পর বা একটু রাতের দিকে রেস্তরাঁয় ফেরে। ধীরে সুস্থে মদ গেলে আর রাক্ষসের মতো খায়। তারপর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ঘুম। অবন্তী ফেরে গভীর রাতে বা শেষ রাতে। রজারের নাকের ডাকে তখনো ঘর গমগম করতে থাকে। অবন্তীর এখন আর তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। রেস্তরাঁর লোক ক্যাব থেকে নামিয়ে দিলে একরকম ঘুমোতে ঘুমোতেই ঘরে এসে ধুপ করে বিছানায় পড়ে। তার খানিক বাদেই হয়তো রজার উঠে নিজের কাজে চলে যায়। অবন্তী টেরও পায় না। কিন্তু রাতে রেস্তরাঁয় এসে রজার যেদিন মদ গেলে না, শুধু খাবার খায়, অবন্তী বুঝতে পারে তার নাচের মেয়াদ সেই রাতে আর বেশি নয়—তাকেও সঙ্গে যেতে হবে, শয্যার দোসর হতে হবে। এমনি করেই দু'দুটো বছর কাটাতে চলল।

....একদিন একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম ঘটে গেল। কি কারণে খুব ভোরে অবন্তীর ঘুম ভেঙে গেল জানে না। খুটখাট শব্দ কানে আসছে। আধ-চোখ বুজেই দেখল রজার কিছু নিয়ে ব্যস্ত। পাশের দেয়ালে স্টিল ফ্রেমের একটা ফোটো টাঙানো থাকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সেটা উল্টে একটা স্ক্রু বা প্যাঁচ ঘুরিয়ে রজার ফ্রেমের একটা দিক খুলে কি বার করল। স্টিল সেফটা একটা স্টিল স্ল্যাবের ওপর বসানো। তলার ওটা নিরেট স্টিল বলেই জানত অবন্তী। হাতে কিছু নিয়ে ওটার পিছনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রজার। পিছনে ঝালরের মতো ঢাকনা সরিয়ে চাবি লাগিয়ে কিছু খুলল মনে হল। আধা-চোখ বোজা অবস্থাতেই অবন্তী অবাক। সেফের মুখ তো সামনে, তলার স্টিল স্ল্যাবের পিছনে নিচের দিকে খোলার কি আছে? এক মিনিটও নয়, ঠুক্ করে কিছু বন্ধ করা আর চাবি দেওয়ার শব্দ। ফিরে আবার টেবিলে এসে ফোটো ফ্রেমের পিছনে হাতের জিনিসটা

রেখে রজার ফ্রেমটা আটকে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিল।

অবন্তীর মনে হল, তার বুকের তলায় হাতুড়ি পেটার মতো টিপটপ শব্দ হচ্ছে, সেই শব্দও লোকটার কানে যেতে পারে। মড়ার মতো আড়ষ্ট হয়ে না থেকে গভীর ঘুমের শ্বাস-প্রশ্বাসটাই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইলো। রজার ফিরেও তাকালো না, একটু বাদে বেরিয়ে গেল। তার ঝরঝরে গাড়ির শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

অবন্তী উঠে বসল। গরম হাউস-কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারও দরকার ছিল না, কাঁপুনির চোটে ঘামছে মনে হল।

কাঁপা হাতে ফোটো ফ্রেমটা দেয়াল থেকে খুলে আনল। পিছনে ছোট্ট রিং। ঘোরাতেই ফ্রেমের একটা দিক আলগা হয়ে গেল। উল্টে ধরতেই টেবিলে ঠক্ করে একটা চাবি পড়ল. স্ল্যাবের পিছন দিকের ঝালরটা তুলল। না, ওটা নিরেট স্টিল নয়। চাবিটা লাগল। তাল খুলতেই গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

স্তূপে স্তূপে টাকা। তাড়া-তাড়া নোট। ফ্রাঁ নয়, সব ডলারের পাঁজা।

না, এরপর রজার ঘরে থাকলে অবন্তী দু'মাসের মধ্যে দেয়ালের ওই স্টিল ফ্রেমের দিকে বা সেফটার দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। মনে হত তাকালেই ধরা পড়ে যাবে। তার অনুপস্থিতিতে অবন্তী এরপর মনে মনে অনেক প্ল্যান করেছে। কিন্তু সাহস করে কোনোটার দিকেই এগোতে পারেনি।

সেদিন সকালে ইয়ানিক এসে গম্ভীর মুখে খবর দিয়ে গেল, প্রস্তুত থাকো, বডি আইডেন্টিফাই করার জন্য পুলিশ যে-কোনো মুহূর্তে তোমাকে নিয়ে যাবে।

অবন্তী হাঁ।—কার বডি আয়ডেন্টিফাই করার জন্য?

—রজার বারডোঁর, আজ ভোর রাতে তার লাশ পাওয়া গেছে, বুলেটে বুক ঝাঁঝরা—পুলিশের ধারণা শত্রুপক্ষের কোনো ড্রাগারিঙের কাজ। আমি যাই, পুলিশ আমাকে এখানে দেখলে হাজার জেরায় পড়ব।

অবন্তীর কি অবাক হবার সময় আছে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার সময় আছে?

ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

সেফের নিচের স্টিল স্ল্যাবের ডালা খুলে হাঁ। ছোট্ট একটা নোটের পাঁজা শুধু পড়ে আছে। বাকি সব হাওয়া।

ভিতরটা প্রথমে হতাশায় ভেঙে পড়ার মতো হল। তারপরেই সচকিত। পাতলা নোটের তাড়াটা নিয়ে দেখল। তিন হাজার দু'শ' ডলারের তাড়া একটা। ওটা লুকোবার জন্য কিছুরই দরকার নেই। বত্রিশখানা একশ' ডলারের নোট। বুকের জামা টেনে ভিতরে ফেলে দিল।

....রেস্তরাঁর নাচিয়ে মেয়েদের লাভার তো থাকেই আর অবন্তী তো ওই রেস্তরাঁর প্রায় দু' বছরের পাকাপোক্ত নাচিয়ে মেয়ে। তাকে নিয়ে পুলিশের কোনোরকম টানা-হেঁচড়াই পড়ল না। রজারের ঘর সার্চ করে পুলিশ কি পেল, অবন্তী তা-ও জানে না। রজারের মৃত্যুর রাত থেকে অবন্তী এই ক'টা দিন ওই রেস্তরাঁরই দোতলার একটা ঘরে আছে। সে যাতে অন্য রেস্তরাঁয় চলে না যায় সেই জন্য ম্যানেজার মোটা টাকার টোপ ফেলে রেখেছে।

অবন্তী বিশ পঁচিশ দিন সময় নিয়ে খুব নিঃশব্দে ফ্রান্স ছাড়ার ব্যবস্থা করল। রাতে নাচে, দিনে বেরোয়। কি করছে কে খবর রাখে। এমনকি ইয়ানিককেও কিছু বলেনি। সে মাদামের মতো মিসট্রেসের জন্য জাঁদরেল লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এয়ারপোর্টে ডলার ভাঙাতে অসুবিধে নেই। দু' হাজার ডলার তার বুকে। বাকি বারোশ' থেকে সাতশ' ডলার দিয়ে সস্তার রুটে দিল্লি পর্যন্ত এয়ার প্যাসেজ বুক করেছে। তিনশ' ডলারের টুকিটাকি দরকারি জিনিস কিনেছে। বিশ ডলার দিয়ে একটা বড়সড় নাকের পাথরও কিনেছে। এত সাদা জেল্লা দেখলে মনে হবে অনেক দাম। এতদিনের পুরোনো পোখরাজের থেকেও জেল্লা বেশি। হাতে সম্বল দু' হাজার দু'শ' ডলার।

....দিল্লি ফিরে তারপর কোথায় যাবে, কি করবে? না, এখন না, পরে ভাববে। প্লেন ছাড়ার পরেও একই চিন্তা। কিন্তু না, দিল্লি পৌঁছে তারপর চিন্তা। দিল্লি পৌঁছুলো। একটা সস্তার

হোটেলে উঠল। কিন্তু সস্তা হলেও তার মূল পুঁজির তুলনায় কি-বা। ব্যাঙ্ক থেকে দু'হাজার দু'শ ডলার ভাঙিয়ে নিয়েছে। অত হিসেব মাথায় খেলে না, মোট বাইশ হাজার কত টাকা পেয়েছে। খুচরো হাজারখানেক টাকার কিছু বেশি সুটকেসে, বাকি একুশ হাজার টাকা তার বুকে। সুটকেসে রাখার সাহস নেই। ভাগ্যটা যেন খুলেও খুলল না। আরো পঞ্চাশ-ষাট হাজার ডলার বা ছ,-সাত লাখ টাকা সঙ্গে থাকতে পারত।

তৃতীয় দিনেই কলকাতার টিকিট কাটল। কোথায় যাবে জানে না। কি করবে জানে না....বন্ধু জয়া মিত্তিরকে বা কোনো চেনা লোককে মুখ দেখানোর ইচ্ছেও নেই। অন্য কোনো ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে উঠবে। তারপর গানের টিউশনি পেতে চেষ্টা করবে? বা গানের চাকরি? সাত বছর এদেশের গান গায়নি। তবু দিল্লীর হোটেলের একলা ঘরে গানের মহড়া দিয়েছে। আশ্চর্য, গলায় এখনো দিশি সুর আছে, গানও আছে। অনেক ভুল পড়ে গেছে এই যা। কিছু দিনের অভ্যাসের ব্যাপার শুধু। কিন্তু গানের টিউশনি বা গানের চাকরিতে মন ওঠেনি।....কোনরকম সংকোচের বালাই-ই আর নেই। দিল্লীতেও আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখেছে। আমন্ত্রণের ঘমতি কোথাও নেই। আর ওর মতো এত রকমের অভিজ্ঞতাই বা ক'জনের। বড় করে আসর সাজিয়ে বসতে পারলে অনেক বড় বড় মানুষ মাথা বিকোতে আসবে।

ট্রেন বেনারস স্টেশনে থেমেছে। সকাল ন'টা। আধঘণ্টার স্টপ। মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। অলস চোখে স্টেশনের ছবি দেখছিল। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় যেন হাতুড়ির ঘা বসালো। ককলাতায় কেন? বেনারসে নয় কেন? লক্ষ্ণৌতে নয় কেন? এসব জায়গাই তো কত নামকরা বাইজির পীঠস্থান। হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে লাভ কি?

একটা বিষম তাড়া খেয়েই অবন্তী বেনারসে নেমে পড়ল।

পনেরো বছরের আগের বারাণসী ধামের সঙ্গে আজকের বারাণসীর

খুব তফাৎ নেই। পনেরো বছর আগে অবন্তী যে বারাণসীতে পা ফেলেছে, পঞ্চাশ বছর আগে হলেও সে কি দেখত বা কিরকম দেখত কোনো ধারণা নেই। বারাণসী ধাম সম্পর্কে একটা ধোঁয়াটে কল্পনাই সার। এটুকুর ওপর নির্ভর করেই হঠাৎ সে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল। তার বন্ধু জয়ার ঠাকুমা-ঠাকুরদা প্রায় প্রতি বছর কাশীতে পুণ্যি করতে আসত। সে সময় জয়াদের বাড়ি গেলে অবন্তীও প্রসাদ পেত। আবার পুণ্যধামের তলায় তলায় বেশ পাপের স্রোতও বয় এমন সহজাত ধারণাও তার মনের তলায় ছিলই। বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়ার বাই তো ছেলেবেলা থেকে। বি-এ এম-এ পড়ার সময় পর্যন্ত ছিল। কিশোরী বা যুবতী বিধবা মেয়ে কাশীবাসিনী হয়ে বিশ্বনাথের চরণাশ্রিত হবার জন্য এসে লোক-বাসনার মধ্যমণি হয়ে বসেছে—বাংলা সাহিত্যে এমন গল্প উপন্যাসেরও অভাব ছিল না। কলকাতার সংগীতরসিক বনেদী বড়লোকের বাড়িতে লক্ষ্ণৌ বারানসীর নামী-নামী বাঈজীদের চটকদার অনুষ্ঠানের গল্প নিজের ছেলেবেলাতেও শুনেছে। এরা যথার্থ শিল্পীর মর্যাদা পেত।

....কিন্তু মুহূর্তের ঝোঁকে নেমে তো পড়ল। এখন এই বারাণসীর খোঁজে সে কোনদিকে পা বাড়াবে, কার কাছে খবর নেবে?

আগের দিনের বারাণসী নেই, আবার আগের দিনের কিছুই মুছেও যায়নি। আগে ধরমশালার লোক যাত্রীর খোঁজে আসত, এখন নতুন নতুন হোটেলের দালালরা আসে। আগে যেমন শাঁসালো তীর্থযাত্রী ধরার জন্য পাণ্ডারা বা তাদের চেলারা আসত, এখনো তার ব্যতিক্রম নেই। আগে ট্রেন থামতে না থামতে আগন্তুকের মালপত্র কুলিদের দখলে চলে যেত, পরে মজুরি নিয়ে বচসা শুরু হয়ে যেত, এখন সে-উপদ্রব আরো বেড়েছে বই কমেনি।

কিন্তু ট্রেন থামার কুড়ি মিনিট পরে নামামাত্র অবন্তী এদের আর প্ল্যাটফরমের আরো অনেকের একটু স্বতন্ত্র রকমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। চাকা-লাগানো আর লাগামের মতো ফিতে আঁটা ঢাউস বিদেশী স্যুটকেস দুটো নিজেই অনায়াসে টেনে নামিয়েছে, তারপর গড়গড় করে সে-দুটো অনায়াসে টেনে একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়েছে।

হাত খালি কুলিরাও ছুটে আসেনি, দূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখেছে। অত বড় বিদেশী স্যুটকেসে চাকা লাগানো দেখেই খট্‌কা লেগেছে এ-রকম মহিলা কুলি নিতে অভ্যস্ত কিনা। কোনো পাণ্ডা বা তাদের চেলারাও কেউ ছুটে আসেনি। পরনে কাগজি-হরিৎ (লেমন ইয়েলো) সিন্থেটিক শাড়ি, পায়ে ফিতে ছাড়া শূয়ের মতো বিদেশী জুতো, চোখে মস্ত ফিকে গগলস্, নাকের পাথরে কাপো রূপে সাদার জেল্লা....এমন একজন আর যা-ই হোক, কাশীতে পুণ্যির তাগিদে আসেনি। আধুনিক হোটেলের দু-একজন অবাঙালি এজেন্ট অবশ্য ছুটে এলো। হালের ব্যবসায়ীর সেরা হোটেলের লোক বলে নিজেদের পরিচয় দিল। গরমের সময়, বারাণসী সিজন্ নয় বলেই কোনো হোটেলে জায়গার অভাব হবে না অবন্তী বুঝেছে। হালের সেরা হোটেল শুনেই একটি কথাও না বলে এগিয়ে চলল। বাইরে এসে একজন আধবয়সী বাঙালি রিকশঅলাকে বাছাই করল। চলতে চলতে তার কাছ থেকেই জেনে নিল শহরের মধ্যে বেশ পুরনো অথচ নাম করা হোটেল কোন্‌টা। লোকটা দুটো হোটেলের নাম করতে অবন্তী জানতে চাইলো কোন্ হোটেলের ম্যানেজার বাঙালি, তার মধ্যে একটি হোটেল বাপ আর ছেলে চালায়।

অবন্তী রিকশঅলাকে সেই হোটেলেই নিয়ে যেতে বলল।

দোতলায় ছোটর ওপর মোটামুটি ভালো ঘরই পেল একটা। অ্যাটাচুড্ বাথ। রুম চার্জ দিনে তিরিশ টাকা। খাওয়া খরচ আলাদা। অবন্তী মনে মনে হিসেব করেছে। আরো কোন্ না কুড়ি টাকা দিনে লাগবে। তাহলে দিনে পঞ্চাশ টাকা, মানে মাসে দেড় হাজার টাকা। বছরে আঠারো হাজার টাকা। খুচরো বাদ দিলে মোট পুঁজি একুশ হাজার টাকা। মরুকগে, অবন্তীর কোনো প্ল্যানই দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না।

রেজিস্ট্রি খাতায় নাম সই করল, অবন্তী মালহোত্রা।

এ নিয়ে তৃতীয়বার মালহোত্রায় ফিরে এলো সে।

প্রৌঢ় ম্যানেজার ঈষৎ বিস্ময়ে বললেন, কথা শুনে আপনাকে আমি বাঙালি ভেবেছিলাম।

অবন্তী হাসল। —আমি নিজেকে খাঁটি বাঙালি মনে করি।… ঠিকানার -ঘরে কি লিখব, আমার তো কোনো ঠিকানা নেই?

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—ফ্রান্স থেকে দিল্লি হয়ে এখানে…টুরিস্ট লিখে দেব?

—দিন। আপনি কতদিন থাকবেন এখানে?

—অনেকদিনও থেকে যেতে পারি, একটু উদ্দেশ্য নিয়েই বেনারসে আসা, ফল পাব বলে মনে হলে আপাতত আছি। হাসল একটু, আশা করি সম্ভব হলে আমাকে একটু সাহায্য করবেন, পরে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।

ফ্রান্সের আগন্তুক শুনেই ম্যানেজারের বিবেচনায় অবন্তী বিশেষ একজন হয়ে উঠল। আরো দশজনকে বলার মতো পাবলিসিটির ব্যাপার।

বিকেলের দিকে অবন্তী লোক মারফত নয়, নিজে এসে অনুরোধ করল, আপনি সময় পেলে দয়া করে আমার ঘরে একটু আসবেন… আমার সঙ্গেই চা খাবেন।

ম্যানেজারটি অতি ভদ্র, এ ধরনের আপ্যায়নেও অভ্যস্ত নন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনি অতিথি, আমিই চায়ের ব্যবস্থা করছি, আপনি যান, আমি এক্ষুনি আসছি।

ম্যানেজারের সঙ্গে চায়ের পেয়ালায় হৃদ্যতা। নিজের আগ্রহে ফ্রান্সের হোটেল-রেস্তরাঁর গল্প শুনলেন। এর পরের দু'চার কথা থেকে তাঁর মনে হল সম্ভ্রান্ত মহিলাটির এখানকার শিল্প সংস্কৃতির প্রতিই বেশি আগ্রহ। অবন্তী জানালো, এখানকার নামকরা ঘরানার গায়িকাদের সম্পর্কে সে কিছু জানতে চায়। তাঁদের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয়ের সুযোগ কিভাবে হতে পারে?

ভদ্রলোককে মাথা চুলকে ভাবতে হল। অকপটে স্বীকার করলেন, এ সব খবর তিনি ভালো রাখেন না…তাহলে শিবু দাসকে খবর দিতে হয়, সে রোজ সন্ধ্যায় এখানে খবরের কাগজ পড়তে আসে।

খবরের কাগজ পড়ার জন্য রোজ হোটেলে আসে শুনে বোঝা গেল অবস্থাপন্ন কেউ নয়। তবু সংযত আগ্রহে অবন্তী তার পরিচয় শুনল। শিবু দাস বলতে শিবলাল দাস। দেশ কটকে, ছেলেবেলা থেকে

এখানে আছে। বছর তেতাল্লিশ বয়েস, ভালো তবলা বাজায়, অনেক নাম করা গাইয়ে সঙ্গে ছিল কিন্তু নিজের স্বভাবের দোষে কারো সঙ্গে খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। এখন কাশী-বাসীদের মধ্যে সব থেকে নাম করা সংগীত সাধক দয়াল যোশীর আখড়ায় তবলা বাজায় — তেমন ভালো রোজগার নেই।

দয়াল যোশীর নামটা শুনেই অবন্তী উৎসুক একটু। কলকাতার মিউজিক কনফারেন্স-এ দু'বার দয়াল যোশীর গান শুনেছে। সাধকই বটেন। মানুষটি তখনই প্রায় বৃদ্ধ। কিন্তু সভা মাতানো গলা।

সেই সন্ধ্যায় নয়, পরদিন সকালের দিকে ম্যানেজারের ছেলে শিবলাল দাসকে অবন্তীর ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। ফ্রান্স ফেরৎ সংগীত-রসিকতার আমন্ত্রণ পেয়ে একটু সাজসজ্জা করেই এসেছে। ফর্সা পা-জামার ওপর রঙ-চটা পুরনো মটকার পাঞ্জাবি চড়িয়েছে। এই গরমেও গলায় জরিপাড় পাতলা চাদর ঝুলিয়েছে। ঢ্যাঙা রোগা মানুষ, চোয়ালের হাড় উঁচু বলে চোখ গর্তে মনে হয়। শরীর অনুযায়ী মাথা ছোট। শিল্প জগতের মানুষ ভাবা শক্ত।

শিবু দাসও যেন অপ্রত্যাশিত একজনকেই দেখল। পরিচ্ছন্ন আটপৌরে বেশ-বাসে এমন একটি শ্যামবর্ণা রূপসীকে দেখবে ভাবেনি। তার হাসিমুখের সহজ অভ্যর্থনাটুকুও ভালো না লাগার কারণ নেই। দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, আসুন শিবলালবাবু, কাল ম্যানেজারবাবুর মুখে আপনার তবলার প্রশংসা শুনে আমি পরিচয় করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম···বসুন।

খুশি হলেও শিবু দাসের অবাক মুখ একটু। দুটো বেতের চেয়ারের একটাতে বসল। আমতা আমতা করে বিস্ময়টুকু প্রকাশ করল। — ইয়ে ম্যানেজারবাবু তো তবলার কিছু বোঝে না···

—না বুঝলেও গান বাজনার কথা উঠতে আপনার প্রশংসা তো করলেন।

আপ্যায়নে শিবু দাস আরো খুশি। চা এলো, সঙ্গে কাটলেট সিঙাড়া কেক। নিজের ব্রেকফাস্ট আগেই সারা জানিয়ে অবন্তী এক কাপ চা শুধু নিল।

তারপর তার সংগীত জগতের প্রসঙ্গ বিস্তারের পাশ কাটিয়ে জ্ঞাতব্যটুকু আহরণ করতে সময় লাগল না। যেমন বারাণসী ঘরানার নামটুকুই আছে, নামী নামী শিল্পীরা এখানে ঘর বিশেষ করেন না। ওস্তাদ মহারাজ আর গুণী বাঈরা বেশিরভাগ বাইরেই থাকেন। অনেকের নাম করল। সব থেকে নামীদের মধ্যে একমাত্র দয়াল যোশী মহারাজ এখানে আছেন। তাঁর আখড়া বলতে ছোটখাটো গানের প্রতিষ্ঠানই, মহারাজের সাগরেদরা গুরুর নামে এটি করেছে। কিন্তু যোশী মহারাজের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই, খুব একরোখা মেজাজী আর খেয়ালী মানুষ যোশী মহারাজ, শুদ্ধ রাগ রাগিণীতে এত শস্তা ভেজাল ঢুকছে বলে ভয়ংকর রাগ। অভাবে পড়লেও আখড়ার একটি পয়সা ছোঁন না। পঁচাত্তর বছর বয়স এখন, বেনারস ছেড়ে কোনো কনফারেন্সই যান না, বিশেষ করে দু'বছর আগে স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে রোজগারের কোন চেষ্টাই নেই। এখনো কত বড় বড় লোকের ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে গান শিখতে আসে কিন্তু কেউ বেশি দিন টিকতে পারে না, মেজাজ বিগড়ালো তো ঘাড় ধাক্কা।

অবন্তী সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

—ইয়ে আমি তাঁর কাছে প্রায় কেউ না···তবে আপনি ফ্রান্স থেকে আসছেন বলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি···কিন্তু কি বলব বলুন তো?

অবন্তী ভাবল একটু। — বলবেন সতে বছর ফ্রান্সে থেকে আমি সেখানকার কিছু শিল্পী দেখেছি (সুসময়কালে এটা খুব মিথ্যে নয়) নিজের দেশের সংগীত গুরুদের আরো কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে।

এমন উদ্ভট খেয়ালও কারো থাকে, শিবুদাসের সেই বিস্ময়।

গায়িকাদের প্রসঙ্গ তুলতে সে জানালো, এক সময়ে বেশ নাম ছিল এমন একজন আছেন। উষা বাঈ। তবে তাঁকে ঠিক অন্যদের মতো সংগীতসাধিকা বলা যায় না। নাচ গান দুইয়েরই বায়না নিয়ে বনেদী বড়লোকদের জলসাটলসায় যেতেন। ও ধরনের অভিজাত মহলে তাঁর খুব কদর ছিল, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে, নিজে আর

নাচতে পারেন না—তবে গানের গলা এখনও তাজা। এখানকার পুরনো রইস সমজদারদের কেউ কেউ এখনো তাঁর গান শুনতে আসেন, আবার অন্য লোভেও, মানে··· যাক্‌গে –

অবন্তী সোজা তাকালো। — লজ্জা করবেন না আমার সকলের সম্পর্কেই জানার আগ্রহ।

—ক্যা-কেন বলুন তো, আপনি কি এ-জগতের মানুষদের নিয়ে কিছু লিখবেন টিখবেন নাকি?

—কি করব আমি নিজেই জানি না। তারপর নিরীহ গোছের প্রশ্ন, এখানকার পুরোনো রইস সমজদার মানে কি— তাঁরা কারা?

শিবু দাস এবারে অনেকটা নিঃসংকোচ। —রইস সমজদার মানে পয়সাওলা সমজদার—যেমন ধরুন, সূর্য পাণ্ডে, তিনি হলেন এখানকার নাম-ডাকের বেনারসী শাড়ি মার্চেণ্টদের একজন, ঊষা বাঈকে তিনি সব থেকে বেশি ব্যাক করতেন, এখনো করেন –

অবন্তীর কালো মুখে খুব সহজ হাসি। —দেখুন, আমি অনেককাল বিদেশে থাকা মেয়ে—ও-সব দেশে অনেক কাণ্ডমাণ্ড দেখেছি···ঊষা বাঈয়ের বয়েস হয়েছে তবু গান ছাড়া অন্য লোভ কি?

শিবু দাস হ্যা-হ্যা করে হাসল একটু। — আপনি এত সহজ করে বলেন যে আর লজ্জা থাকে না। —কথা হল, ঊষা বাঈও বাছাই করা মেয়ে নিয়ে তাদের তালিম দেন, নাচ গান সহবত শেখান, তারা সংঙ্গীতসাধিকা নয়, আসলে তারা অভিজাত শ্রেণীর বাঈজি হয়ে ওঠে। ঊষা বাই নিজেও বাঈজি ছিলেন। এই সব সুশ্রী মেয়েদের আকর্ষণ তো আছে, তাই বয়েস হলেও বাঈয়ের ওখানে রইস মক্কেলের আনাগোনা আছেই।—বেনারসী শাড়ির মার্চেণ্ট লোকটা ভয়ংকর কাঠখোট্টা হলেও শুনেছি গান বাজনার নাকি সত্যিই সমজদার।

—ঊষা বাঈকে একবার দেখা যায়?

—দেখা? প্রায় রোজই খুব ভোরে তিনি কিছু মেয়ে নিয়ে অহল্যাবাঈ ঘাটে স্নান করতে আসেন—

—তা না, দেখা মানে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার কথা বলছি।

—আপনি এমন একজন বিশিষ্ট মহিলা, তাঁর তো খুশি হয়ে

আলাপ করা উচিত—

—বেশ, আপনি দয়া করে আগে তাহলে যোশী মহারাজের সঙ্গেই যোগাযোগের ব্যবস্থা করুন।

ব্যবস্থা দু'দিনের মধ্যেই হল। শিবু দাস আনন্দে আটখানা হয়ে খবরটা দিল। সাত বছর ফ্রান্সে থাকা ভারতীয় মেয়ে দেখা করতে চায় শুনে মহারাজ নাকি অবাক প্রথম। আগামীকাল সকাল সাড়ে-সাতটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

—আপনাকে যখন ধরেছি সহজে ছাড় নেই, আপনি সকাল পাঁচটার মধ্যে আসুন, যেতে কতক্ষণ লাগবে?

—গণেশ মহল্লায় থাকেন, টাঙ্গায় মিনিট কুড়ি লাগবে, কিন্তু সে-সময় উনি তো রেয়াজ করেন। সাড়ে সাতটায় সময় দিয়েছেন।

—তবু আপনি ওই সময়েই আসুন।

অবন্তী এর মধ্যে পাতলা সাদা জমিনের দু'খানা চওড়াপেড়ে শাড়ি আর দুটো ফিকে রঙের ব্লাউস কিনেছে। এক জোড়া চপ্পলও। সাদা-সিধে বেশে হোটেলের গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো যখন বারাণসীর প্রথম ভোরের রাস্তা একেবারে নির্জন, ফাঁকা। মিনিট দুইয়ের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে শিবু দাস উপস্থিত। দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল, এত ভোরে টাঙ্গা চোখে পড়ল না। এখানকার আসল বাহন সাইকেল-রিকশ।

হাত তুলে অবন্তী একটা রিকশ থামিয়ে উঠে বসল। শিবু দাসকে ডাকল, আসুন, সকাল বেলা সদর রাস্তা ধরে যাচ্ছি, লজ্জার কি আছে।

রিকশয় চাপাচাপি একটু হবেই। অবন্তীর মনে হল লোকটা ঘামতে শুরু করেছে।

গেটের সামনে রিকশ থামল। দুদিকে ছোট্ট বাগানের মতো, সামনে খুব পুরনো দালান। ভিতরে এগোতেই গম-গমে সুর-সাধনার গলা কানে এলো। খুব নিঃশব্দে এসে তারা দাওয়ায় উঠল। সামনের ঘরে চাদর বিছানো চৌকি পাতা। চুপচাপ বসল। একটি লোক, চাকরই হবে, এত ভোরে লোক দেখে অবাক-মুখে এগিয়ে আসতে অবন্তীই মুখে একটা আঙুল তুলে কথা বলতে নিষেধ করল। শিবু দাস উঠে তার

কানে কানে বলল, রেয়াজ শেষ হবার আগে মহারাজকে খবর দিতে হবে না।

এ-ঘরেও শোনার তন্ময়তা নেমে এলো। অবন্তী একাগ্র মনোযোগে শুনছে।

কোথা দিয়ে সাতটা বেজে গেল টেরও পেল না। তার তন্ময়তা শিবু দাসেরও বিস্ময়ের কারণ। ঠিক সাতটাতেই বাড়িটা যেন নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

মিনিট পনেরো বাদে সেই লোকটি এসে তাদের ভিতরে যেতে ইশারা করল।

পুরু পুরনো গালচের ওপর মস্ত তানপুরা শোয়ানো। পাশে দয়াল যোশী সোজা হয়ে বসে। সাদা রেশমের মতো চুল দাড়ি গোঁপ। পিছনে অবন্তী, সামনে শিবু দাস।

—কেয়া, তেরা দিমাগ গড়বড় হো গয়া, সুবে পাঁচ বাজে আয়ে হো?

দু'হাত জোড় করে কাঁপা গলায় শিবু দাস বাংলাতেই কৈফিয়ৎ দিল, আপনার রেয়াজ শোনার জন্য ইনিই চলে এলেন মহারাজ

মহারাজও এই জবাব আশা করেননি। ভুরুর চুলও সাদা। ঈষৎ ঝুঁকে তাকালেন। ফ্রান্স ফেরত এমন বেশের আর এমন রূপের জেনানাকে আশা করেননি, যে আবার রেয়াজ শোনার জন্য দু' ঘণ্টা আগে এসে বসে থাকতে পারে। তেমনি চেয়ে থেকে দু'বার মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ ভিতরে আসতে ইশারা করলেন।

পায়ের স্যাণ্ডাল বাইরের ঘরেই খুলে এসেছিল। পায়ে পায়ে ভিতরে এলো। অবন্তী প্রণামের জন্য একেবারে কাছে এগিয়ে আসার দরুণ ঈষৎ ব্যস্ত হবার ফলে নিজের অগোচরে তাঁর সাদাটে পা দু'খানা সামনে। হাঁটু মুড়ে বসে অবন্তী সেই পায়ের ওপর মাথা রাখতে মহারাজ আরো বিব্রত, কিন্তু মাথা তুলতে অবাক একেবারে।

তাঁর পায়ের ওপর ভাঁজ-করা কয়েকখানা একশ টাকার নোট। গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, এ কিস লিয়ে—কেয়া মতলব?

একটু আগে শিবু দাসকে বাংলা বলতে শুনে অবন্তী খুব নরম

গলায় বাংলাতেই জবাব দিল। কিন্তু প্রথমেই যে সম্বোধন করল সাধক-গায়ক অবাক। হাত জোড় করে বলল, বাপুজী, আমার অপরাধ নেবেন না, আসার আগে আমার হঠাৎ কেমন মনে হল, আপনি এ প্রণামীটুকু গ্রহণ করলে আমার জীবন সার্থক হবে—কলকাতার কন্‌ফারেন্সএ দু'বার আপনার গান শোনার ভাগ্য হয়েছে, আপনি এখানে আছেন শুনেই আমি দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, তক্ষুনি মনে হয়েছে দেখা পেলে আপনাকে আমি বাপুজী বলে ডাকব—বাপুজী কি মেয়ের প্রণামী ঠেলে ফেলে দেবেন?

দয়াল যোশী মহারাজ ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। ভাঁজ করা নোট ক'টার দিকে তাকালেন একবার। ভারী গলায় প্রশ্ন, এখানে কোতো টাকা আছে?

কথার সুরে অবাঙালীর টান, কিন্তু ভাঙা বা অস্পষ্ট নয়।

দ্বিধাজড়িত গলায় অবন্তী জবাব দিল, খুব সামান্য বাপুজী—

—কোতো? ভারী গলা ঈষৎ অসহিষ্ণু।

—পাঁচশ এক—

অবন্তীর মুখের ওপর থেকে বৃদ্ধের আয়ত দুই চোখ আস্তে ঘুরে দেয়ালের একদিকে স্থির হল। অন্য দু'জনও দেখল সেখানে আদি সংগীত গুরু মহাদেবের সংগীত-রত দুর্লভ ছবি একখানা। যোশী মহারাজ সেদিকে অপলক চেয়ে আছেন। কি এক আশ্চর্য গম্ভীর আবেগে স্তব্ধ যেন।

প্রায় মিনিটখানেক বাদে আত্মস্থ হয়ে অবন্তীর দিকে ফিরলেন। —দাস তো বোলছিল তুমি সাত বরষ ফ্রান্সে ছিলে, সেখানে শিল্পীদের স্টাডি করেছ, ভারতের শিল্পীদেরও স্টাডি করে কিছু লিখবে?

—উনি ভুল বুঝেছেন, সাত বছর বাদে আমি ফ্রান্স থেকেই ফিরছি বটে, কিন্তু আমি কলকাতার মেয়ে, কলকাতা থেকেই মিউজিক নিয়ে এম-এ পাশ করেছিলাম—গান ভালবাসি, এখানে আপনাকে দেখার জন্যই এসেছি।

আবার গম্ভীর একটু। —কিন্তু আমি তো কাউকে তালিম দিই না।

অবন্তী হাসল। —এটুকু শুধুই মেয়ের প্রণামী বাপুজী···বেনারসে

আমি সাত দিন থাকব কি সাত মাস নিজেই জানি না, সে ক'দিন আপনার কাছে একটু আধটু আসার অনুমতি দেবেন···যখন চলে যাব ভাবব, এখানে এসে মনে রাখার মতো একজন বাপু পেয়ে গেলাম।

মুখ শুধু নয়, বৃদ্ধের ভারী গলাও কোমল।—কি নাম তোমার মায়ি?

—অবন্তী মালহোত্রা।

দেয়ালের সেই সেই ফোটোর দিকে তাকালেন আবার। তারপর পাশেই ঝুঁকে বইয়ের ফাঁক থেকে একটা খাম বার করলেন। — তুমি হিন্দী পড়তে পারো মায়ী?

অবন্তী একটু বিব্রত মুখে মাথা নাড়ল। পারে না।

—এই চিঠি আমার স্ত্রীর খুব পেয়ারের পবিচারিকার। এক বয়সী, ত্রিশ বরষ স্ত্রীর সেবা করেছিল। স্ত্রীর ইনতেকাল হোতে সে-ও অসুস্থ হয়ে দেশে চলে গেছল। ··· দেশ থেকে কাল তার এই চিঠি এসেছে। লিখেছে বুকের কি অসুখ হয়েছে, চিকিৎসার জন্য পানশ টাকা খুব দোরকার। আমার হাত এখোন খালি, খুব জরুরী না হোলে টাকার জন্য লিখত না....ভাবছিলাম আখড়ার পাঠ্‌ঠেগুলোর কাছে হাত পাততে হবে — আর আজ সোকালে বিশ্বনাথজিউর খেল্‌ দেখলাম ....।

ভাঁজ করা টাকা ক'টা নিয়ে কপালে ঠেকালেন। — মেয়েব প্রণামী বাপুজী নিল মায়ি।

অবন্তীর গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠল।

—তোমার বিয়ে হয়েছে মায়ি?

ক্ষুদ্র জবাব দিল, হয়েছিল।

থমকালেন।.... ফ্রান্সে স্বামীর সঙ্গে ছিলে?

অবন্তী সামান্য মাথা নেড়ে জবাব দিল, বছর পাঁচেক।

—তারপর?

—টেকে নি।

মুখখানা বিরস দেখালো। অল্প অল্প মাথা নাড়লেন। — শিউজি কেন যে এমন ভুল করান ..। যাক, সময় তো যায় নি, স্বজাতে নিজের

পসন্দ্ মতো আবার বিয়ে করো—তোমার ভালো হবে।

ভুল বুঝেছেন জেনেও অবন্তী আর কিছু বলল না।

তিনি যখন খুশি আসতে বলে দিয়েছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে অবন্তী একলা চার দিনই খুব ভোরে গেছে। কান পেতে রেয়াজ শুনেছে। তার মধ্যে দু'দিন মহারাজের সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছে। এ-জন্যে পরে অনুযোগ শুনতে হয়েছে।

এদিকে নিজের সাধনার তৃষ্ণা বেড়েছে। দয়াল যোশীর চেলাদের আখড়া তাঁর বাড়ি থেকে দূরে। বেলায় ফাঁকা থাকে। শিবু দাসকে ধরে সে সময় দু' আড়াই ঘণ্টা করে রেয়াজের ব্যবস্থা করেছে। শিবু দাস ভারী খুশি। সে সঙ্গে থাকে। দরকার মতো তবলা সঙ্গত করে। অবন্তী বলেছে, যা পারে তাকে দেবে।

তিন সপ্তাহের মধ্যে যোশী মহারাজের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। এত নিষ্ঠা দেখে তিনি অনেক দিন তানপুরা এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, একটু কিছু সুর টানো, গলা দেখি তোমার—

দু' সপ্তাহ অবন্তী সাহস করে নি। তৃতীয় সপ্তাহে তানপুরা নিল। কয়েকটা সুরের রাগের কিছু কিছু শোনালো। খুব মন দিয়ে শুনে মহারাজ মন্তব্য করলেন, বহুত মিঠ্‌টি দর্দভরি আওয়াজ, গলার জোয়ারিও আচ্ছা—কিন্তু তালিম দরকার।...কতদিন আছ তুমি, তাহলে যতটুকু পারি করে দিতাম।

অবন্তী হেসে জবাব দিয়েছে, জানি না। তবে আপনার জন্যেই বেনারস ভালো লাগছে।...কিন্তু একটা কথা, ছেলে না থাকলে মেয়েই ছেলে, কিছুকাল থেকেই যদি যাই, আপনার সব প্রয়োজনে আমাকে ছেলের মতো পাশে থাকতে দিতে হবে—কেবল গান শেখার সময় আমি বাপুজীর মেয়ে।

বাপুজী দয়াল যোশীর মুখে হা-হা হাসি। ইঙ্গিত বুঝেছেন।

এই সময়ের মধ্যেই অবন্তী আর একটি কাজ করে বসে আছে যা শিবু দাসও জানে না। দয়াল যোশী মহারাজের সঙ্গে এমন বিচিত্র যোগাযোগের দু'দিনের মধ্যেই শিবু দাস অবন্তীকে জিগ্যেস করেছিল এবারে ঊষা বাঈয়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করবে কিনা। অবন্তী শুধু

বলেছিল, যাক কিছু দিন।

শিবু দাস তখন ভেবেছিল অতবড় সাধকের মন জয় করার পর উষা বাঈয়ের এই মহিলার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অবন্তী খুব ভোরে উঠে সাইকেল রিকশা নিয়ে অহল্যাবাঈ ঘাটে গেছে। প্রথম দিন দেখা পায়নি। দ্বিতীয় দিন প্রায় রাত থাকতে এসেছে। মেয়েদের ঘাট থেকে স্নান সেরে আব্রুর ওধার থেকে ভিজে কাপড় বদলে একজন বয়স্কার সঙ্গে চার পাঁচটি মেয়ে উঠে আসছে। তাঁদের স্নানের সময় অবন্তী ঘাটেরই এক নিম্নশ্রেণী প্রৌঢ়াকে জিগ্যেস করেছিল, উনি উষাবাই কিনা। বিধবা প্রৌঢ়া চাপা বিরক্তিতে বলে উঠেছিল, আর কে—অযাত্রা!

অবন্তী সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়েছিল। উঠে আসতে আসতে দলটি অবন্তীকে দেখল। অবন্তী উষা বাঈয়ের দিকেই চেয়ে আছে। বছর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে বয়েস, তনুশ্রী একটু মোটার দিক ঘেঁষেছে। বয়েসকালে বেশ সুশ্রী ছিলেন বোঝা যায়। মিলের মধ্যে তার নাকেও বড়সড় একটা দামী পাথর—কিন্তু সেটা টকটকে লাল। বোধহয় চুনী। উনিও তার দিকেই চেয়ে উঠে আসছিলেন। তাঁর এ-পাশের ও-পাশের মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করতে করতে আসছে।

কিন্তু শেষ ধাপে উঠে সকলেই একটু হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। উষা বাঈও। কালো রূপসী মেয়ে পায়ে পায়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। এলো। হাত দুটি যুক্ত করে শ্রদ্ধা সহকারে মাথা অনেকটা নুইয়ে প্রণাম জানালো।

মুখ তুলতে বিস্ময় কাটিয়ে উষা বাঈ জিগ্যেস করলেন, আপ কওন বহিনজী—?

এ ক'দিনে অবন্তী মোটামুটি লক্ষ্য করেছে, মুখে অবাঙালীর সকলে বাংলা ভালো বলতে না পারলেও মোটামুটি বোঝে সকলেই।

একটু হেসে সবিনয়ে জবাব দিল, বোন বললেন যখন একটি বোনই ধরে নিন। আবার নমস্কার জানিয়ে রাস্তায় গিয়ে রিকশায় উঠল

যেন দেবী দর্শনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, দর্শন সেরে ফিরে চলল।

ঊষা বাঈ সহ সকলেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে রইলো।

সাইকেল রিকশ হোটেলে ফিরে চলল।

এই নাটকীয় ব্যাপারটি সে করেছিল দয়াল যোশী মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগের এক সপ্তাহের মধ্যে। এরও প্রায় মাসখানেক বাদে শিবু দাসকে বলল, এবারে আপনি ঊষা বাঈয়ের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিন :

মেজাজী আর খেয়ালী যোশী মহারাজকে এ-ভাবে বশ করতে পারার ফলে শিবু দাস এখন তাকে একজন মহীয়সী মহিলা ভাবে

—কবে?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ঊষা বাই বাপুজী মহারাজকে চেনেন নিশ্চয়?

—তাঁকে আর সঙ্গীত জগতে না চেনে কে?

—আর বাপুজী মহারাজ ঊষা বাঈকে চেনেন?

—ছোঃ। ওঁর মতো মানুষ এদের নামও শুনেছেন কিনা সন্দেহ।

—ঠিক আছে, আমার প্রসঙ্গে বলার সময় ঊষা বাঈকে এ-ও জানিয়ে দেবেন, ফ্রান্স থেকে এসে আমি দয়াল যোশী মহারাজের কাছে তালিম নিচ্ছি, আর কথায় কথায় আরো জানাতে পারেন, শুধু ফ্রান্স নয়, ইংল্যাণ্ড সুইজারল্যাণ্ড হল্যাণ্ড ডেনমার্ক ওয়েস্ট জার্মানির শিল্পীদের সঙ্গেও আমি যোগাযোগ করেছি।

সেই বিকেলেই শিবু দাস অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে হোটেলে ফিরল। অবন্তী প্রসংসা করল, আপনি খুব কাজের মানুষ—

—আমার কোনো কেরামতি নেই। আপনার পরিচয় শুনেই মহিলা হাঁ।

বিকেলে শিবু দাসই গাইড। অবন্তীর হাতে একটা বাদামী রঙের সুন্দর বিদেশী ভি আই পি ব্যাগ। কি ভেবে পার্সে আরো একশ এক টাকা পুরে নিল।

টাঙ্গায় প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগল। অহল্যাবাঈ ঘাট ছাড়িয়ে বেশ একটু দূরেই বাড়ি। এ-দিকে জনবসতি অপেক্ষাকৃত

কম। বেশ বড়সড় একটা পুরানো দোতলা বাড়ির সামনে টাঙ্গা দাঁড়ালো। গলা চেপে শিবু দাস জানান দিল, লোকে বলে এই বাড়িও বেনারসী সিল্ক মারচেণ্ট সুর্য পাণ্ডের দান।

অবন্তী ভিতরে ঢুকতেই এক তলার কিছু তরুণী আর কিশোরী মেয়ের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। এমন একজন আসছে কেউ ভাবেনি। এদের কেউ কেউ যে এই কালো রূপসীকে পঁচিশ ছাব্বিশ দিন আগে ভোরের স্নানের সময় অহল্যাবাঈ ঘাটে দেখেছে! তার আচরণও বিচিত্র মনে হয়েছিল—।

তাদের তু'জন ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যথাস্থানে খবর দিতে গেল।

অবন্তীকে দোতলা থেকে দেখে ঊষা বাঈয়ের মুখেরও একই অবস্থা বাঈজির ঘরে আপ্যায়নের ত্রুটি হলে কলঙ্ক। সিঁড়ির মেয়েদের পাশ কাটিয়ে নিজেই দ্রুত নেমে এলেন। একসঙ্গে অবন্তীর তুই হাত ধরে বলে উঠলেন, তুমি বহিনজি?

অবন্তী চোখে চোখে তাকিয়ে হাসল, ছোট বোনকে আমরা বহিনজী বলি না দিদি, শুধু বহিন। ঘুরে তাকালো। —আচ্ছা দাসবাবু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমি একলা হোটেলে চলে যেতে পারব।

শিবুদাস ব্যস্তসমস্ত নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। ঊষা বাঈ হাত ধরে অবন্তীকে সাদরে দোতলায় এনে সামনের বড় হল ঘরে বসালেন। ঘরের কোণে কোণে নানারকম বাজনার সরঞ্জাম। ঝক্‌ঝকে মেঝের একদিকে বিশাল গদির ওপর ধপ্‌ধপে ফরাস পাতা। তার ওপর অনেকগুলো মখমলের তাকিয়া। মাথার ওপর বেশ কয়েকটা ছোট বড় ঝাড় বাতি। কোণে কোণে কিছু গদি আঁটা চেয়ারও আছে। তুটি মেয়ে তুটো চেয়ার নিয়ে এলো। অন্যরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে।

ঊষা বাঈ হাত ধরে বসাতে যেতে অবন্তী বলল, দাঁড়ান আগে ছোট বোনের কর্তব্য সারি —

হাতের পার্সটা খুলে আলাদা ভাঁজ করা একশ এক টাকা নিয়ে তুহাত জুড়ে মাথা নীচু করে প্রণাম জানালো, তারপর ঊষা বাঈয়ের একটা হাত টেনে নিয়ে টাকাটা গুঁজে দিল।

ঊষা বাঈ অবাক। —এ কেন?

—গুরুজনের কাছে এলে প্রণামী দিতে হয়, তাছাড়া আপনার সময়ও নষ্ট করছি ...

—না না, ব্যস্ত হয়ে টাকা ফেরত দিতে চেষ্টা করলেন, তুমি এসেছ আমার গরিবখানা ধন্য হয়েছে —

অবন্তী বলল, টাকা ফেরত দিতে চাইলে বুঝব আপনার বোন পছন্দ হয়নি—

খুশি মুখেই টাকাটা আঁচলে বাঁধলেন। চেয়ারে বসে অবন্তী মেয়েদের দিকে তাকালো। দু হাত তুলে একসঙ্গে সকলকে কাছে ডাকল।—তোমরা দিদিজির কাছে নাচ গান শেখো ?

তারা মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

অন্তরঙ্গ হাসি মুখে অবন্তী বলল, আমি কিন্তু তোমাদের নাচ গানও একটু একটু জানি আবার বিদেশী মজাদার নাচ গানও কিছু জানি — আচ্ছা তোমাদের কেমন লাগে ছাখো।

উঠে ভি আই পি ব্যাগটা খুলে একটা বাঁধানো খাতা বার করল। ব্যাগটা ফরাসের গদিতে ফেলে আর বসল না। মেয়েরা উন্মুখ। পনেরো মিনিট না যেতে এমন অন্তরঙ্গ হতে কাউকে দেখে না।

ফ্রান্সে থাকতে নিজের বুদ্ধিতেই অবন্তী দর্শককে বেশি আনন্দ দেবার একটা ফিকির বার করেছিল। ওদের চটকদার গানগুলোর পাশে বাংলা অনুবাদ করে রাখত। নাচতে আর গাইতে নেমে অনেক সময়েই আগে বাংলা বয়ানে ওদের সুরে গানটা শেষ করত, তাদের ভালো লাগত কিন্তু না বুঝে হাঁ করে থাকত। সেই গানই ফের আবার যখন ফরাসী বয়ানে গাইতো, দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হত।

তেমনি একটা গান বার করে এখানে অবন্তী প্রথমে ফরাসী ভাষায় অল্প অল্প নাচের ঢঙে গাইতে শুরু করে দিল। গান এগোতে সাদা-মাটা শাড়ি-পরা মেয়ের নাচের ঢং আরো একটু একটু স্বতঃস্ফূর্ত হতে লাগল। দেহ-সম্পদের কিছুটা তাইতেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। স্থির যৌবনে বেশ একটু দোলানো ঢেউ উঠে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। গান শেষ হতে মেয়েরা না বুঝেও মুগ্ধ। শেষ হতেই একই সুরে বাংলা তর্জমা গান শুরু করতে মেয়েরাও নিজেদের আগোচরে

একটু একটু দুলতে লাগল —আর তাতেই আনন্দ পেয়ে অবন্তীর তালে তালে হাত-তালি আর নাচের উচ্ছ্বলতা আরো একটু বেড়ে গেল। গাইছে আবার হাসছেও খুব, ছোট মেয়েদের মজার খোরাক জোগাচ্ছে যেন। উষা বাঈয়ের অভিজ্ঞ দু'চোখ অনেক কিছু যাচাই করে নিচ্ছে। এই কালো রূপসীর যতটুকু প্রকাশ তার থেকে ঢের বেশি সম্পদ গোপন।

শেষ হতে অবন্তী ধুপ করে চেয়ারে বসে পড়ে কোমর থেকে রুমাল টেনে হাসি মুখ মুছতে লাগল। মেয়েরা এমনকি উষা বাঈও হাত তালি দিয়ে তারিফ করল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ফ্রান্সের অনেক লোকের সামনে এ-রকম নাচ গান করেছ?

তেমনি নিচু গলায় ঠোঁট টিপে হেসে অবন্তী জবাব দিল, এ তো ভদ্র, এর থেকে ঢের কুৎসিত নাচ গান করতে হয়েছে। বলছি, আগে এদের যেতে বলুন।

চোখের ইশারায় তারা চলে যেতে অবন্তী আবার উঠে বিদেশী ভি আই পি ব্যাগটা তুলে নিয়ে এলো। —কি কুৎসিত টেস্ট ও-দেশগুলোর, আপনার ঘেন্না করে যাবে। অ্যালবাম বার করে খুলে সামনে ধরল।

অ্যালবামে শুধুই অবন্তীর নাচ আর গানের ছবি। নগ্ন নয় বটে, কিন্তু রক্ত গরম হয়ে ওঠার মতোই নানা ছাঁদের বেশ-বাস। হাতে হাত-মাইক। সামনে দর্শকদের উল্লাস।

একাগ্র চোখে উষা বাঈ সব ক'টা রঙিন ছবি দেখে নিলেন। চোখে মুখে বিস্ময় ধরে না।

—ও-সব দেশে তুমি এই নাচ গান করতে কেন?

অবন্তী হাসতে লাগল। জবাব দিল না। অ্যালবাম ব্যাগে পুরে ওটা গদির ওপর ছুঁড়ে ফেলল। — আগে বলুন দিদিজি ছোট বোনকে পছন্দ হল কি না?

হঠাৎ মুখে ম্লান ছায়া পড়তে দেখল অবন্তী। চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে উষা বাঈ বললেন, আমার একটি ছোট বোন ছিল, দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তোমার থেকে বড় অবশ্য, আমার থেকে দশ এগারো

বছরের ছোট ছিল, বেঁচে থাকলে এখন চৌতিরিশ পঁয়তিরিশ হত, আটাশ বছর বয়সে বারাণসীর গঙ্গায় ডুবে মরে গেল। সেও আমাকে দিদিজি বলে ডাকত।

এ-রকম শুনে অবন্তীর সত্যি একটু দুঃখ হল। বলল, কি আফসোসের কথা ···।

—যাক তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে, তুমি কত দেশ ঘুরেছ, কত গুণ, কিন্তু এখানে এসে আমাকে দেখার কি আছে?

অবন্তী চেয়ে রইলো। ঠোঁটে হাসির আভাস। —আপনার কথা শুনেই এসেছি, আপনার গুণ আর সম্মান আমার কাছে কম নয় ···বোনকে পছন্দ হলে আপনার আশ্রয়ে থেকে আপনার শিক্ষা আশা করতে পারি না? অবশ্য তার বদলে আমার যতটুকু সাধ্য আমিও করব।

এ-রকম প্রস্তাব অকল্পিত। ঊষা বাঈ হাঁ হয়ে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর বললেন, কিন্তু তুমি তো শুনেছি যোশী মহারাজের কাছে তালিম নিচ্ছ?

—ঠিকই শুনেছেন। সেটা আমার সাধনার দিক, আর এ-দিকটা আমার কিছুটা সখের আর অনেকটাই পেশার দিক হতে পারে।

ঊষা বাঈয়ের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম, আমাদের এ পেশায় আসতে তোমার দ্বিধা নেই?

অবন্তী অবাক যেন একটু, দ্বিধা কিসের, নাচ গান বাজনা তো আমার প্রাণ, আগের দিনের নামী বাঈদের তো কম আভিজাত্য ছিল না, তাঁদের আসরে কত সমজদার আসত, আবার তাঁরাও কত বড় বড় জায়গা থেকে সাদর আমন্ত্রণ পেতেন। এ-ধরনের আসরে শুদ্ধ খেয়ালের সমজদার আজকাল হয়তো কিছু কমে গেছে, কিন্তু আমি আপনার মেয়েদের ঠুংরি ভজন-টজন শেখাতে পারি আর আপনি চাইলে নিজেও গাইতে পারি—

ঊষা বাঈয়ের বোয়াল মাছের মতোই টোপ গিলতে ইচ্ছে করছে। দেশ-বিদেশে ঘোরা এমন এক বিদুষী মেয়েকে নিজের হেপাজতে পেলে তাঁর এই মাঝ-বয়সের কালটা আরো নির্বিঘ্নে ভবিষ্যতের দিকে গড়াতে

পারে।....গঙ্গার ঘাটে এই মেয়ের সহজ অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণে তিনি অবাক হয়েছিলেন। আর এই একদিনেই মেয়েটাকে তাঁর বেশ ভালো লাগছে। তবু তিনি চতুর যেমন সাবধানীও তেমনি। যদিও যোশী মহারাজের কাছে তালিম নিচ্ছে এটুকুই এ-মেয়ের সততা আর নিষ্ঠার সব থেকে বড় সার্টিফিকেট।

জিগ্যেস করলেন, আমার মেয়েদের তুমি ওই বিদেশী নাচ গান শেখাতে রাজি আছ?

হেসে জবাব দিল, আমি ও-দেশে নাচ গানের নরক দেখেছি, অতদূর পর্যন্ত আপনি ওদের টেনে নিয়ে যাবেন কেন....এদেশে যেটুকু রয়-সয় সে-পর্যন্ত শেখাতে পারি।

ঊষা বাঈ ওদের নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না। ভবিষ্যৎ তো তাঁর হাতে। জিগ্যেস করলেন, আর তোমার আসরেও একটু বৈচিত্র্যের জন্য বিদেশী নাচ গান করতে তোমার আপত্তি নেই?

অবন্তী হেসে ফেলল, আমার বেলাতেও তাই, আপনি হুকুম করলে বিশিষ্ট সভায় কুৎসিত দিকটা বাদ দিয়ে যতটুকু সম্ভব করব না কেন? আরো হেসে উঠল, সুন্দর দাঁত আর নাকের পাথর ঝলসে উঠল। বলল, তবে আমি নতুন এখানে, কারো অসংযত লোভের উৎপাত থেকে আমাকে রক্ষা করার ষোল আনা দায়িত্ব আপনার।

ঊষা বাঈ থমকালেন। তারপরেই হাসলেন। —এ দু'বোনের ঘরোয়া আলোচনা ভাবো, ধরো....সেরকম কেউ যদি লোভের টোপ ফেলে এগিয়ে আসতে চায়....তোমাকে মনে ধরে?

—আপনি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবেন, দরকার হলে আমার সাহায্য নেবেন। বলতে বলতে খিলখিল হাসি। —আর যদি আমারও তাকে মনে ধরে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

ঊষা বাঈ বলে উঠলেন, সে রকম হলে আমার তো দু'দিকই গেল, তোমাকেও খোয়ালাম আর —

—শুনুন, কালো মুখের হাসিটুকু উবে গেল, চোখে চোখ, স্থির গম্ভীর। —নিজের সখে আর ইচ্ছেয় আপনার কাছে এসেছি, ভালো না লাগলে আপনি আমাকে একদিনও ধরে রাখতে পারবেন না। কিন্তু

আপনি আমাকে বোন বলেছেন, আপনাকে আমি দিদিজি বলেছি, বু যদি আপনার মনে হয় কোনদিন আমি আপনার সঙ্গে বেইমানি রতে পারি, তাহলে আমাদের এই একদিনের সম্পর্কটুকুই থাকুক, আপনি আমাকে ছেঁটে দিন—

ঊষা বাঈ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ঠিক আছে ঠিক আছে বোন, আর আমি এমন কথা মুখেও আনব না। সত্যি তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে—তোমার আসবে যে টাকা আসবে তার অর্ধেক তোমার, অর্ধেক আমার—রাজি?

—খুব। হাসল, আপনি তো ইচ্ছে করলে আমাকে অন্য দিক থেকেও একটু সাহায্য করতে পারেন—আপনার এখানে অনেক বড় বড় বিজনেসম্যানও আসেন নিশ্চয়. একটা ভালো চাকরিও তো আমাকে জুটিয়ে দিতে পারেন।

ঊষা বাঈয়ের মাথায় ঢুকল না। —কি চাকরি?

—আর কিছু না হোক প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ ভালোই পারব।

—ও···তুমি তো এম-এ পাশ শুনেছি। এসব ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই, সব বড় বিজনেস-ম্যানদেরই প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকে?

—বিদেশে তো থাকেই, এ-দেশেও থাকে।

—তাদের কি করতে হয়?

অবন্তী হাসল, ভালো প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে হলে এমপ্লয়ারের মন বুঝে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হয়।

ঊষা বাঈয়ের চকিতে কিছু মাথায় এলো বোধহয়। ঈষৎ উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করলেন, প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি দিয়ে নিয়ে গিয়ে কেউ যদি তোমাকে আটকে ফেলে, ইয়ে, বুঝতেই পারছ আমি কী বলছি?

এবারে একটু শব্দ করেই হেসে ফেলল অবন্তী। —খুব বুঝতে পারছি, কিন্তু এ তো আর মগের মুলুক নয় যে আমি না চাইলেও জোর করে আটকাবে। তবে অনেক মেয়ে প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে

ঢুকে নিজের স্বার্থেই মালিকের হৃদয়েশ্বরী হয়ে বসে··· সে-রকম হলেও আপনার লাভ বই লোকসানের কি আছে?

৭

হোটেল ছেড়ে অবন্তী পরদিন সকাল দশটার মধ্যেই ঊষা বাঈয়ের কাছে চলে এসেছে। হোটেলের ম্যানেজার বুঝেছেন অন্য বোর্ডারের মতোই মিয়াদ ফুরোতে হোটেল ছেড়ে চলল। গত সন্ধ্যায়ও শিবদাসের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে-ও জানে না পরদিন এসে আর তাকে এখানে দেখবে না।

দোতলায় একটা পছন্দ মতোই নিরিবিলি ঘর তাকে ছেড়ে দিয়েছেন ঊষা বাঈ। ঘরের সরঞ্জামের মধ্যে একটা ছোট খাট একটা ছোট লেখার টেবিল আর একটা মাত্র চেয়ার। নিজের নিরিবিলি সাধনার জন্য অবন্তী পছন্দসই একটা তানপুরা কেবল বেছে নিয়েছে।

ঊষা বাঈয়ের কাছে একদিকে ছোট বোন, অন্যদিকে পরম সমাদরের অতিথির মতোই অভ্যর্থনা তার। দিন তিনেকের মধ্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, গণ্যমান্য অতিথিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অবন্তীরই একটা বিশেষ আসরের ব্যবস্থা কবে করা হবে।···অতি সাধারণ গান বজানার পর সেই আসরে বিদেশী নাচ গান একটু তো করতেই হবে। অবন্তী জানিয়েছে তার জন্য প্রস্তুতি দরকার একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। আলাদা রকমের ড্রেস দরকার, কারণ ও-দেশের ওই সব কুৎসিত ড্রেস সে ফেলে এসেছে। সে-রকম না হলেও অন্যরকম ড্রেস কিছু বানাতে হবে। আর দুই একটা বাজনা দরকার।

ঊষা বাঈ সেইদিনই তার পরিচিত দরজিকে তলব করেছেন। দরজা বন্ধ করে অবন্তী কি-রকম ড্রেসের ব্যবস্থা করেছে তিনি জানেন না। কেবল অনুরোধ করেছিলেন, একেবারে নিরামিষ ড্রেস বানিও না তা বলে, ইয়ে, বুঝতেই তো পারছ —

অবন্তী হেসেছে।

তিন দিনের মধ্যেই সে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে। বলেছে, আমাকে তোমার সেই হারানো বোনই ভাবতে চেষ্টা করো দিদিজি, ভাবো গঙ্গা মা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

পনেরো দিন পরের এক সন্ধ্যায় অবন্তী মালহোত্রার আসর। এর মধ্যে খুব নিঃশব্দে বিরাট প্রচারের কাজ করে রেখেছেন উষা বাঈ। অন্য বাঈজিদের কাছে যে-সব পয়সাঅলা রসিকদের আনা-গোনা তাদের খবরও তিনি রাখেন। যোগাযোগের জন্য নিজের দু'টি পুরনো চৌকস দালাল আছে তাঁর। সেই সব ধনী রসিকরা জেনেছে অর্ধেক পৃথিবী মাত-করা এক শিল্পী এসে যোগ দিয়েছে উষা বাঈয়ের সঙ্গে। তারই প্রথম আসরে সকলের নিমন্ত্রণ।

অতবড় হল-এ অন্তত পঞ্চাশ জন অতিথি এসেছে। উষা বাঈ হাত ধরে অবন্তীকে আসরে নিয়ে এলেন। প্রথমে সকলের চোখ যেন একটু ধাক্কা খেল। গায়ের কালো রংটাই আগে চোখে পড়েছে। কাছে এসে সকলের উদ্দেশে আনত প্রণাম জানিয়ে অবন্তী সোজা হবার পর আবার ধোঁকা খেয়েছে। অত কালো সত্ত্বেও একটু বিচিত্র রকমের যেন। পরনে অফ্-হোয়াইট দামী শাড়ি, গায়ে ম্যাচ করা ব্লাউস। ডান হাতে সোনার চেনের ঘড়ি ছাড়া হাতে আর কোনো গয়না নেই। সব গয়নার অভাব যেন নাকের জ্বলজ্বলে সাদা পাথরটা পুষিয়ে দিয়েছে। দু'কানে সাদা পাথরের ফুল। যৌবনসম্ভার পলকে চোখ পড়ে।

শেখানো মতো তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েই উষা বাঈ সরে গেছেন। পরেরটুকু দেখে আর শুনে তারও চোখ বড়বড়। অবন্তী একটা ছোট হাত-মাইকের ব্যবস্থা রাখতে বলেছিল কেন জানে না। ইলেকট্রি-শিয়ান আনিয়ে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

আনত অভিনন্দন জানিয়ে অবন্তী মাইকটা হাতে নিল। তারপর পরিষ্কার ইংরেজিতে গড়গড় করে বলে গেল, মোস্ট ওয়েলকাম অ্যাণ্ড গুড্ ইভনিং জেন্টলমেন! আমি অবন্তী মালহোত্রা। আমার ধারণা মাননীয় অতিথিদের অনেকে বাঙালী এবং অনেকে অবাঙালী। আমি নিজেও অবাঙালী কিন্তু চিন্তায় ধ্যানে জ্ঞানে শিক্ষায় আমি সম্পূর্ণ

বাঙালী। এখানে সকলের বোঝার মতো আমার হিন্দী ভাষার দৌড় কেবল গান পর্যন্ত, তাই ক্ষমা প্রার্থনা করে সকলের বোঝার জন্য আমি ইংরেজির আশ্রয় নিয়েছি।...কিন্তু যদি এমন হয়, মাননীয় অতিথিরা সবাই বাংলা বোঝেন তাহলে সানন্দে নিজের ভাষার মাধ্যমে নিজেকে আমি উপস্থিত করতে পারি—

যে চমকটুকু দিতে চেয়েছিল তা সার্থক। রসের আসরে এসে অভ্যাগতরা কালো রূপসীর মুখে (রূপসী স্বীকার করতে কারো দ্বিধা নেই) অনায়াস ইংরেজি সম্ভাষণ শুনে হকচকিয়ে গেছল। যারা এসেছে তাদের মধ্যে বাঙালী অবশ্যই আছে, হিন্দুস্থানী বা ইউ পি'র লোক তো আছেই। বেশির ভাগের পক্ষেই ইংরেজির থেকে বাংলা বুঝতেই সুবিধে সেটা অবন্তীও জানত। আসর থেকে মিলিত গলায় বাংলায় বলার অনুরোধ এলো—জানালো সকলেই এখানে বাংলা বোঝে।

—ধন্যবাদ। স্মিত মুখে অবন্তী মুখের কাছে আবার ছোট মাইক ধরল।—আমার শ্রদ্ধেয়া ঊষাদিদিজি গোড়াতেই আমাকে ঘাবড়ে দিয়ে রেখেছেন আজকের এই অনুষ্ঠান নাকি বিশেষ করে আমারই। এ রকম সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কিনা জানি না। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনাদের মতো মাননীয় সংগীত রসজ্ঞদের সদয় উপস্থিতির ফলে আমি উৎসাহিত এবং সম্মানিত।

ঊষা বাঈ এবার এগিয়ে এসে তার হাত ধরে অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এলেন। তাঁর ভাষায় অতিথিরা সাধারণ কেউ নয়, সকলের পরিচয়ই বিশেষণে উজ্জ্বল। রাজা আর নবাব খেতাবের লোক আছে, দু-তিনজন বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীও আছে, তবে ব্যবসায়ের মানুষই বেশি। এখানকার বড় ব্যবসা বলতে রেশমী বেনারসী শাড়ি, কিংখাবের কাজ, সোনারূপার তার ও বিদরির কাজ, অলঙ্কৃত পিতলের সামগ্রী, গালার কাজকরা কাঠের খেলনা—এ-সব বাণিজ্যের শিল্প-পতিরা সাধারণ অবস্থার মানুষ কেউই নয়। এরা যথার্থই সঙ্গীতরসিক কি রমণী সম্ভোগ-রসিক সেটা স্বতন্ত্র কথা। এদের মধ্যে একটা নাম এবং সেই নামের মুখের দিকে কেবল অবন্তীর চোখ

আটকালো। নামটা শিবু দাসের মুখে ইঙ্গিত-বহ রকমের শোনা।

ঊষা বাঈ একটু বাড়তি সম্ভ্রমের সুরে পরিচয় দিলেন, ইনি বেনারসী সিল্ক মার্চেণ্ট মিস্টার সূর্য পাণ্ডে....এ লাইনের ফেমাস বিজনেস ম্যাগনেট।

অবন্তীর আয়ত কালো চোখ ওই মুখের ওপর স্থির কয়েক নিমেষ।···স্বাস্থ্যবান পুরুষ, বছর আটচল্লিশ বয়স, পরনে জরিপাড় ধুতি আর সিল্কের হাফ-শার্ট, গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার ঘড়ি, দু'হাতের আঙুলে তিনটে আঙটি—কিন্তু তা সত্ত্বেও শৌখিন বা অমায়িক কেতাদুরস্ত আদৌ মনে হয় না। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। নাক মুখ চোখ কিছুই সুন্দর নয়। দেখলেই মনে হয় ভদ্রলোক রসকষ-শূন্য শক্ত ধাতুর মানুষ। অবন্তী বুকের কাছে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানাতে উনি সৌজন্যের খাতিরে মাথাটা খানিক নোয়ালেন।

—আর ইনি মিস্টার বাবেন্দর চৌবে, মিস্টার পাণ্ডের ছেলেবেলার বন্ধু এবং পারসোনাল সেক্রেটারি। বন্ধু পরিচয় দিলেও বয়সে তাঁর থেকে বছর তিনেকের ছোট হবে। এই লোকটা সূর্য পাণ্ডের তুলনায় সুপুরুষ হলেও প্রথম দর্শনে অবন্তীর ভালো লাগল না। রমণী-তন্ময় চোখে যাচাই করে নেবার জন্য ওকে যেন সামনে আনা হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই তার চাউনি অবন্তীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠা নামা করে নিল।

এরপর গানের আসর। এমন আসরকে আনন্দ দেবার জন্য উচ্চাঙ্গ সাধনার দরকার হয় না এ-রকম আশ্বাস ঊষা বাঈয়ের কাছ থেকে অবন্তী পেয়েছিল। ওর খেয়াল গান শুনেই বলেছিলেন, এত উঁচু দরের গানের সমজদার এ-ধরনের আসরে তুমি পাবে না কিন্তু।

এতএব অবন্তী নিশ্চিন্ত।

তানপুরা নিয়ে বসে প্রথমেই দ্রুততালের ভজন গাইলো একটা। যাতে ভক্তিরসের থেকে গলার কাজই বেশি প্রাধান্য পেল। শ্রোতারা বাহবা দিল। তরপর দুটো গজল গাইল, শ্রোতারা তাতেও বাহবা দিল বটে কিন্তু এ আসর কারো কাছেই বাঈজীর আসরের মতো লাগছে

না। তানপুরা গালে ঠেকিয়ে গাইছে, এক-একবার শুধু তবলচির জবাব-প্রতিজবাবে স্মিত মুখে কৌতুকের মহড়া দিচ্ছে। পরের ঠুংরি দুটো অবশ্য আরো একটু জমল। দেহের পরিমিত দোলানি ঝাঁকুনি, হাসিমুখে মাথা নেড়ে তাল ঠুকে তবলচিকে উৎসাহ দেওয়া, কপট রাগের ভাবভঙ্গীর মধ্যে যেটুকু যৌবন-সুষমা উকিঝুকি দিল তাতেই বহুজোড়া চোখ লুব্ধ হয়ে উঠল।

শেষ হতে এবার গুঞ্জন উঠল, বিদেশী নাচ-গান কই?

তানপুরা রেখে অবন্তী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ঠোঁটে হাসি। শ্যাম রূপশ্রী শান্ত, অপ্রগলভ। হাত জোড় করে বলল, আপনাদের দয়া করে পাঁচ সাত মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

পিছনের দরজা দিয়ে ধীর পায়ে ভিতরে চলে গেল। সকলেই লক্ষ্য করল তানপুরা তবলা হারমোনিয়াম সব সরিয়ে ফেলা হল।

কিন্তু মিনিট আট দশের মধ্যে যে ফিরে এলো তাকে দেখামাত্র আসরের প্রতিটি মানুষ হতবাক।

এসে দাঁড়ানো মাত্র চোখ ধাঁধিয়ে যাবার উপক্রম। পরনে নানা জেল্লার চুমকি বসানো স্লিট-স্কার্ট, স্বল্প বক্ষাচ্ছাদন। ঐশ্বর্যের অনেকটাই আভাস মেলে কিন্তু প্রত্যক্ষ নয়। স্লিট-স্কার্ট বলতে কোমরের একটু নিচু থেকে হাঁটুর খানিকটা নিচে পর্যন্ত দু'পাশে স্কার্টের দু'দিক কাটা। নড়লে চড়লে সেই দু'দিক থেকে চকচকে সোনা-রং পুরু সিল্কের প্যান্টিস। হাঁটুর একটু নিচ থেকে চকচকে স্কিন-কালার নাইলনের মোজা, গায়ের রংয়ের সঙ্গে এমনি মিশ খেয়ে আছে যে চেকনাই না থাকলে মোজা বোঝাই যেত না, পায়ে হাই হিল জুতো।

আসরের প্রতিটি মানুষ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসেছে।

মাইক মুখের সামনে ধরে অবন্তী বলল, এটা ফরাসী ভাষার একটা কৌতুক গান। প্রেমিক যুদ্ধে গেছে, প্রেমিকার উৎকণ্ঠা আর বিরহ-যন্ত্রণা। আপনারা মূল ভাষায় আগে গানটা শুনুন, প্রেমিকার যন্ত্রণার চিত্রটা পরে বাংলায় আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব।

মাইক হাতে নিয়েই গান শুরু করল। গানের সঙ্গে পিছনে দুটো লোকের হাত-বাজনা বাজতে থাকল। নিটোল গলা উঠছে

নামছে। দেহ তুলছে ঘুরছে ফিরছে, সামনে আসছে পিছনে সরছে। হিল-জুতোর ঠক-ঠক শব্দ উঠছে। যৌবনের ঢেউ উঠছে নামছে, প্লিট স্কার্টের ভিতর দিয়ে নিম্নাঙ্গের নিটোল সৌন্দর্যের আভাস মিলছে। খুশি অনুরাগ বিরহ পরিতাপ কখনো বা ক্রোধের অভিব্যক্তি। সেই মতো গলা উঠছে নামছে। চোখের কানের এমন বিচিত্র ভোজ সকলের কাছেই অভিনব।

মিনিট কুড়ি বাদে শেষ হল।

অবন্তীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। আলতো করে রুমাল চেপে ঘাম মুছে হাসি মুখে হাতের মাইক মুখে তুলল। —এবারে আপনারা বুঝতে পারবেন ব্যাপারখানা কি।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আবার নাচ শুরু হল। সুঠাম দেহসম্ভার লীলায়িত হতে থাকল। এবারে সেই একই গানের বাংলা তর্জমা। সার কথা, প্রিয়তম, সকলে বলছে দেশের কাজে তোমার ডাক পড়েছে, এ আমার সব থেকে গৌরবের দিন। যুদ্ধে যদি তোমার মৃত্যুও হয়, তাহলেও তুমি অমর হবে, আমার প্রেম অমর হবে। হ্যাঁ, সত্যিই আজ আমার গৌরবের দিন, তুমি বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো –কিন্তু দোহাই প্রিয়তম, তুমি আহত হয়ে ফিরে এসো না যেন, মৃত্যু সহ্য করতে পারব কিন্তু এমন সুন্দর দেহের আহত রূপ আমার চোখে সহ্য হবে না।···প্রিয়তম চলে গেল, আমি এখন কি করি? জগতের সেরা খাবারগুলো যে আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না, সেরা মদে চুর হয়ে সমস্ত রাত বন্ধুদের সঙ্গে নেচে দিনে বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েও যে আমার বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে! তুমি স্বার্থপর, তোমার যুদ্ধের যন্ত্রণা কি আমার কষ্টের থেকে বেশি? দেশের যুদ্ধের থেকে প্রেমযুদ্ধ কি কম কিছু? তোমার অভাবে কত পুরুষ এখন আমাকে প্রেমযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে, তুমি আহত হলে তার ওষুধ আছে —আমার ওষুধ কি? এখন আমার ভয় ধরেছে, যেভাবে তুমি আমার হৃদয় জুড়ে আছ —এরপর যুদ্ধে যদি মরেই যাও, এক-পক্ষ কালের মধ্যেও আমি কি কোনো নতুন প্রেমিককে তোমার জায়গায় বসাতে পারব? তুমি নিষ্ঠুর, যুদ্ধ নিষ্ঠুর —একমাত্র প্রেমযুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীতে আর

কোনো যুদ্ধ থাকা উচিত নয়।

শেষ হতে না হতে উল্লাসে আর করতালি ধ্বনিতে সভা ফেটে পড়ল। 'আবার আবার' রব উঠল।

মাইক হাতে সকলের উদ্দেশে হাসি মুখে অভিবাদন জানিয়ে অবন্তী বলল, আমি ক্লান্ত। এ অনুষ্ঠানের পর আর অনুষ্ঠান হয় না। আপনাদের ধন্যবাদ।

ভিতরে চলে গেল। সভার এক-মাত্র চোখ ধাঁধানো আলোটা যেন সরে গেল।

প্রাথমিক পরিচয়ের এ-ধরনের অনুষ্ঠানে মর্যাদার নজরানা পড়েই থাকে। এই গোছের মিলিত আমন্ত্রণ একবারই হয়। এরপর আগাম বায়না অনুযায়ী দু'পাঁচজন সঙ্গী বা মোসায়েব নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। রসিকজনেরা সেটা কেউ কারও গোচরে করে না। দালাল বা মোসায়েবরা দিনের বেলা প্রস্তাব নিয়ে আসে।

প্রথম রাতের মর্যাদার নজরানা গুনতে গুনতে ঊষা বাঈ আনন্দে দিশেহারা হয়। দু'শ টাকার কম কেউ দেয়নি। আড়াইশ' তিনশও দিয়েছে। একজন দিয়েছে পাঁচশ।

তিনি বেনারসী সিল্ক মার্চেন্ট সূর্য পাণ্ডে।

অবন্তী জানেও না কত টাকা পড়েছে। মেয়েদের সব নিচে পাঠিয়ে ঊষা বাঈ তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন সে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে।

পরদিন হাসি মুখে টাকার গোছা নিয়ে তার কাছে এসেছেন।—কাল তুমি মাত করে দিয়েছো বোন, কত টাকা এখানে আন্দাজ করতে পারো?

অবন্তী হেসে জবাব দিল, আমার ও নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

—বারো হাজার! এর অর্ধেক ছ'হাজার তোমার প্রাপ্য।

—উঁহু, আমাকে পাঁচ হাজার দেবে, এসটাবলিশমেণ্ট আর এনটারটেনমেণ্ট চার্জ হিসেবে সব-সময়ই তোমার পাওনা কিছু বেশি হবে।

ঊষা বাঈ ভারী খুশি।—তোমার দরাজ মন বটে···এবার লোক আসা শুরু হল বলে—আবার কবে প্রোগ্রাম নেব?

—সপ্তাহে একদিনের বেশি নয়। কদর বাড়াতে চাও তো আরও কম নিও।

খুব পছন্দ হল না, কিন্তু ঊষা বাঈ পীড়াপীড়ি করলেন না, ভাবলেন, মেয়ে আগে স্বাতন্ত্র হোক।

তিন দিন বাদে একটা প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত তিনি। ঈষৎ গম্ভীর। জানালেন, সিল্ক মার্চেন্ট সূর্য পাণ্ডের বন্ধু বীরেন্দ্র চৌবে এসেছে—পাণ্ডের বাগান বাড়িতে এক রাত ফাংশন করার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে।

—আমাকে মানে তোমাকে বা ইউনিটকে নয়?

—না···কেবল তোমার জন্যই বলছে। টাকা ভালই দেবে·

—বাতিল করে দাও। অবন্তীর সাফ জবাব।

—তাহলে তুমি এসে বলে যাও।

—আমার হয়ে আমি কথা বলার কে?

একটু আমতা আমতা করে ঊষা বাঈ বললেন, দেখো এ-ব্যাপারটা একটু ভিন্ন রকমের—পরে তোমাকে বলব, আমি বাতিল করলে বিশ্বাস করবে না।···লোকটাকে সূর্য পাণ্ডের বন্ধু বললাম বটে, আসলে তার মোসায়েব আর পেয়ারের ক্রীতদাস, যেমন ধূর্ত তেমনি পাজি, তুমি এসো—

অবন্তী এলো। বীরেন্দ্র চৌবে সবিনয়ে আর্জি পেশ করল।

ততোধিক বিনয়ে অবন্তী জবাব দিল, মিস্টার পাণ্ডে একটু ভুল করেছেন, এ-রকম প্রোগ্রাম আমি নিই না, আমার গান তাঁর ভাল লাগলে দয়া করে তাঁকে দিদিজীর এখানেই আসতে হবে। আচ্ছা, নমস্কার।

চলে এলো। নেকড়ের চোখ নেকড়ের অভিলাষ অবন্তী অনেক দেখেছে। আর একটা দেখল।

সপ্তাহে একদিন করে খুব ভোরে অবন্তী যোশী মহারাজের ডেরায় হাজিরা দেওয়া বন্ধ করেনি। কিন্তু এখন যা পাচ্ছে তার থেকে তাঁকে কিছু দিতে মন সরে না। আগে ঝোঁকের মাথায় যে পাঁচশ এক টাকা

দিয়েছিল সে-ও সৎ উপার্জনের টাকা কিছু নয়। তবু সে টাকার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কিছু যোগ ছিল না। কিন্তু এখন যে টাকা পাচ্ছে তা গান নয়, শিল্পের দক্ষিণা নয়, তা যেন নিছক দেহের দৃষ্টিভোজ বিলিয়ে উপার্জন করছে। অবন্তী তবু আব্দারের সুরে বলে, বাপুজী, আপনি কথা দিয়েছেন, দরকারে আমাকে ছেলের কাজ করতে দেবেন, কিন্তু আপনি কিছুই বলছেন না।

যোশী মহারাজ হেসে সারা।—কথা আবার কবে দিলাম। তারপর স্নেহার্দ্র গলায় বলেছেন, বেটি, আমি এক বেলা সেদ্ধভাত খাই, আর এক বেলা দুধ-রুটি, আমার যেটুকু দরকার, ওই আখড়ার বাড়ি ভাড়া আর রেকর্ড বিক্রির থেকেই এসে যায়, তবু দরকার হলে তোকে বলব না তো কাকে বলব....কিন্তু তুই মাত্র সপ্তাহে একদিন এলে কতটুকু শিখবি, বেশি আসিস না কেন?

—খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে বাপুজী, ঈশ্বর দিন দিলে বেশি আসব।

সপ্তাহে একদিন করে অবন্তীর প্রোগ্রাম থাকেই। উষা বাঈয়ের খেদ, তিন দিন হলেও মক্কেলের অভাব হয় না। পরের তিন মাসের মধ্যে তিন বার সূর্য পাণ্ডে তার মোসায়েবকে নিয়ে এসেছেন। তিন বারের মধ্যে দু'বার অবন্তী বিদেশী নাচ-গানের আবেদন সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছে। —তবিয়ত ঠিক নেই। তবিয়তের বেঠিক কারও চোখে পড়েনি। মেজাজ নেই এটুকু বোঝা গেছে। মাঝে যেবারে সেই সাজ পোশাকে আসবে এসেছে, সূর্য পাণ্ডের শিরার রক্তে কতটা আগুন ধরল উষা বাঈ আঁচ করতে পেরেছেন।

অবন্তীও মানুষটাকে ঠিকই লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কোনো অনুরোধই তিনি নিজে করেন না। সেটা আসে বীরেন্দ্র চৌবের মারফৎ। কিন্তু নাকচ করলে এই মানুষের মুখে কঠিন রেখা পড়তে থাকে, চাউনি নিশ্চল হয়, বড় বড় নিঃশ্বাসে বুকটা এক এক সময় হাপরের মতো ওঠা-নামা করতে থাকে। অবন্তী উষা বাঈয়ের মুখে শুনেছে, সূর্য পাণ্ডের হার্টের ব্যামো আছে, কার্ডিয়াক ট্রাবল না কি বলে, আর ব্লাডপ্রেসারও চড়া। বাড়িতে সর্বদাই একটা করে অক্সিজেন সিলিণ্ডার মজুত থাকে,

শ্বাস কষ্ট বাড়লে বাড়তি অক্সিজেন দরকার হয়। রাগলে ব্লাডপ্রেসার চড়ে শ্বাস কষ্ট বাড়ে। আর মদ বেশি খেলে তো বাড়েই। কিন্তু দুইয়ের কোনটার ওপর এই লোকের সংযম নেই। মদ খাবেই আর পানের থেকে চুন খসলে রেগেও যাবে।

অবন্তী মালহোত্রা জানে সে এই লোকের রাগের কারণ হয়ে উঠছে। গত তিন মাসের মধ্যে তাঁর পেয়ারের চেলাটি কম করে আট দশবার কিছু না কিছু প্রস্তাব নিয়ে উষা বাঈয়ের কাছে এসেছে। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে সদলে বাগান বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সবই নাকচ করার ফলে ব্লাডপ্রেসার কতটা চড়ে থাকতে পারে, আর বুকের ওঠা-নামার গতি কি হতে পারে উষা বাঈ সানন্দে সেই অনুমানের কথা ওকে শুনিয়েছেন। আর হেসে হেসে বলেছেন, দেখব, এই বাদশাহা মেজাজের রইস আদমীকে কতদিন তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারো।

নিরীহ মুখে অবন্তী জিগ্যেস করেছে, ঠেকিয়ে রাখি তুমি চাও না চাও না?

উষা বাঈয়ের বয়স্ক চোখে ক্রোধ ঝিলিক দিয়ে গেছে। তারপর হেসে জবাব দিয়েছেন, তোমাকে তাঁর মুঠোয় এনে দিয়ে আমি এক্ষুনি পাঁচ সাত হাজার টাকা রোজগার করতে পারি জানো?

ওই লোকের প্রতি উষা বাঈয়ের সঠিক মনোভাব অবন্তী এখনো আন্দাজ করতে পারেনি। দু'জনের বয়সের ফারাক দু'বছরের বেশি নয়। উষা বাঈয়ের মুখেই শুনেছিল ওই লোকের বয়েস আটচল্লিশ, তাঁর বড় বড় দুটো ছেলে আছে। ছেচল্লিশ বছরের উষা বাঈ তাঁর যৌবনের দোসর হিসেবে এখন বাতিল বলেই কি এই মনোভাব? এ কি ঈর্ষা? কিন্তু উষা বাঈকে এমন নিরেটও মনে হয় না অবন্তীর, তাঁর বাস্তব বুদ্ধি বরং প্রখরই দেখে আসছে।

পরের মাসে একদিন সূর্য পাণ্ডের চেলা বীরেন্দ্র চৌবে চলে যেতে উষা বাঈ হাসতে হাসতে অবন্তীর ঘরে এলেন।—কি গো, তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি তো মঞ্জুর, এখন কি করবে?

বুঝেও অবন্তী জিজ্ঞেস করল, কোথায়? কোন্ অফিস?

—সেটাও বলে দিতে হবে? কিন্তু প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি অফিসে হয় না বাড়িতে হয়?

মৃদু হেসে অবন্তী জবাব দিল, দু' জায়গাতেই হতে পারে।....তুমি বলে রেখেছিলে বুঝি?

আমি কেন, তুমিই তো আমাকে বলে রেখেছিলে। বেচারার ব্লাডপ্রেসার আব কার্ডিয়াক ট্রাবল বেড়েই যাচ্ছে দেখে আমি কেবল জানিয়েছিলাম প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকবি তোমার পছন্দ। আজ বীরেন্দ্র শেয়ালটা এসে বলে গেল, এই কাজের ব্যাপাবে তার কর্তা তোমাকে কাল সকাল ন'টায় তাঁব বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন।.... তা বোনটি, প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকবি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত, না রাতেও?

অবন্তী হেসেই জবাব দিল, কাজের চাপ বাড়লে রাত পর্যন্তও গড়ায়।

—তাহলে আমি তো না হয়ে গেলাম!

অবন্তীর দু'চোখ তাঁর মুখেব ওপব স্থির একটু'—এবারে ছোট বোনের কথার একটা সহজ সত্যি জবাব দেবে দিদিজী?

থমকালেন একটু।—কি কথা?

—সূর্য পাণ্ডেকে তুমি ভালবাসো?

চোখে সেই রকম ক্রোধ ঝিলিক দিয়ে গেল।—আমি কেবল তাব টাকা ভালবাসি, তাকে নিঃস্ব করতে পারলে করি—কিন্তু তার ছায়াকে পর্যন্ত ঘৃণা কবি—থুঃ থঃ থুঃ!

অবন্তী হতবাক।

—ও আমাব এত আদরের ছোট বোনটাকে খেয়েছে—আমার বয়েস কালের মেয়ে থাকলে তাকেও খেত—বুঝলে? তুমি যদি ওর বুকের সব রক্ত টেনে বার করে নিতে পারো আমি তোমার কেনা বাঁদী হয়ে থাকতে রাজি আছি—বুঝলে কেমন ভালবাসি ওকে আমি?

অবন্তী এঁর মুখেই শুনেছিল এই বোন গঙ্গায় ডুবে মরেছে। আজ এই কথা। খানিক চুপ করে থেকে বলল, আমাকে বলবে কী হয়েছিল?

শুনল ....। ছাব্বিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে বোন ঊষা বাঈয়ের কাছে এসেছিল। তার রূপ যেমন ছিল, তেমনি চমৎকার গানও গাইতো। গানের সুনামও হচ্ছিল। জলসায় ফাংশনে ডাক পড়ত। দু'বছর ধরে এখানে সূর্য পাণ্ডের খাতির কদর দেখেছে। তাই সে এলে বোনও খাতির যত্ন করত তাকে, গাইতে বললে গান শোনাতো। এই অকরুণ মানুষ সত্যিই গানের সমজদার। উচ্চাঙ্গ সংগীত ভাল বোঝে। বয়স কালে তাঁর সাহায্যেই ঊষা বাঈ এই পেশায় জাঁকিয়ে বসতে পেরেছিলেন, বোন তাও জানে। সূর্য পাণ্ডে বোনকেও জোর করেই গান শোনার দাম দিত, দু'জনকেই বেনারসী শাড়ি আর নানা রকম উপহার দিত। ঊষা বাঈ তার আগে থেকেই প্রমাদ গুনেছে, বোনকে সাবধানও করেছে। বোনও বুঝতে পারত সে লোভের জালে পড়ছে, তাই দিদি কিছু বললে সে ঝগড়া করত, রাগ করে চলে যেতে চাইত। পর পর ক'দিন হয়ত সূর্য পাণ্ডের সামনে আসতও না। কিন্তু কিছু দিন না যেতে আবার যে-কে সেই। ঊষা বাঈ মনে মনে হাল ছেড়েছিল। বোন যদি তারই জীবিকা ধরে সে কি করতে পারে। ঊষা বাঈয়ের বদ্ধ বিশ্বাস সূর্য পাণ্ডে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

...একবার তিন দিনের একটা ভালো বায়না পেয়ে ঊষা বাঈ কানপুর গেছল। ফিরে এসে দেখে বোনটা কেমন যেন গুম হয়ে আছে। তখন অন্য মেয়েরা ছিল না, একটা মাঝবয়সী আয়া কেবল ছিল। তার কাছে শুনে ব্যাপার বুঝতে বাকি থাকল না।...পরপর দু'রাত সূর্য পাণ্ডে আর তার চেলা বীরেন্দ্র চৌবে এসেছিল। মাঝ রাত পর্যন্ত থেকে গেছে।

ঊষা বাঈ তক্ষুনি জানে একা সূর্য পাণ্ডে হলে বোনের এমন মানসিক অবস্থা হত না। চেলাকেও আনন্দের ভাগ দিয়েছে। এটাই তার রীতি। নিজে পরিতুষ্ট হলে চর্বিত মাংস খণ্ডের মতো সেটা সঙ্গীর সামনে ফেলে দেয়।

রাগে ঊষা বাঈ চুলের মুঠি ধরে বোনের মাথা মেঝেতে ঠুকে দিয়েছিল। বোন রাগ করেনি। কাঁদেনি। তিন দিন পরে গঙ্গাস্নানে

গিয়ে আর ফেরেনি। দশ মাইল দূরে তার লাশ পাওয়া গেছল।

...হ্যাঁ, এতদিনে এই লোককে অবন্তী একবার নেড়েচেড়ে দেখতে রাজি। ...রজার বারডোঁর মতো হিংস্র পশুর সঙ্গে তু তুটো বছর কাটাতে পেরেছে। তার তুলনায় এ আর কত সাংঘাতিক মানুষ হবে? উষা বাঈকে বলেছে, দিদিজী, আমি জিতলে তোমার লোকসান হবে না এটুকু বিশ্বাস তুমি রেখো।

পরদিন সকাল ন'টাতেই এসেছে। সেকেলে ধাঁচেব তু' মহলা দালান। ছেলেরা বাপের সঙ্গে থাকে না এটুকু জানা আছে। বীরেন্দ্র চৌবে সাদরে তাকে দোতলায় নিয়ে গেল।

মস্ত টেবিলের ও-পাশে গদির চেয়ারে সূয পাণ্ডে বসে গড়গড়ার নলে তামাক টানছেন আর একটু বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। ছোটর ওপর স্থির চোখ তুটো বেশ লাল। রাতের নেশার পর সকালে যেমন হয়।

তু'হাত জুড়ে নমস্কার জানিয়ে অবন্তী এগিয়ে এলো।

ও-ধারের চাউনি মুখের ওপর স্থির একটু। চোখের তারা সহজে নড়ে না অবন্তী আগেও লক্ষ্য করেছে। মাথা নাড়লেন। —বসো, তুমি করে বললে আপত্তি হবে না তো?

—তাই তো বলবেন। মুখোমুখি বসল।

একটা চেয়ার ছেড়ে আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে অন্তরঙ্গ মুখে বীরেন্দ্র চৌবে বলল, পদবী শুনছি মালহোত্রা, অথচ কথাবার্তা খাঁটি বাঙালীর —দেশ কোথায় তোমার?

অবন্তী আস্তে আস্তে তার দিকে ঘুরে তাকালো, বলল, বস্ হিসেবে এঁকে আমি যেটুকু অধিকার দিয়েছি আপনার বেলার সেটুকু খাটেনা এ মনে রাখলে আমার পক্ষে কাজ করতে সুবিধে হবে।

বীরেন্দ্র চৌবের ফর্সা মুখ লাল। ক্রোধ সামলে কর্তার দিকে তাকালো। সূর্য পাণ্ডের লালচে মুখ অবন্তী মুখের ওপর স্থির, একটু নির্বিকারও। বললেন, বীরেন্দ্র আমার সবকিছুর ডান হাত, ছোট ভাইয়ের মতো—আমার পরে এঁকেও তুমি বস্ ভাবতে পারো—

মৃতু অথচ স্পষ্ট সুরে অবন্তী বলল, তাহলে আমার পক্ষে কাজে

জয়েন করার অসুবিধে আছে, একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি দু'জনের আণ্ডারে কাজ করে কিনা জানি না, আমি করব না।

চাউনি নড়ল না, নির্লিপ্ত মুখে কৌতুকের আঁচড় পড়ল একটু। কিন্তু সদয় কৌতুক নয়। বললেন, এ আমার সব থেকে পুরনো আর সব থেকে বিশ্বস্ত লোক, বন্ধুৎ—এর সঙ্গে কাজের যোগাযোগ তো তোমার থাকতেই হবে।

অবন্তী জবাব দিল, তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই।

—ঠিক আছে। তুমি এম এ পাশ?

—হ্যাঁ।

—মাইনে কত এক্সপেক্ট করো?

—আপনি বলুন।

—যদি দেড় হাজার থেকে শুরু করি?

দু' হাজারের কম বলবে অবন্তী ভাবেনি। ইচ্ছে করেই একটু সময় নিয়ে জবাব দিল, তাই করবেন।

—তোমার পছন্দ হল না মনে হচ্ছে?

—আপনি শুরু বললেন, তাই আপত্তি করছি না। আর আপনার দিক থেকেও আমার যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রশ্ন উঠতে পারে—যোগ্য মনে হলে আপনি বিবেচনা করবেন।

অবন্তী জানে আরও পাঁচশ বাড়াতে বললে তক্ষুনি বাড়াবে। কিন্তু মাইনের লক্ষ্য নিয়ে সে এখানে আসে নি।

—আমার আড়ত সকাল ন'টায় খোলে, সেখানে তোমার অফিস থাকবে, সকালে সেখানেই বসবে, আমিও তাই বসি—সকাল ন'টায় আসতে তোমার অসুবিধে হবে?

হবে না।

—বেলা এগারোটা থেকে একটা আমি দোকানে থাকি, তোমার দোকানে যাবার দরকার নেই। একটা থেকে দুটো, লাঞ্চ এই বাড়িতে তোমার লাঞ্চের ব্যবস্থা থাকবে—দুটোর পর থেকে আমি বাড়িতে অফিস করি, তুমিও তাই করবে। সাগরেদের দিকে তাকালেন, পাশের ঘরটা ওর অফিস ঘর করে দিস, ইণ্টারকম অ্যারেঞ্জমেণ্ট

থাকবে, আর নিচের অফিস ঘরের সঙ্গে একটা কানেকশান থাকলেও ভাল হয়। অবন্তীর দিকে চোখ ফেরালেন, লাঞ্চের পর তোমার ওয়ার্কিং আওয়ারস কি হবে?

চোখে চোখ। ঠোঁটে হাসির আভাস। অবন্তী জবাব দিল, বস-এর যতক্ষণ কাজ এফিসিয়েন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারিরও ততক্ষণই কাজ থাকার কথা, এ ছাড়া সিডিউল আওয়ার কি হবে আপনি ঠিক করে দিন।

চক্ষু অনড় কিন্তু আগের মতোই কৌতুকের ছায়া। এ-টুকর সাদা অর্থ, তুমি মেয়ে কত সেয়ানা বুঝতে পারছি। বললেন, নিচের স্টাফদের সিডিউল আওয়ারস সাড়ে ন'টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত—তোমারও তাই থাকল। আজ থেকে জয়েন করছ?

অবন্তী একটু দ্বিধার সুরে বলল, পরশু পয়লা তারিখ থেকে যদি জয়েন করি?

—ঠিক আছে। পরশু এসে তুমি হাতে হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাবে। বোথ্ সাইডে মিনিমাম এক বছরের কনট্রাক্ট থাকবে। বীরেন্দ্র চৌবের দিকে ফিরে হেসে বললেন, তোর পোজিশন তো বুঝতেই পারছিস, এঁকে সসম্মানে এগিয়ে দিয়ে আয়, আর নিচের ওরা এসে থাকলে পরিচয় করিয়ে দিস—

অবন্তীর মনে হল মালিকটির হাসির কথার মধ্যেও তরল ভাব খুব নেই, বরং একটু ধার-ধার। চৌবে উঠে দাঁড়ালো। —আসুন। ধূর্ত চোখে হাসি ফুটিয়ে মনিব-বন্ধুর দিকে তাকালো। —তুমি যত স্নেহই করো দাদা, আমিও তো কর্মচারী ছাড়া কিছু না—ওঁর সঙ্গে ও-ভাবে কথা বলতে যাওয়া আমারই ভুল হয়েছিল।

সূর্য পাণ্ডের মুখ দেখে মনে হল না এ-ধরনের ছেঁদো কথার কোন দাম আছে তাঁর কাছে। উঠে দাঁড়াতে চাউনিটা অবন্তীব বুকের কাছ থেকে মুখ পর্যন্ত উঠে এলো।

এটা বাইরের মহল। নিচের তলায় বড় বড় দুটো ঘরে নানা বয়সের সাতটি লোক মাত্র কাজ করছে। একজন বয়স্ক ক্যাশিয়ার, একজন স্টেনো টাইপিস্ট, আর অন্যরা বড় মেজ সেজ ন' ছোটবাবু

ইত্যাদি। বীরেন্দ্র চৌবে সকলের সঙ্গে এমন ঘটা করে পরিচয় করিয়ে দিল প্রাইভেট সেক্রেটারি অবন্তী মালহোত্রার, যেন এবার থেকে সে-ই ব্যবসায়ের সর্বময়ী কর্ত্রী। বাড়ির এই অফিসে কেবল বাইরের প্রভিন্স আর বিদেশে মাল চালানের যাবতীয় হিসেব নিকেশ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়। বারণসী আর সমস্ত ইউ পি'র ব্যবসার হিসেবপত্র ব্যবস্থাপনা গোডাউন সংলগ্ন অফিসে।

একটা মাস একটু বেশি অপ্রত্যাশিত ভাবেই কাটল অবন্তীর। মালিকের অসংযত আচরণের এতটুকু আভাসও দেখা গেল না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি কেবলই যেন কঠিন এবং কড়া মালিক। সকাল ন'টার মধ্যেই অবন্তী আড়তের অফিসে আসে। তার দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সূর্য পাণ্ডে আসেন—সেদিনের ড্রাইভার মিশ্রজী আধবুড়ো নয়, বেশ জোয়ান মানুষ। মালিক যে দু ঘণ্টা থাকেন, কর্মচারীরা তটস্থ। দোকানে চলে গেলে হাঁপ ফেলে বাঁচে যেন। গত একটা মাসের মধ্যে অবন্তী তাঁকে এই অফিসে হাসতে দেখেনি কখনো। মনে হয় যখন যার ডাক পড়ে, তার বক্তব্য কানে শোনেন, আর অনড় চোখ দুটো দিয়ে বুঝে নেন। হাসতে বাড়ির অফিসেও কম দেখে।

...অবন্তীব চোখ-কান খুব বেশি রকম সজাগ আর সতর্ক। কারণ ব্যবসাটা সত্যি কত বড় তার কল্পনায় ছিল না। বেনারস আর সমস্ত ইউ পি-তে যেমন বিক্রি, তেমনি এ-দেশের নানা রাজ্যেও। কলকাতা বোম্বাই দিল্লি মাদ্রাজের ব্যবসাও অভাবনীয়। এ ছাড়া বিদেশেও কম মাল চালান যায় না। অবন্তী গোড়ায় কাজের চাপেই বিকেল ছটার আগে ছাড়া পায়নি। চৌবে বলেছে, এত তাড়াতাড়ি বোঝার কি দরকার, বাড়ি চলে যান।

অবন্তী কান দেয়নি। পনেরো দিনের মাথায় খটকা লেগেছে একটু। ক্যাশ কণ্ট্রোলের অনেকটাই অবন্তীর হাতে। কে কি জন্যে কত টাকা নিচ্ছে, কিভাবে খরচ হবে বা হচ্ছে সেই স্টেটমেন্ট তার হাতে জমা পড়ছে। সে চিরকূট দিলে দু' জায়গারই ক্যাশিয়ার হাজার হাজার টাকা বার করে দেবে। চৌবে স্পষ্টই বলেছে,

এণ্টারটেনমেণ্ট কনভেয়ান্স স্পেকুলেটিভ এক্সপেন্স—এ-সবের দরুন আপনার নানা রকম খরচ থাকতে পারে, আপনার যেমন ইচ্ছে অন-অ্যাকাউণ্টে টাকা তুলে নেবেন, তার কোন রিজিড হিসেব মালিক আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করবেন না। আপনার স্টেটমেণ্টের সঙ্গে সে-সব জুড়ে দেবেন। বাড়ির অফিসে সুর্য পাণ্ডে অনেক সময় ঘরে থাকেন না, একটু অসুস্থ বোধ করলেই অন্দর মহলে গিয়ে শুয়ে পড়েন। কাজ থাকলে বেরিয়ে যান। এক-একদিন তাকে ডেকে বলে যান, ড্রয়ারে টাকা আছে, কত আছে গুণে আমার ভিতরের সেফএ তুলে রেখো, ওগুলো সাদা টাকা নয়' চাবিও তার কাছে ফেলে যান। ড্রয়ার খুলে বা অন্দর মহলের সিন্দুক খুলে অবন্তীর চক্ষু স্থির হয়ে যায়। তাড়া-তাড়া টাকা। সিন্দুক তো বোঝাই। দু'তিনটে বাণ্ডিল সরালেও টের পাওয়ার উপায় নেই।

....কিন্তু অবন্তী স্থির বুঝেছে, এর সবটাই টোপ। সততা পরীক্ষার টোপ। লোভের টোপ। তার কেমন ধারণা এই মালিকের সমস্ত টাকারই চুলচেরা হিসেব আছে। অবন্তী আরও সতর্ক আরও সজাগ।

দুপুরে তিনজনে একসঙ্গে লাঞ্চ করে। সুর্য পাণ্ডে বীরেন্দ্র চৌবে আর অবন্তী। বাড়িতে চাকর দরোয়ান আর রান্নার লোকও আছে। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই রেস্তরাঁ থেকে কেনা লাঞ্চ খেতে হয়। বড় রেস্তরাঁ হলেও রিচ খাবারই। শুধু মদ নয়, অবন্তী বুঝতে পারে মালিকের শ্বাস কষ্টের এটাও বড় কারণ। চড়া প্রেসারেরও। খেতে খেতে বীরেন্দ্র চৌবেই যা দু'দশটা রসিকতার কথা বলে। সুর্য পাণ্ডের তখন স্বাভাবিক মুখ, অর্থাৎ গাম্ভীর্যের তলায় সামান্য হাসির আভাস। দুই একটা কথা বলেন কি বলেন না। তবে, অবন্তীর মনে হয় চোখের ওই অকোমল অচপল চাউনি দিয়েই লোকটা যেন রমণী দেহের স্পর্শ অনুভব করতে পারেন। এক মাসের মধ্যে লাঞ্চের সময় বা দুপুর থেকে বিকেলের অফিসে মানুষটার এর বেশি বে-চাল দেখেনি।....এর একটা কারণও অবশ্য থাকতে পারে। অবন্তীর ভাগ্য কিনা জানে না, কাজে লাগার পর থেকে মানুষটা

অসুস্থই মনে হচ্ছে। মুখে একটা আলগা লালের ছাপ, অর্থাৎ ব্লাডপ্রেসার বেশি। হাঁপের বহরও বেশি। হাঁপানির মতো নয়, বুকের বাতাসই যেন কম। বেশি শ্বাস কষ্ট হলে খুক-খুক কাশি।

....একদিন একটু বেশিই হয়েছিল। সামনে বসে অবন্তী চুপচাপ খানিক লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কি বেশি অসুস্থ বোধ করছেন নাকি?

স্টেটমেন্টের পাঁজা থেকে চোখ দুটো তার মুখের ওপর উঠে এলো। অনড় হল। গাম্ভীর্যের তলায় চোখে পড়ে কি পড়ে না এমন একটু হাসি ছড়ালো। —কেন, তুমি কি ডাক্তার?

—না, দরকার হলে ফোনে আপনার ডাক্তারকে চটপট খবর দিতে পারি।

চোখ আবার স্টেটমেন্টের পাঁজায় নেমে এলো। কিন্তু সুস্থির হয়ে বসতে পারলেন না। মুখের লালচে ভাব বাড়ছে। শ্বাস কষ্টও। একটু বাদে আস্তে আস্তে উঠলেন। তাকালেন।—এসো আমার সঙ্গে।

ঘর ছেড়ে বেরুলেন। বাইরের মহল থেকে অন্দর মহলের দিকে। মস্ত লম্বা বারান্দা। দুটো ঘর ছাড়িয়ে তৃতীয় ঘরে ঢুকলেন। খুব ঠাণ্ডা মুখে অবন্তীও। মস্ত পালঙ্কে শয্যা বিছানো। মাথার দিকের দেয়ালের কাছে কাঠের ফ্রেমে একটা নল আর ফানেল সুদ্ধু অক্সিজেন সিলিণ্ডার বসানো। আর একদিকের কাচের আলমারিতে সারি সারি বিলিতি মদের বোতল। ছোট টেবিলের ওপর একটা ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র। ছোট ছোট শিশিতে ওষুধের বড়ি।

—একটু জল দাও।

এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে অবন্তী কোণের গেলাসে ঢাকা জলের কুঁজো দেখতে পেল। জল ঢেলে গ্লাস নিয়ে সামনে এলো। শিশি থেকে দুটো বড়ি বার করে নিয়ে তিনি মুখে পুরলেন। হাত থেকে জল নিয়ে গিললেন। দু'চোখ অবন্তীর মুখের ওপর। অবন্তী আধ-হাতের মধ্যে। গেলাস ফেরত দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বললেন, ফানেলসুদ্ধু ওই অক্সিজেনের নলটা দাও—

অবন্তী তাড়াতাড়ি সেটা এনে তাঁর হাতে দিল। ফানেলটা নিয়ে নাকে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধমকেই উঠলেন, এটা কি খেলনা, অক্সিজেনের চাবি খুলবে কে?

অবন্তী আবার দ্রুত এগোলো।

—চাবিটা আস্তে আস্তে ঘোরাও, যখন বন্ধ করতে বলব বন্ধ করবে।

তাই করল।

জোরে জোরে বারকতক নিঃশ্বাস নিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, ঠিক আছে যাও, একবার বীরেনকে পাঠিয়ে দাও, প্রেসারটা চেক করবে।

অবন্তী জানে প্রেসার দেখা কঠিন কাজ কিছু নয়, যে জানে সেই পারে। কিন্তু সে জানে না। দ্বিধা কাটিয়ে অবন্তী জিগ্যেস করল, ডাক্তারকে খবর দেবার দরকার নেই?

নাকে অক্সিজেনের ফানেল লাগানো। দু'চোখ তার মুখের ওপর। সেই অকোমল হাসির আভাস। —রোগী ডাক্তার পেলে বেশি ভাল হয় না তোমাদের দেখলে? বীরেনকে পাঠিয়ে দাও।

বেরুতে গিয়ে একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়ল অবন্তীর। দেয়ালে ঝুলছে একটা চামড়ার ছোট চাবুক। কিন্তু অদ্ভুত ধরনের চাবুক। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ছোট্ট মার্বেলের মতো কেবল চামড়ার গুটলি।

পরদিন নিয়মিত আবার তিনি অফিসে হাজির। একটু শুকনো ফ্যাকাসে মুখ। আর কোনো ব্যতিক্রম নেই। দুপুরের লাঞ্চে রেস্তরাঁর সেই রিচ্ খাবার। এর আগে অবন্তী এক ফাঁকে বীরেন্দ্র চৌবেকে জিগেস করেছিল, প্রেসার খুব হাই ছিল?

—খুব।

—কাল রাতে ড্রিংক করেছিলেন?

—খুব।

—আপনি বারণ করলেন না কেন?

ফর্সা মুখে গলগলে হাসি।—কাকে বারণ করব, ওঁর জগতে উনি

জগদীশ্বর।

মাসের শেষে নিজস্ব একটা স্টেটমেন্ট দাখিল করল অবন্তী। নিখুঁত হিসেবের মধ্যে একটাই ব্যাপার অসম্পূর্ণ। মাসের মধ্যে তিনবার বীরেন্দ্র চৌবের নামে কয়েক হাজার টাকার ড্রইং লেখা। কেবল সেই টাকার হিসেব নিকেশ নেই। অবন্তী সেই অঙ্কের টাকার নিচে-নিচে লাল দাগ দিয়ে রেখেছে।

তাই দেখে মালিকের নির্লিপ্ত মুখের হাসির অভাস একটু বেশি স্পষ্ট। মাঝারি আকারের দু'চোখ তার মুখের ওপর উঠে এলো। বললেন, তোমার হিসেব কত পাকা সেটা আমি এই ক'মাস ধরে লক্ষ্য করেছি, বীরেনের হিসেব নিয়ে খুব মাথা ঘামানোর দরকার নেই, ও দিকে বেশি চোখ দিলে তার চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ বীরেন্দ্র চৌবের চুরির ব্যাপারটা অবধারিত খরচের মধ্যেই ধরে নিতে হবে।

পরের মাসের তিন তারিখে মাইনে হয়। অবন্তীও দেড় হাজার টাকা হাতে পেল। অনেক বছর পরে এটাই তার নির্ভেজাল রোজগারের টাকা। দেড় হাজার টাকা নিয়েই সেই রবিবারে যোশী মহারাজের বাড়িতে হাজির। প্রতি রবিবারের মতোই আগে প্রণাম করে তালিম নিতে বসল। শেষ হতে যোশী মহারাজ হেসে বললেন, অন্য দিনের থেকে আজ তোর গলাটা একটু ভালো লাগল বেটি।

অবন্তী আবার প্রণাম করে বলল, আজ যে অন্য দিনের থেকে একটু ভালো দিন বাপুজী। পায়ের কাছে টাকাটা রাখল, আমার প্রথম মাসের মাইনে আপনার পায়ে সংকল্প করেছিলাম। নিতে হবে—

যোশী মহারাজ প্রথমে বিমূঢ় একটু তারপর অত টাকা দেখে আঁতকে উঠলেন।—এ যে অনেক টাকা!

—খুব অনেক না, দেড় হাজার।

—দেড় হাজার মাইনে, কোথায় চাকরি কি চাকরি?

—প্রাইভেট সেক্রেটারির। তারপর আহত গলায় বলল, আমার কোয়ালিফিকেশনে দেড় হাজার কি বেশি হল?

—বেশ বেশ। হাসলেন, তোর ইচ্ছে হয়েছে যখন আমি একশ টাকা নেব, বাকি টাকা তুলে রাখ—

গলায় আকুতি ঢেলে অবন্তী জোর দিয়ে বলল, বাপুজী আজ এই দিনটা আমি আপনার ছেলে, চাকরিতে ঢোকার প্রথম দিন আমার সংকল্প ছিল প্রথম মাসের মাইনে আপনার চরণে এনে দেব —আপনি কখনো আমার সংকল্প নষ্ট করবেন না বাপুজী, এই দেড় হাজার টাকাই আপনাকে নিতে হবে।

বলার মধ্যে এমনিই একটু আবেগ ছিল যে বৃদ্ধ সাধক চেয়ে রইলেন খানিক।—সব দিয়ে দিলে তোর চলবে কি করে?

—আমি কি এই টাকার আশায় বসে আছি নাকি, আমার হাতে এখনো অনেক টাকা—এটা আপনি তুলুন তবে আমার শান্তি।

টাকাটা নিলেন। কপালে ঠেকালেন। বললেন, শেষ বয়সে এ আবার তুই আমাকে কি মায়ায় বাঁধলি রে বেটি —অ্যা? হঠাৎ উৎসুক। অবন্তীর বাঁ হাত-খানা টেনে নিলেন। ঝুঁকে উৎসুক চোখে হাতের রেখা দেখলেন। ডান হাতটাও টেনে নিয়ে একবার দেখলেন।

—কোথয় চাকরি করছিস, কোনো পছন্দের লোকটোক জুটেছে?

অবন্তী হেসেই মাথা নাড়ল। জোটেনি।

—জুটবে। তোর হাতে আবার বিয়ের চিহ্ন আছে মনে হচ্ছে।··· অবশ্য আগের মতো আব দেখতে পারি না, ভুল হয়, কিন্তু আজ তোকে আমি এই আশীর্বাদই করছি।

৮

দিনের চাকা একভাবে ঘুরবে না। অবন্তী খুব ভালো করেই জানে। সূর্য পাণ্ডে কিছুটা সংযমেব মধ্যে ছিলেন কিনা বা কতটা ছিলেন অবন্তী জানে না। পরের মাস থেকে তাঁকে বেশ একটু চাঙা দেখালো। হাঁপের টান অনেক কম। অবন্তী এখন মুখের দিকে তাকালে মেজাজ বুঝতে পারে। হাসেন না বড়, পুরু ঠোঁটে আর স্থির চোখে সামান্য হাসি দেখা যায়, তাইতেই বোঝা যায় মেজাজপত্র ভালো। দুপুরে লাঞ্চে এসে বিকেল পর্যন্ত তাঁর সামনে তাঁর ঘরেই থাকতে হয়। অবন্তী যখন কাজ করে, চাউনিটা নিঃশব্দে সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করে টের পায়। অবন্তীর ধাবণা এবারে উনি হাত বাড়ানোর দিকে এগোবেন।

সেদিন সাড়ে পাঁচটার পর বললেন, বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

অবন্তী শোনার জন্য প্রস্তুত।

—তুমি এখানে জয়েন করার পর থেকে আমার বিজনেসের লোকদের তোমার সম্পর্কে একটু কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তুমি উষা বাঈয়ের সঙ্গে থাকো আর সপ্তাহে ব'দিন টাকা নিয়ে নাচ গান করো এটা আর গোপন থাকছে না, সাহস করে আমাকে কেউ কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারি। তাতে আমার অবশ্য কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমি নিজেই আর এটা পছন্দ করছি না।

অবন্তী চুপচাপ চেয়ে আছে।

—এটা বন্ধ করলে তোমার কি-রকম লোকসান? ···যোশী মহারাজের কাছে তুমি গান শেখো, সেটা বন্ধ করতে বলছি না।

যোশী মহারাজে কাছে গান শেখে অবন্তী বলেনি, কিন্তু দেখা গেল খবর রাখেন। — টাকা নিয়ে নাচ গান বন্ধ করতে বলছেন?

—তোমার সখের জিনিস, ঠিক তা-ও বলছি না....ওখানকার নাচ-গান বন্ধ করলে তোমার কি-রকম লোকসান হবে তাই বলো।

···বেশি প্রোগ্রাম করি না বলে খুব বেশি লোকসান হবে না··· আমার আর দিদিজির মিলিয়ে মাসে হাজার দেড়েক।

স্থির চোখ দুটো মুখ বুক হয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এসে আবার উঠলো।—উষা বাঈকে আমি চিনি···সে তোমাকে এর চার গুণ লোভের রাস্তা দেখাতে চাইছে না ?

—এখন পর্যন্ত না···আমার স্বাধীনতায় হাত দেওয়া তাঁর এক্তিয়ারে নেই এ-রকম বোঝাপড়া তাঁর সঙ্গে হয়েছে।

চেয়ে আছেন। আবার সেই রকম একটু হাসির আভাস। —তোমাদের এই দেড় হাজার টাকার লোকসান যদি এ মাস থেকেই আমি পুষিয়ে দিই, আর অন্যত্র আমার খরচেই যদি তোমার থাকার ব্যবস্থাও করে দিই···তাহলে তোমার ওই শখের দিকটা মানে নাচ-গানের ব্যাপারটা শুধু আমার জন্যেই রিজার্ভ রাখা যায় না ?

অবন্তীও চেয়েই আছে। কালো টানা চোখে একটু হাসি চিকিয়ে উঠল।—যায়।··· কিন্তু তাতে আপনার বিজনেসের লোকদের মুখ বন্ধ থাকবে ?

—থাকবে। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ মুখ খোলে না, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারির নাচ-গান পাঁচজনের ভোগে আসছে এটা আমাব বরদাস্ত করতে অসুবিধে হচ্ছে।

যোশী মহারাজের আশীর্বাদ হঠাৎ কেন মনে পড়ল অবন্তীর জানে না।···আঠেরো বছরের বড় এই চরিত্রের পুরুষ পছন্দের মানুষ হতে পারে না। তবু···।

সূর্য পাণ্ডে হৃষ্ট মুখে উঠে দাঁড়ালেন।—ঠিক আছে চলো—

কোথায় যেতে হবে সঠিক বুঝল না। তাঁর সঙ্গে নেমে এলো। নিচের অফিসের লোকজন সকলে তখনো চলে যায়নি। সূর্য পাণ্ডে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

গাড়ি দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার মিশ্র পিছনের দরজা খুলে দিতে আগে ইশারায় অবন্তীকে উঠতে বললেন। তারপর নিজে পাশে বসলেন। --রামচাঁদের ওখানে চলো।

কে রামচাঁদ, তার ওখানে কি বা কেন না বুঝলেও অবন্তী কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মিনিট কুড়ি বাদে গাড়ি ভিড়ের রাস্তার দোকান-পাটের সামনে এক জায়গায় দাঁড়ালো। —এসো।

একতলাটা গয়নার দোকান মনে হল। তাকে নিয়ে সূর্য পাণ্ডে দোতলায় উঠতেই একটি সৌখিন লোক হন্তদন্ত হয়ে অন্তরঙ্গ হাসি মুখে এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরল।

—আমার জিনিষ রেডি ?

—সিওর সার। তসরিফ রাখিয়ে, ম্যাডাম সীট ডাউন প্লীজ! ব্যস্ত পায়ে ভিতরের দিকে চলে গেল।

অবন্তী দেখছে। নীচের গয়নার দোকানেরই এটা ওপরের স্টোর মনে হল। এখানেও আলমারিতে আর শো-কেসে গয়নার ছড়াছড়ি।

লোকটা, এ-ই রামচাঁদ হবে, ভেলভেটের একটা ছোট্ট চৌকো কেস হাতে ফিরল। নিজেই ওটা খুলে ভিতরের জিনিসটা তুলে দু'জনের সামনে ধরল।...নাকের গয়না। সোনার আঙটায় লাগানো মস্ত একটা হীরে। ঘরের জোরালো আলোয় তার জেল্লা ঠিকরোতে লাগল। অবন্তীর নাকে যে পাথরটা লাগানো আছে সেটার ওপরেই ওটা ধরে ভদ্রলোক সগর্বে তার রইস খদ্দের অর্থাৎ সূর্য পাণ্ডের দিকে তাকালো।

—পরিয়ে দেখান।

অবন্তী যন্ত্রচলিতের মতো নাকের পাথরটা খুলল। লোকটির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হীরের পাথর নাকে লাগালো। আগের পাথরটা এর তুলনায় একেবারে নিষ্প্রভ। পাথরের জেল্লায় অবন্তীর কালো মুখের রূপই বদলে গেল যেন। সূর্য পাণ্ডে উঠে এলেন। নিঃসংকোচে এক হাতে ওর গালটা একদিকে একটু ঘুরিয়ে পাথরটা দেখলেন অথবা কি-রকম মানিয়েছে দেখলেন। মুখে সেই গোছের একটু হাসির আভাস মাত্র। পছন্দ হয়েছে কিনা অবন্তীকে একবারও জিজ্ঞেস করলেন না।

—বিল।

লোকটা আবার হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। একটু বাদে বড় আকারের ক্যাশমেমো নিয়ে ফিরল।

সূর্য পাণ্ডে একবার দেখে নিয়ে পকেটে পুরলেন। ছ'পকেট থেকে ছটো একশ টাকার বাণ্ডিল বার করে তার হাতে দিলেন। লোকটার খুশিতে গদগদ মুখ।

অবন্তীর মুখে কথা নেই।…এই হীরের দাম বিশ হাজার টাকা এটুকুই শুধু বুঝল।

ফের গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে যে-পথে যেতে বললেন সেখানে উষা বাঈয়ের ডেরা। এখনো এতবড় উপহার সম্পর্কে কোনরকম উচ্ছ্বাস ছেড়ে এই মানুষের মুখে একটি কথাও নেই। কিছু বললে অবন্তী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত এমন নয়, আবার এই নির্লিপ্ততাও অস্বস্তির কারণ।…জিনিসটার অর্ডার আগেই দেওয়া ছিল বোঝা যাচ্ছে। কারণ দোকানে গিয়েই মালিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তাঁর জিনিষ রেডি কিনা। পছন্দ করা বা বাছাইয়ের কোনো প্রশ্ন ছিল না। …ভাবছে অবন্তী, বিশ হাজার টাকায় গায়ের অনেক গয়নাই হতে পারত, কিন্তু নাকে যা ছিল সেটা বদলে এমন একটা হীরে পরানোর দিকেই ঝোঁক হল ··এর থেকে কি বুঝবে? বুদ্ধি বা রুচির প্রশংসা করতেই হয়। আয়নায় নিজেকে তো দেখেছে। আর কোনো গয়নাতেই নিজের এই রূপ এত তীক্ষ্ণ আর এমন উজ্জ্বল হত না।

গাড়িতে একটি কথাও হল না।…সঙ্গে নিয়ে এখানে আসার উদ্দেশ্য বুঝছে না। অবন্তীর না থাকুক, এ-সময় অন্য মেয়েদের প্রোগ্রাম থাকতে পারে, উষা বাঈয়ের নিজেরও থাকতে পারে, অতএব নাচ-গানের আকর্ষণে কোনো বিশিষ্টজনের হঠাৎ এসে উপস্থিত হওয়া রীতি নয়। হয়তো উষা বাঈকে ডেকে প্রাইভেট সেক্রেটারির সম্পর্কে বিকেলের কথা অনুযায়ী নিজের কিছু বলার উদ্দেশ্য। কিন্তু অবন্তীর এটাও পছন্দ হচ্ছে না সামনে ড্রাইভার তাই কিছু জিজ্ঞেস করাও যাচ্ছে না।… বাড়ির সামনের গলিতে গাড়ি ঢোকে না, সবুর করাই ভালো।

গাড়ি থামতে সূর্য পাণ্ডে ড্রাইভারকে হুকুম করলেন, এঁর সঙ্গে গিয়ে দুই একটা জিনিষ নিয়ে এসো, তুমি এগোও উনি আসছেন।

ড্রাইভার মিশ্র তক্ষুনি নেমে গলির দিকে এগলো। সূর্য পাণ্ডে অবন্তীর দিকে ঘুরলেন একটু, ওব হাতে তোমার তানপুরাটা দিয়ে দাও···আর তোমার সেই ডান্স ড্রেসটাও নিয়ে এসো, বীরেনকে আজ বাড়িতেই একটু গান-টানেব ব্যবস্থা করতে বলেছি, রাতের খাওয়া-দাওয়াও আমার ওখানেই—

এতক্ষণে উদ্দেশ্য জলের মতো সরল···নাকে আজ বহুমূল্য বঁত্ন উঠেছে। এ প্রস্তাব কি ওটা খুলে দেবার মতো? মোটেই নয়। বরং উল্টো। কোন এক লক্ষ্যেব দিকে অবন্তী পা ফেলেছে। যদিও লক্ষ্যটা এখনো প্রায় ঝাপসাই। তবু শুরু তো বটেই। এই রত্ন শেষ ভাবলে অবন্তীর গলায় দড়ি। তবু মিষ্টি অথচ স্পষ্ট করেই বলল, কিন্তু আমার তো একটু বিশ্রাম দরকার, তার থেকেও বেশি দবকার স্নান···আপনি বরং চলে যান, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি নিজেই চলে যাচ্ছি—

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু একটু।—বিশ্রাম আমার ওখানেও হতে পারে, আর চানের ব্যবস্থাও এখান থেকে ভালো ছাডা খারাপ না—ছোট কিছুতে এক সেট জামা কাপড় নিতে পাবো।

অবন্তী নেমে এগোতে গিয়েও থমকালো, বলল, ডান্স মিউজিক হলে আর তানপুরা নিয়ে গিয়ে কি হবে?

—আমার কোনটাতেই অরুচি নেই, মিশ্র চলে গেছে দেরি কোরো না।

অবন্তী চলে এলো। উষা বাঈয়ের মুখে শুনেছিল বটে এই লোক উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও সমজদার।···একটা ছবিতে দেখেছিল, লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের হত্যাকারী রোমের সব থেকে অত্যাচারী সম্রাট রাতের নিভৃতে আপন মনে অনবদ্য ভায়োলিন বাজাচ্ছে।···কিছুটা মেলে? অসুস্থতা সত্ত্বেও মদ খাওয়া প্রসঙ্গে তাঁর মোসায়েব বীরেন্দ্র চৌবে বলেছিল, কাকে বারণ করব, ওঁর জগতে উনি জগদীশ্বর।

অনুষ্ঠান কিছুই হচ্ছে না, দোতলায় মেয়েরাই নাচ গানের মহড়া

দিচ্ছে, উষা বাঈ বসে আছেন। তাঁকে ইশারায় ডেকে অবন্তী দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল। মুখের দিকে তাকানো মাত্র উষা বাঈয়ের কিছু একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ল, কিন্তু এক লহমার দেখায় ঠাওর করতে পারলেন না কি।

ঘরে এসে মুখোমুখি দাঁড়াতেই দু'চোখ উদ্ভাসিত। আরো এগিয়ে এলেন। রত্নের ছটা চোখে লাগার মতো।—বাঃ, দারুণ তো! আজ কিনলে?

—এর নাম কমল হীরে, দাম বিশ হাজার টাকা···আমার কেনাব মুরোদ ভারী।

উষা বাঈয়ের মুখে কথা সরে না, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন। ছোট ভি আই পি ব্যাগে একপ্রস্থ জামা-কাপড় আর নাচের ড্রেস গোছাতে গোছাতে অবন্তী তার থাকা আর মাইনে প্রসঙ্গে সূর্য পাণ্ডের সঙ্গে যা কথা হয়েছে জানালো। আজ রাতে তাঁর বাড়িতে গান বাজনার কথাও বলল। —ভদ্রলোক গাড়িতে বসে আছেন আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।

উষা বাঈয়ের মুখে শুকনো টান ধরছে, চাউনি খরখরে। —রাতে ফিরছ না তাহলে?

—কি করে বলব···

—তোমার দিন তাহলে ভালো রকমই ফেরার মুখে?

অবন্তী সোজা তাকালো। —জানি না, তোমাকে আগেও বলেছি দিন ফিরলে তোমার লাভ বই লোকসান নেই।··· ফিরলেও তোমার ছোট বোনের মৃত্যু যদি ভুলি তাহলে ধরে নিও তোমার এই ছোট বোনও মরেছে!

উষা বাঈ থতমত খেলেন। উদ্গত আবেগ চাপতে না পেরে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

দোতলার অন্দর মহলে এসে অবন্তী বীরেন্দ্র চৌবে আর জনা-তিনেক কাজের লোক ছাড়া আর কাউকে দেখল না। সূর্য পাণ্ডেব ঘরে আসরের ব্যবস্থা। এক মুখ হেসে বীরেন্দ্র চৌবে ব্যস্তসমস্ত অন্তরঙ্গ মুখে আজই প্রথম মনিবের সামনেই অবন্তীর একখানা হাত

ধরল। —আসুন আপনার ব্যবস্থা মনের মতো হল কিনা দেখে নিন, একটা হাত-মাইকও যোগাড় করে ফিট করেছি, ঘণ্টা দুইয়ের জন্য একজন তবলচিও আসছে—

হাত ধরার জন্য অবন্তী আজ স্পষ্টত কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ করল না। কাজের লোকেরা সরে গেছে। সূর্য পাণ্ডে দু জনকেই লক্ষ্য করছেন। চেলাকে বললেন, ওর দিকে চেয়ে তোর কিছুই চোখে পড়ছে না ?

থমকে মুখের দিকে তাকালো। —আরেব্বাস, এ-যে একেবারে অ্যাঞ্জেল ফ্রম হেভেন! সোজা এগিয়ে গিয়ে সূর্য পাণ্ডের পা ছুঁলো। —পায়ের ধূলো দাও দাদা, তোমার চয়েস বটে। হীরেটার অর্ডারটা যখন দিলে তখনো ধারণা করতে পারিনি এ-রকম মানাবে ···ম্যাডাম, আয়নায় নিজে তুমি ইয়ে—দূর ছাই আপনি তুমি, আর কতকাল তুমি আমার ওপর অকরুণ হয়ে থাকবে ম্যাডাম, বয়েসের দিকে তাকালেও দাদা মাত্র আমার থেকে তিন বছরের বড়··ক্ষমা ঘেন্না করে আমাকেও 'তুমি' বলার পারমিশনটা দিয়ে দাও—দাদার পাশে থেকে তোমার কাছে এত দূরের লোক হয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না—

অবন্তী তাকে স্থির কটাক্ষে বিদ্ধ করে নিল একটু। হেসে বলল, বেশি কাছের লোক হতে না চইলে আপত্তি নেই, পারমিশন দেওয়া গেল।

মুখের হাসির আভাসই সূর্য পাণ্ডের মেজাজের ব্যারোমিটার। খুশি বিগলিত মুখে বীরেন্দ্র চৌবে বলে উঠল, আজ আনন্দের চোটে আমিও যদি নাচ শুরু করে দি রাগ করতে পারবে না দাদা—

ড্রাইভার মিশ্র তানপুরা নিয়ে হাজির। বীরেন্দ্র ব্যস্ত মুখে সেটা নিয়ে বাঁয়া তবলার সামনে রাখল। সূর্য পাণ্ডে ভিতরের দরজা দিয়ে পরের ঘরটা দেখিয়ে বললেন, তুমি ও ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে স্নান সেরে নাও, অ্যাটাচড বাথ আর সব রকম অ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে। সাগরেদের দিকে ফিরলেন, ডিনারের আগেও খাবার ব্যবস্থা কিছু রেখেছিস তো ?

—কিছু মানে! এন্তার—

এ-দিকের ঘরে অর্থাৎ সূর্য পাণ্ডের শোবার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। বীরেন চৌবে ব্যস্ত হয়ে ধরতে গেল। অবন্তী মুখ ফেরাতে সূর্য পাণ্ডের চোখে চোখ। ওই দুটো অনড় চোখে রাগের অভিব্যক্তি বোঝা যায়, খুশির আভাসও কখনো-সখনো মেলে—কিন্তু এখন এই চোখে লোভের বন্যা যত স্পষ্ট ততো আর কিছুই নয়।

বীরেন্দ্র চৌবে প্রায় ছুটেই চলে এলো। ফর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল। মুহূর্তের মধ্যে বিষম কিছু ঘটে গেছে যেন। মালিককে তিন হাত টেনে নিয়ে গিয়ে কানে কানে কি বলল। না, অবন্তী ভুল দেখছে না। দেখতে দেখতে এমন রাশভারী মালিকের সমস্ত মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে। চাউনি উদ্‌ভ্রান্ত। তাড়াতাড়ি অবন্তীর কাছাকাছি এসে বিড়বিড় করে বললেন, একটু মুশকিল হয়ে গেছে, আজ আর গান-টান কিছু হবে না···তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছে· ভালো কথা, কাল আমি খুব ব্যস্ত থাকব, কাল তোমাকে অফিসেই আসতে হবে না, পরশুও আসবে কিনা আমি খবর দেব—

ফিরলেন। অসহিষ্ণু গলায় পেয়ারের সাগরেদের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? লোক ডেকে দশ মিনিটের মধ্যে এ-ঘরের সব কিছু আর আমার ঘরের আলমারি পরিষ্কার করে ফেলতে বল্—গাড়ি নিয়ে অবন্তীকে তুই নিজে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়, কি হয়েছে ওকে বলে দিস—

নিজের ঘরের দিকে যেন কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলেন। এমন জাঁদরেল লোকের হঠাৎ এমন ভীতত্রস্ত দশা কল্পনা করা যায় না।

ছোটাছুটি হাঁক-ডাক করে বীরেন্দ্র চৌবে কাজের লোকদের হুকুম জারি করছে। একজন তানপুরাটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ছুটল, দু'মিনিটের মধ্যে মেঝের গদি ফরাস তাকিয়া সাফ। একটু বাদে চৌবে এসে বলল, চলো ম্যাডাম, আর দেরি করা যাবে না—

বারান্দায় এসে দেখল ঘরের এ-দিকে দরজাব সামনে সূর্য পাণ্ডে দাঁড়িয়ে। চোখোচোখি হতে মাথা নাড়লেন শুধু, অর্থাৎ যাও—

কিন্তু ওই চোখের দিকে চেয়ে অবন্তীর একটাই উপমা মনে আসছে।···উপোসী বাঘের সামনে থেকে কেই তার অতি লোভনীয় শিকার সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর অসহায় মুখে তাকে শুধু দেখতে হচ্ছে।

নিচে নেমে বীরেন্দ্র চৌবে অনায়াসে তার একটা হাতের ওপর দখল নিল। পরোয়ানা পেয়ে গেছে, আর যেন সংকোচের কারণ নেই। হাত টেনে না নিয়ে অবন্তী জিগ্যেস করল, হঠাৎ কি এমন হল বলুন তো?

—আমাদের কপাল ভাঙল আর কি হবে—আর দিন পেলেন না ···আসার, ছেলেদের বাড়ি থেকে ফোন এলো আধ ঘণ্টার মধ্যে দাদার মানে বংশের গুরুদেব আসছেন!

শুনে অবন্তীও ভেবাচাকা খেল একটু।—গুরুদেব!···তাঁকে উনি এত ভয় করেন!

—ভয়! স্বয়ং বিশ্বনাথ এসে সামনে দাঁড়ালেও দাদা এত ঘাবড়ায় না·· কিন্তু এই গুরুদেব তাঁর কাছে বিশ্বনাথের বাবা—সামনে এসে দাঁড়ালে কম্প দিয়ে জ্বর আসে।

অবন্তী সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে। চোখের সামনেই কি মানুষকে কি হয়ে যেতে দেখল।···নিজের ঘরের আলমারি পর্যন্ত পরিষ্কার করার হুকুম হল, অর্থাৎ মদের বোতলও চোখের আড়াল করা দরকার। গাড়িতে উঠে জিগ্যেস করল, ওঁর গুরুদেব কে?

—ব্রহ্মমহারাজ···ওঁর বাবার গুরুদেব ছিলেন, এখন ঝাড়-বংশের গুরুদেব!

—উনি কোথায় থাকেন, কোথা থেকে আসছেন?

—সেটা কেবল উনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

—আপনি দেখেছেন তাঁকে?

—দেখেছি, তবে দূর থেকে, দাদার ভয় দেখে কখনো সামনে যেতে সাহস হয়নি।··দাদার সব ভক্তি ভয়ে গিয়ে ঠেকেছে, আসলে

গুরুদেবকে তিনি যমের মতো ভয় করেন আর তেমনি ঘৃণা করেন।

বাড়ি ফেরার পর সব শুনে ঊষা বাঈও মজা পেলেন। আদরের সুরে বললেন, তুই আজ রাতটার মতো বেঁচে গেলি বলে মন খারাপ হল নাকি ?

অবন্তী জবাব দিল, উল্টে কেন যেন আনন্দ হচ্ছে।·· ওই মানুষেরও একটা বিষম ভয়ের জায়গা আছে জানা গেল, নিজের চোখেও দেখলাম—ইস্, জানান না দিয়ে যদি আসরের মধ্যে এসে হাজির হতেন···চক্ষু সার্থক হত।

ঊষা বাঈ বলে উঠলেন, তোর বুকের পাটা তো কম নয়, ব্রহ্ম-মহারাজ ভীষণ শক্তির সাধক আমিও শুনেছি···একবার নাকি নিজের ক্ষমতায় ওই সূর্য পাণ্ডেকে একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন—

অবন্তী ফস করে বলে বসল, সেটা এমন কি ভালো কাজ করেছিলেন—

খুশি হয়ে ঊষা বাঈ হেসে ফেললেন।

৯

আরো প্রায় সাড়ে তিন চার মাস বাদে অবন্তী মালহোত্রা ঠাঁই বদল করেছে। এত দেরি হবার কারণ জানে। বীরেন্দ্র চৌবের মুখে শুনেছে। ওই লোক এখন অনায়াসে তার হাত ধরে, কাঁধে হাত দেয়। একটু বেশি চাপ-টাপ পড়লে অবন্তী যে-ভাবে তাকায় তাতে একটু কুঁকড়ে যায় অবশ্য, কিন্তু হেসে গলগল করে পাঁচকথা বলে সামাল দেয়। সে-ই বলছে, গুরুদেবটি এই তিন সাড়ে-তিন মাস ধরে ঘুরে ফিরে ইউ, পি-তেই ছিলেন, কখন বারাণসীতে এসে হাজির হন এই ভয়ে দাদাকে এতদিন খুবই সতর্ক থাকতে হয়েছে। যদিও উনি বারাণসীতে পদার্পণ করলেই খবর পাবেন এমন ব্যবস্থাও সূর্য পাণ্ডে করে রেখেছিলেন। কিন্তু তা বলে অবন্তীকে একেবারে নিজের বাড়িতে এনে তুলতে সাহস করেননি। গত তিন থেকে চার মাসের

মধ্যে ছ' রাত তাঁর বাড়িতে নাচ গানের আসর বসেছে। অবন্তীর ধারণা গুরুদেবের ভয়ে তখন এই মানুষ হয়তো স্টেশনেও লোক মোতায়েন রেখেছিল। যত রাত বাড়ছে ততো তাঁকে নিরুদ্বেগ মনে হয়েছে।

…না, এই পুরুষকে ভোগের জোরালো দোসর মনে হয়নি অবন্তীর। রজার বারডোঁর মতো কলাকৌশল বর্জিত বেপরোয়া পশু নয়। কিন্তু তার থেকেও নিষ্ঠুর একটা প্রবণতার আভাস অবন্তী এটুকু সময়ের মধ্যেই পেয়েছে। ভদ্রতার কৃত্রিম মুখোসের আড়াল থেকে প্রবৃত্তির সংগোপন নখদন্তের আঘাতে শয্যাসঙ্গিনীকে শারীরিক ক্লেশ দিয়ে তাঁর আনন্দ। নিজের বয়সের বা অন্য দুর্বলতার পরিপূরক যেন এটুকু। অথচ আচরণে বা মুখভাবে মনে হবে না ইচ্ছাকৃত অপরাধ কিছু। সেটা বাড়ছে কারণ অবন্তীর দিক থেকে পারতপক্ষে প্রতিবাদ নেই কিছু। বাড়াবাড়ি হলে চাউনি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় এই আচরণ পছন্দ করছে না। তখন অবুঝের ভান করে। রজার বারডোঁর তুলনায় এই লোকের ক্রূরতা ষোল আনা সোফিসটিকেটেড।

এ-বাড়িতে এসে পাকাপাকিভাবে থাকার ডাক পড়তে অবন্তী ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু নিজের জীবনটাকে নিয়ে পাশার একটা বড় দান ফেলেছে এবারে। এখন পিছু হটতে রাজি নয়।…ভাগ্য বা জ্যোতিষীর গণনায় কোনদিন কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। এখনো আছে একবারও বলবে না। তবু হঠাৎ-হঠাৎ যোগী মহারাজের কথা মনে পড়ে। খুশি মুখে বলেছিলেন তোর হাতে আবার বিয়ের চিহ্ন আছে…তোকে আমি সেই আশীর্বাদ করছি।

আঠারো বছরের বড় এই প্রৌঢ়কে স্বামী কল্পনা করতে বিতৃষ্ণায় ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অবন্তীর জীবনে আর কি স্বামীর প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন আছে কেবল উত্তীর্ণ হওয়ার। নিজের চোখে দশজনের চোখে নিজেকে উত্তীর্ণ করার। এজন্য পুরুষ-পশুর কংকালের পাহাড় অতিক্রম করতে হলেও অবন্তী আর পিছু-পা হবে না। হিংস্র নখ-দন্ত মেলে ভাগ্য তার থেকে অনেক নিয়েছে, কিছুই

দেবে না ? তার অপরাধ কি ছিল ? সরল বিশ্বাস ছাড়া আর কি অপরাধ তার ছিল ?

ডাক পড়তে মুখ বুজেই চলে এসেছে। আগের দিনের বিশাল বাড়ির মহলে সে ঠাঁই পেয়েছে। একেবারে কোণের বড়সড় ঘরটা তার। সূর্য পাণ্ডে এই ঘর নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি। হীরে কেনার বেলায় যেমন, অন্য সব ব্যাপারেও তাই—নিজের পছন্দটাই সব। অন্য কারো মতামতের ধার ধারেন না।

আসার আগে গলগল করে ভিতরের কথা বীরেন্দ্র চৌবেই বার করে দিয়েছে। ভয়ংকর গুরুদেবটি দীর্ঘকালের জন্য প্রস্থান করেছনে। এটা মহাপ্রস্থানও হতে পারে। প্রথমে বিদেশে কিছুকাল কাটাবেন, তারপর ফিরে এসে হিমালয়ের কোথাও অজ্ঞাত বাসে থাকবেন। নিজের মুখেই নাকি বলে গেছেন পাঁচ ছ' বছরের মধ্যে দেখা হবে না। সূর্য পাণ্ডের ছেলেরা নাকি হাপুস নয়নে কেঁদেছে। তাদের আশংকা গুরুদেব চিরবিদায় নিলেন। গুরুদেব অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, আবার দেখা হবে।

কিন্তু সেই অনিশ্চিত দূরের ভবিষ্যত নিয়ে সূর্য পাণ্ডে মাথা ঘামানোর মানুষ নন।

...এ বাড়িতে বাস করতে এসে ওই গুরুদেবের একখানা বড় ছবি অবন্তী দেখেছে।... সূর্য পাণ্ডের স্ত্রীর পূজোর ঘর ছিল একটা। সেই ঘর আজও আছে। কোনো বিগ্রহ নেই। গুরুর আদেশেই সেই বিগ্রহ নাকি কোন্ দেবালয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাকর-বাকরেরা অন্যসব ঘরের মতই ওই ঘরও পরিচ্ছন্ন রাখে, এছাড়া ও-ঘরে আর কেউ ঢোকে না।

সেখানে দেয়ালে ব্রহ্ম মহারাজের একখানা বড় ফোটো টাঙানো। অবন্তী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। এখনো অনেক সময় এসে দাঁড়ায়। নির্নিমেষে দেখে। চোখের গভীরে যেন স্নেহের সমুদ্র, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবার হাতছানি। অথচ সমস্ত মুখ ভারী দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। কত সময় অবন্তীর দু হাত যুক্ত হতে চেয়েছে, ছবির উদ্দেশে দেয়ালে মাথা ঠেকাতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু অবন্তী হাত যুক্ত হতে

দেয়নি, দেয়ালে মাথা ঠেকায় নি। কে ইষ্ট? তার ইষ্ট বলে কেউ কোথাও আছে? অবন্তীর ইহকাল বলে কিছু আছে? পরকাল বলে কিছু আছে? আছে কেবল বুকের তলার কিছু জমাট বাঁধা আগুন—সবই ছাই করে দেবার নির্মম বাসনা।

কিন্তু দিন যায় বছর যায় একটা ছুটো করে, একটা হতাশা অবন্তীকে পেয়ে বসছে। বাইরে তার প্রকাশ নেই, অব্যক্ত যন্ত্রণা আছে।...যে মানুষের কাছে আছে, সে উদার হয়ে যত না হোক, অসুস্থতার দরুন অনেক কিছুই তার হাতে ছেড়েছে। অবন্তীর মাইনে এখন কাগজে কলমে মাসে আড়াই হাজার, আর ভোগের সহচরী হিসেবে মাসে আরো তিন হাজার। এই সাড়ে পাঁচ হাজারের মধ্যে মাসে এক হাজার করে সে ঊষা বাঈকে দিচ্ছে। বাকি টাকা তার নামে ব্যাঙ্কে জমছে। কিন্তু এর বাইরে খরচের সব টাকাই বলতে গেলে অবন্তীর হাত দিয়েই হয়। ঘরের সিন্দুক খোলার দরকার হলে তার ডাক পড়ে এমন নয়, যে কোন কারণে টাকার দরকার হলে অবন্তী সোজা এসে কিছু না জিগ্যেস করেই এই লোকের বালিশের তলা থেকে বা ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলে, টাকা বার করে নেয়। এদিক থেকে সূর্য পাণ্ডের জহুরীর চোখ। বুঝেছেন এর হাতে দশটা টাকাও গড়বড় হবার নয়। বাঁধানো হিসেবের খাতা আছে গোটা তিনেক। একটা বাড়ি খরচের, একটা অফিসের খরচের, আর একটা আড়তের অফিসের খরচের। মাসের পর মাসের হিসেব উল্টে দেখেছেন সূর্য পাণ্ডে।

অবন্তীর দ্বিতীয় জোরের দিক হল বিচক্ষণ ভাবে ব্যবসা বুঝে নেওয়া। মালিক অসুস্থ হয়ে পড়লেও কেউ কিছু টের পায় না। সব নিখুঁতভাবে চলে। টাকা নিয়ে বেশি গড়বড় করলে অবন্তী মালিকের সামনে বীরেন্দ্র চৌবেকে পর্যন্ত গম্ভীর মুখে সতর্ক করে, এভাবে চললে যার দায় তাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি হাত ধুয়ে বসে থাকব—তখন যা খুশি করুন।

বীরেন চৌবের ছু' চোখ জ্বলে উঠতে চায়। তিন-তিনটে বছর কেটে গেল, তার আশায় ছাই পড়েছে, লোভে ছাই পড়েছে।

এতকালের মধ্যে এ-রকম নিরাশ তাকে কখনো হতে হয়নি। কিন্তু মুখে হাসি ছড়িয়ে ভিতরের ক্রূর মনটাকে আড়াল করতে হয়।

··নিজের অগোচরে বা গোচরেও কিছুটা কর্তৃত্ব এই রমণীর হাতে মালিককে ছেড়ে দিতে হয়েছে। সেটা মনে হলে বা কোনো পরিস্থিতিতে সেটা প্রকট হয়ে উঠলে সূর্য পাণ্ডেও হিংস্র ক্রূর হয়ে উঠতে চান। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো আবার হাল ছাড়তেও হয়। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে অবন্তী নিজে তাঁর রান্নার আর খাওয়া-দাওয়ার তদারক করে। নিজের দেহ দিয়ে সূর্য পাণ্ডেকে এর সুফল অনুভব করতেই হয়। শরীর বেশি অসুস্থ হলে অবন্তীর কড়াকড়িও বাড়ে। লোভী মানুষটা তখন ক্ষেপে যায়। যাচ্ছেতাই করে চাকর-বাকরের সামনেই বকাবকি করেন, বলেন, বিয়ে করা বউ ভাবতে শুরু করেছ নিজেকে—কেমন? কখনো খাওয়া ফেলে রাগ করে উঠে চলে যান। ঠাকুর চাকর ভয়ে কাঁপে। একদিন টেবিলের থালা গেলাস উল্টে ফেলে দিতে অবন্তী বলেছিল, শরীরের যা অবস্থা আজ কিছু খেতে দেবারই ইচ্ছে ছিল না, ভালোই হল, না খাওয়ার থেকে খেয়ে বেশি বিপদ হয়।

সূর্য পাণ্ডে চোখ দিয়ে যাকে ভস্ম করবেন সে তখন আর কাছে নেই।

মানুষটা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন মদ খাওয়ার সময় বাধা পড়লে। বাধা পড়েই। বেশি মদ পেটে পড়লেই লোকটার হাঁপানি বাড়ে, শ্বাস কষ্ট বাড়ে। তখন অক্সিজেনের দরকার হয়। অবন্তী জোর করেই বাধা দেয়, মাত্রার হিসেবের কাছাকাছি এলেই আলমারিতে চাবি দিয়ে সেটা নিয়ে চলে যায়। দিশেহারা রাগে সূর্য পাণ্ডে তাকে তেড়ে মারতে এসেছেন। তাঁর পেয়ারের সাগরেদের সামনেই। এই লোক সর্বদাই তাঁর নেশার দোসর। অবন্তী তখনো অবিচলিত। বলে, আমাকে বিদেয় করে দিয়ে যা খুশি করুন, কিচ্ছু বলতে আসব না।

হাত শেষ পর্যন্ত গায়ে নেমে আসে না। কিন্তু অকথ্য গালাগাল করেন, ভোর হলেই তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াবেন বলে শাসান। কিন্তু পরদিন আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না। যেন

ভুলেই গেছেন।

আর একটা জোরের দিক অবন্তীর ক্রমশই করায়ত্ত। কিন্তু মনে হলে ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি-রি করে। বাসনাপর্বে কিছু তোয়াজের আগে ওই প্রৌঢ় দেহে কামনার আগুন ছোটে না। গোড়ায় প্রায়ই বলতেন, বীরেন যা মাসাজ আর তোয়াজ জানে তেমন আর কেউ জানে না – ওর থেকে শিখে নাও না। অবন্তী সহধর্মিণী নয়, ভোগের সঙ্গিনী, তাই এমন কথা অনায়াসে বলতে পারেন। কারো সাহায্য ছাড়াই অবন্তী এই তোয়াজের উপযুক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু অনেক সময়েই ইচ্ছে করে, এই লোকের টুঁটি দাঁত করে ছিঁড়ে নিয়ে এখান থেকে চলে যায়।

হ্যাঁ সে কেবল লালাসঙ্গিনী, ব্যভিচারী ভোগের সহচরী। নাচের সময় অঙ্গে কোন বসন না থাকলেই ওই দুই পশু খুশি হয়। গানে আপত্তি নেই, বীরেন চৌবের সামনে নাচতে না চাইলে এই লোকই ফেটে পড়ে। অবন্তীরও কি অবনতি হয়েছে? এই মালিকের সামনেও আর নাচতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় একটা নেকড়ের লোভাতুর চাউনি তার সর্বাঙ্গ চাটছে। বিদেশে বা এখানেও আগে তো গায়ে মাখতো না। এখন এমন হয় কেন?

মুখের ওপর জবাব দিলে তেতে-ওঠা মালিক যখন মাঝে মাঝে হুকুম এমন কি অনুনয়ও করেন, বলেন. বীরেন বেচারার ওপর তুমি এত বিরূপ কেন, তার ওপর একটু সদয় হও না· বরাবর ও দাদার প্রসাদ পেয়ে অভ্যস্ত, আমার আপত্তি না থাকলে তোমার এত কি আপত্তি!

অবন্তী কখনো কোনো জবাব না দিয়েই মনের ভাব বুঝিয়ে দেয়। কখনো মৃদু কঠিন গলায় বলে, এ কথা বলার আগে আপনি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছেন কিনা সেটা ভাববেন।

মুখের ওপর জবাব দিলে তেতে ওঠা স্বভাব।—কেন, দোষের মধ্যে ওর আমার মত টাকা নেই, এছাড়া আমার সঙ্গে ওর তফাৎ কোথায়? তোমার কাছে আমি যা, বীরেনও তাই—এ জন্যে বাড়তি টাকা চাও পাবে।

অবন্তীর কেন যেন এই মুখ থেঁতলে দিতে ইচ্ছে করে। কঠিন গলায় বলে, আমার বিবেচনার ওপর আপনি জুলুম করবেন না, কেবল আপনার প্রয়োজন ফুরোলে বলে দেবেন।

যত রাগই করুক এই লোকের প্রয়োজন ফুরোবে না এ-ও ভালোই জানে। আর কিছু না পারুক, এঁকে তার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল করে তুলতে পেরেছে।

এই কথা প্রসঙ্গেই সূর্য পাণ্ডে একদিন ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন। বলে উঠেছিলেন, আমার হুকুম শুনে চলতে তুমি বাধ্য, চলে যাবে বলে কাকে ভয় দেখাও, ইচ্ছে করলেই এখান থেকে তুমি জ্যান্ত বেরুতে পারবে ভাবো?

চোখে চোখ রেখে অবন্তী সেদিন বলেছিল, জ্যান্ত বেরুতে না পারলেই বা কি, ঊষা বাঈয়ের বোনকে আপনি ধরে রাখতে পেরেছিলেন?

সূর্য পাণ্ডের মুখে কথা সরেনি। পাথুরে দু' চোখ গনগনে কয়লার মত জ্বলে উঠেছিল।

আগে হলে গায়ে মাখত না, কিন্তু এখন আর এক অশান্তি অবন্তীর মনে থিতিয়ে উঠেছে।···দুই ছেলের সঙ্গে বাপের অর্থাৎ সূর্য পাণ্ডের অশান্তি বাড়ছে। ছেলেদের ব্যবসা আলাদা, কিন্তু বাপ যেখানে এত বছর ধরে একটা মেয়েছেলেকে এনে ঘরে তুলেছে, আর তার হাতে নিজের এত বড় ব্যবসার কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছে, সেখানে তারা নিশ্চিন্ত থাকে কি করে? দু'দিকেরই বৃদ্ধ উকিলটির আনাগোনা বাড়ছে। বাপের মতলব বোঝার চেষ্টা। সূর্য পাণ্ডে অবশ্য তাঁকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ব্যবসা আর বিষয় নিয়ে ছেলেদের বা অন্য কারো মাথা ঘামানোর দরকার নেই—তিনি যা খুশি তা-ই করবেন। এ খবর চুপি-চুপি বীরেন্দ্র চৌবে অবন্তীকে দিয়েছে। ছেলেরা যে তারপরেও দস্তুর মতো মাথা ঘামাচ্ছে তাও বলেছে। ম্যাডামের মন পাওয়ার লোভে ভিতরে ভিতরে সে পাগল হয়ে আছে। তাই তোষণের চেষ্টা। এমন আভাসও দিয়েছে, ম্যাডাম যদি তার ওপর একটু সদয় হয় তাহলে সে দাদাকে দিয়ে একটা উইল করানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

অবন্তী সর্ব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইদানিং ভিতর থেকে সেটা আব সম্ভব হয় না। এখন ঠিক যে কি চায় সে, তা-ও জানে না। ব্যাঙ্কে নিজের অ্যাকাউন্টে এখন যে টাকা জমেছে, একটা জীবন স্বচ্ছন্দে ভালোভাবে কেটে যেতে পারে। এক এক সময় ইচ্ছে করে, আর ভবিষ্যত ভেবে কাজ নেই, সব ছেড়েছুড়ে কোনো একাদিকে চলে গেলেই হয়। কিন্তু তক্ষুনি ভিতর থেকে কেউ যেন ফুঁসে ওঠে। জীবন নিয়ে এই যুদ্ধ তার ভবিতব্য। বিশ্বাস আর সরলতার মাশুল গুণে দিয়ে এই বিধ্বস্ত জীবন নিয়েই সে সরে দাঁড়াবে ?

একমাত্র শান্তির জায়গা যোশী মহারাজের কাছে। তখন সব যন্ত্রণা সব ক্ষতর ওপর যেন অদ্ভুত একটা শান্তির প্রলেপ পড়ে। গানের তালিম যখন নেয় সব ভুলে যায়।

অবন্তীর বয়েস এখন ত্রিবিশ। কিন্তু দেহের সুঠাম সৌষ্ঠব যেন একভাবেই স্থির হয়ে আছে। সূর্য পাণ্ডের বয়েস পঞ্চান্নয় গড়ালো। মদে আর অত্যাচারে শরীর আরো ভাঙছে। হাঁপ আর শ্বাসকষ্ট লেগেই আছে। তাঁর ভোগের ক্ষমতা যতো কমছে, ঘরের রমণীর প্রতি ততো নিষ্ঠুর হয়ে উঠছেন, অত্যাচারের লোভ ততো বাড়ছে। গঞ্জনা দ্যান, তার ফ্রান্সের সাত বছরের জীবন নিয়ে অকথ্য সব কথা বলেন আর হাসেন, রেগে গেলে গায়ে হাত পর্যন্ত তোলেন। অবন্তী ভেবে পায় না কেন সে এতটা সহ্য করছে, এখনো মন কেন বলে, সহ্য করা দরকার।

এ বাড়িতেই এ সময়ে অভাবিত ব্যাপার ঘটে গেল একটা। রাত তখন দশটা হবে, অবন্তী তখন নিজের কোণের ঘরে। ওদিকে মালিকের ঘরে সন্ধ্যা থেকে মদ চলছিল, ঘণ্টাখানেক আগে অবন্তী মদের আলমারির তালা বন্ধ করে অকথ্য গালাগাল শুনতে শুনতে চাবি নিয়ে চলে এসেছে। খানিকক্ষণের মধ্যে অক্সিজেনের দরকার হবে তাও জানে।

বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় ছুটেই ঘরে ঢুকলেন সূর্য পাণ্ডে।

সমস্ত মুখ ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। দিশেহারা চাউনি। বললেন, গুরুদেব এসেছেন, রাতটা এখানে থাকবেন বললেন, ছেলেরা কিছু লাগিয়েছে এমনও হতে পারে, শোনো—উনি কাল চলে না যাওয়া পর্যন্ত এ-ঘর ছেড়ে তুমি বেরুবে না, দোতলার আপিস ঘরে যাবে না, আড়তেও না, খুব খুব খুব সাবধান!

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট বেরিয়ে গেলেন।

অবন্তী নিশ্চল স্থাণুর মতো বসে।

সমস্ত রাত চোখে ঘুম নেই প্রায়। নিঃশব্দে একবার এসে গুরুদেবের ফোটোর সামনে দাঁড়িয়েছে। সেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ, চাউনি···আর চোখের গভীরে সেই অপার স্নেহের সমুদ্র।

সকাল তখন সাড়ে পাঁচটা। অবন্তী তানপুরা নিয়ে মেঝেতে বসল। প্রথমে মৃদু আওয়াজ তুলল। তারপর স্তব্ধতা খান খান করে ঝংকার উঠল। তার সঙ্গে কণ্ঠের গান সুরে সুরে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল ঃ

ইতনী মিনতি রঘুনন্দনসে
সুখ দ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী ।।
আপনে পদপঙ্কজ পিঞ্জর মে
চিত হংস হামার বৈঠাও জী ।।
তুলসীদাস কহে কর জোড়ি
ভব সাগর পার উতারো জী ।।

গান নয়, একখানা আকুল মিনতি বার বার আছাড়ি বিছাড়ি করে লুটিয়ে পড়তে লাগল। প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট ধরে চলল সুরের সেই অব্যক্ত হাহাকার, বুক ভাঙা আকুতি। দরজার সামনে কারা নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে টের পেয়েছে, কিন্তু তার দু'চোখ বোজা, দুই গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। সুরের পথে তার সত্তা কাঁদছে, অন্তরাত্মা কাঁদছে।

গান থামল। অবন্তী চোখ মেলে তাকালো।

সামনে সেই মূর্তি। ফোটোতে যাঁকে অনেক দেখেছে। ফোটোর থেকেও দৃপ্ত অথচ করুণাঘন মনে হল। তানপুরা রেখে অবন্তী

মেঝের ওপর আস্তে আস্তে উপুড় হল, কপাল মেঝেতে, যুক্ত দুই হাত প্রণাম হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে স্থির হল।

স্তোত্রের মতো সুর গার স্বর আবার বাতাস ভরাট করে তুলল:

নমো নারায়ণ নমো নারায়ণ
নমো নারায়ণ নমো নমঃ।
নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়
নমঃ শিবায় নমো নমঃ।
নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরবে
নমঃ শ্রীগুরবে নমো নমঃ॥

আবার খানিকক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর জলদ কণ্ঠস্বর কানে এলো। —ওঠো।

অবন্তী আস্তে আস্তে উঠল। জানুর ওপর সোজা হয়ে বসল। দু'হাত জোড় এখনো। দুই গালে জলের দাগ।

—কে মা তুমি?

অবন্তীর জলে ভেজা দু' চোখ ব্রহ্মমহারাজের মুখের ওপর, খুব মৃদু অথচ স্পষ্ট করে জবাব দিল, হতভাগিনী।

তিনি দেখছেন। অপলক চেয়ে আছেন। —তুমি এখানে কেন?

—ঈশ্বর জানেন। পনেরো বছর ধরে সবল বিশ্বাসের মাশুল গুনে চলেছি।

আবার কয়েক পলকের দৃষ্টিপাত। —এখানে কতদিন আছ?

বেনারসে ছ' বছর।

একটু আগে তুলসীদাসের যে ভজনখানা গাইলে তার অচলিত সুর রাগ বিস্তার সবই আমার এক বিশেষ পরিচিত জনের—এ জিনিষ তুমি কোথায় পেলে?

—আমার সঙ্গীত গুরুর কাছ থেকে।

—কে তিনি?

—দয়াল যোশী মহারাজ।

ঈষৎ বিস্ময়। —যোশী মহারাজ নিজে তোমাকে শিখিয়েছেন?

—এখনো শেখাচ্ছেন।

স্থির গম্ভীর অপলক। চেয়েই আছেন। দেখছেন। গেরুয়ার রং গায়ের রঙের সঙ্গে যেন মিশে আছে। আস্তে আস্তে ঘুরলেন। সূর্য পাণ্ডের মুখোমুখি। মুখের ওপর এক ঝলক ভর্ৎসনার ঝাপটা পড়ল। অবন্তী দেখছে, মানুষটা বেতস পাতার মতো কাঁপছে।

—এসো আমার সঙ্গে, শিষ্যকে হুকুম করে ঘাড় ফিরিয়ে অবন্তীকে বললেন, আমি খানিকক্ষণের মধ্যে আসছি।

বড বড় পা ফেলে চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। সেই ফাঁকে সূর্য পাণ্ডে একবার ঘরের দিকে তাকালেন। এই বিশ্বাসঘাতকতা আর ধৃষ্টতার শাস্তি তাঁর জানা নেই। গুরুর পিছনে ছুটলেন।

ব্রহ্মগুরু সোজা নেমে এসে গাড়িতে উঠলেন। ড্রাইভারের পাশে সূর্য পাণ্ডে। গাড়ি যোশী মহারাজের ডেরার গেটের সামনে দাঁড়ালো। তিনি নেমে এগিয়ে চললেন। পিছনে সূর্য পাণ্ডে। উনি ভিতরে ঢুকে গেলেন। সূর্য পাণ্ডে বাইরের ঘরে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে।

আধ ঘণ্টা বাদে ব্রহ্মগুরু বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ির মালিক আবার ড্রাইভারের পাশে।

অবন্তী তখনো নিজের ঘরের মেঝেতেই বসে। তানপুরাটা পর্যন্ত তেমনি পাশে পড়ে আছে। ব্রহ্মগুরু বলে গেলেন খানিকক্ষণের মধ্যে আসছেন। কেন বললেন ধারণার অতীত।…এই মুখ যেন চোখে লেগে আছে আর গায়ে কাঁটা কাঁটা দিয়ে উঠছে।

আবার সচকিত। ওই মূর্তি আবার দরজার সামনে।

ভিতরে ঢুকলেন। অবন্তীর সামনে মেঝের ওপরেই বসে পড়লেন। অবন্তী ব্যস্ত হয়ে উঠতে যেতেই হাত তুলে বাধা দিলেন। দরজার তিন হাত তফাতে পাংশু বিরস মুখে সূর্য পাণ্ডে দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছেন।

—বেনারসে আসার আগে তুমি সাত বছর ফ্রান্সে ছিলে?

অবন্তী একবার মুখ তুলে তাকালো, তারপর দৃষ্টি নত করল। এবারে ব্রহ্মগুরু আরো অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, তুমি নাকি তোমার

এর পর ব্রহ্মগুরু একটু হোম করলেন। সূর্য পাণ্ডের দীক্ষা অনেক বছর আগেই হয়ে গেছে। অবন্তীকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার দুটি শব্দের মন্ত্র কানে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অবন্তীর সর্বাঙ্গে শুধু নয়, সমস্ত সত্তায় বিদ্যুৎ শিহরণ। অবন্তী কাঁপছে। অবন্তী বসে থাকতে পারছে না। অবন্তীর ভীষণ ঘুমও পাচ্ছে।

ব্রহ্মগুরু মহারাজ সেই রাতেই বারাণসীধাম ত্যাগ করলেন। অবন্তীকে বলে গেলেন, খুব শিগ্‌গীর না হোক, আবার দেখা হবে।

১০

অবন্তীর নতুন জীবনের এমন চেহারা কি স্বয়ং ব্রহ্মগুরুও কল্পনা করতে পেরেছিলেন? জীবনের সমস্ত পুরনো মার আবার চার গুণ হয়ে ফিরে আসবে এটাই কি তার নতুন জীবনের ভবিতব্য? এ কখনো হতে পারে? যাঁর মুখভাব মনে এলে শান্তি, যাঁর কথায় অমৃতের স্বাদ, যাঁর দেওয়া জপমন্ত্রে আলোর হদিশ—তাঁর যদি এত দয়া, অবন্তীর বাকি জীবনটুকু তিনি এই মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে গেলেন কেন? এ কি পরিহাস?...পরীক্ষা?

সূর্য পাণ্ডের বিকৃতি ক্রোধ ঘৃণা আর বিদ্বেষ অবন্তীর মাথায় বজ্র হয়ে নেমে এসেছে। অপমানে অত্যাচারে উৎপীড়নে তার অষ্টপ্রহর বিষিয়েও তিনি ক্ষান্ত হতে রাজি নন। বদ্ধ ধারণা, দেহসর্বস্ব বহু-ভোগ্য এই কুহকিনী স্ত্রীর অধিকার পাবার জন্যই এভাবে এতগুলো বছর এখানে কাটিয়েছে। তাঁর বিশাল বিত্ত হাতে পাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। ধারণা, অনেক মাথা খাটিয়ে ছলে কৌশলে তাঁকে বোকা বানিয়ে তাঁর পুরুষকার নস্যাৎ করে সে এই দিনের নাগাল পেয়েছে। মোহিনী মায়ায় মানুষ ভোলে, দেবতা ভোলে না? দেবদূত ভোলে না? যাকে যে রকম ভোলানোর অস্ত্র। তাঁর নিষেধ অমান্য করার স্পর্ধা জীবনে কমই দেখেছেন সূর্য পাণ্ডে। নিষেধ সত্ত্বেও সকালের বিশেষ মুহূর্তটি বেছে নিয়ে এই নারী গানের জাল বিছিয়ে গুরুদেবকে নিজের ঘরের দোরে টেনে এনেছে,

চোখের জলে তাঁর বুকের তলায় ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এখন লক্ষ্যে পৌঁছেই গেল ভাবছে। কিন্তু সদর্পে কেউ সাপের লেজে পা দিয়ে দাঁড়ালে তার ভাগ্যে কি জোটে? কেবল বিষাক্ত দংশন ছাড়া আর তার কি প্রাপ্য হতে পারে?

ক্ষিপ্ত আক্রোশে ছোবল বসিয়েই চলেছেন সূর্য পাণ্ডে।

অবন্তীর কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর দেখে পরদিন থেকেই সকলে সচকিত, বিভ্রান্ত। বাড়ির অফিসের লোকেরা, আড়তের অফিসের লোকেরাও।...মালিকের বাড়িতে মালিকের ঘরে এত বছর কাটালো. এখনো আছে, তার কপালে সিঁথিতে সিঁদুর—এ তাহলে মালিক ছাড়া আর কার সীমন্তিনী হতে পারে?

খবরটা দুই ছেলের কানে যেতে সময় লাগে নি। ব্যাপার বোঝার জন্য দু'তরফের সেই বৃদ্ধ উকিল অচিরে বাড়িতে এসে হাজির। কি কারণে অবন্তীও তখন মালিকের ঘরেই। উকিলবাবু ছদ্ম বিস্ময়ে চেয়ে আছেন দেখে সূর্য পাণ্ডে গলায় বিষ ঢেলে বলেছেন, অবাক হয়ে দেখছেন কি, নিজের বুদ্ধির জোরে আমার স্ত্রী হবার অধিকার উনি অর্জন করেছেন—স্ত্রী না হলে এতবড় বিষয়-ব্যবসা হাতের মুঠোয় পাবে কি করে?...ছেলেরা ঠিকই মতলব বুঝেছিল, ওদের চিন্তা করতে বারণ করবেন...বিষয় খুব ভালো করেই খাওয়াচ্ছি আমি, ব্যবস্থা যা করার করছি।

উকিলটি চলে যাবার পরেই অবন্তী আবার ঘরে এসেছে।—আপনার বিষয়-ব্যবসা সব আপনি এই মুহূর্তে ছেলেদের লেখা-পড়া করে দিন, কিন্তু লোকের সামনে এভাবে অপমান করবেন না।

—কি? পুরুষের পাথুরে চোখ ধক-ধক করে উঠেছে। —তোমার অপমান বোধও আছে বলছ? দেশের-বিদেশের শ'য়ে শ'য়ে লোকের লোভের অপমান গায়ে মেখে এখানে এসে অপমান জ্ঞানও লাভ হয়েছে?

শুধু বাড়ির অফিস ঘরে নয়, সূর্য পাণ্ডে আড়তের অফিসেও আর তাকে মুখ না দেখাতে হুকুম করেছেন। নিজে খুলতে না পারলে সিন্দুকের চাবি বীরেন্দ্র চৌবেকে দিয়ে খোলান, তবু অবন্তীকে ছুঁতে

দেন না। মদ খাওয়া দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন, নিষেধ করা ছেড়ে অবন্তীর নিষেধের চোখে তাকানোর অপরাধে দু'দিন হাতের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছেন।···বিয়ের পর থেকে এই লোক আর তাকে স্পর্শ করেননি। কিন্তু সামনে দেখলেই ওই নিশ্চল দু'চোখ থেকে ব্যভিচারী লোভ ঠিকরে পড়ে। বর্তমানের এই সম্পর্কটা তাঁর এই লোভেও যেন বাদ সেধে বসেছে; তারও ফল দুর্জয় ক্রোধ।

কিন্তু রাতে মদের গেলাস হাতে নিলে তার ডাক পড়েই। প্রাণের সাগরেদ বীরেন্দ্র চোবের লুব্ধ দৃষ্টি আর অবন্তীর বিরক্তিও যেন বেশ উপভোগ্য। ওই লোকটাকে দেখলে অবন্তীর সত্যি এখন গা ঘিনঘিন করে। বিয়ের পর বীরেন্দ্রর চাউনি আরো ক্রূর কুটিল। সময় সময় মনে হয়, মালিকের একটু প্রশ্রয়ের ইশারা পেলেই সে থাবা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

সে-রাতের আসরে মালিকের হুকুম হল, আজ আমরা তোমার প্যারিসের সব থেকে লোক-মাতানো নাচ আর গান চাই—সে-রকম চোখ-তাতানো ড্রেস কি আছে পরে এসো—নুড হলেও আপত্তি নেই।

বিয়ের এই চার মাসের মধ্যে নাচ-গানের হুকুম আর হয়নি। অবন্তী ঠাণ্ডা অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, এ-রকম নাচ গান আর এখানে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত উঠল বুঝি, সাঁই-সাঁই শ্বাস।—কেন হবে না? এখন তুমি সতী-সাধ্বী স্ত্রী হয়েছ বলে? হাজার বার হবে—যখন বলব তখন হবে!

অবন্তী ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, তাহলে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, গুরুদেব যদি বলেন তোমার হুকুম হলে বাইরের লোকের সামনে নাচ-গান হতে পারে তাহলে কোন-রকম নাচ-গানেই আর আমার আপত্তি হবে না।

···না, হাতের মদের গেলাস ছুঁড়ে মারেন নি—কিন্তু গেলাসের সমস্ত তরল পদার্থের ঝাপটা সজোরে অবন্তীর চোখে মুখে এসে পড়েছে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বলে গেল মনে

হয়েছে। অবন্তী তবু সোজা তাকিয়েছে তাঁর দিকে। মেরে বসেছে বটে, রাগে কাঁপছেও, কিন্তু ঐ এক নাম শুনে সমস্ত মুখ পাংশুও।

ছ'মাস যেতে অনিয়ম অনাচার অত্যাচারের অমোঘ মাশুল দেবারই দিন এসে গেল বুঝি। সেদিন মদের গেলাস হাতে বার কয়েক বমির উদ্বেগের পরেই শয্যায় ঢলে পড়লেন।

দু'দুজন বড় ডাক্তার একই কথা জানালেন। সেরিব্রাল অ্যাটাক। বড় গোছেরই। হাসপাতালে নেওয়া যাবে না, নড়া-চড়া করানোর প্রশ্নই নেই।

চিকিৎসার ত্রুটি নেই। দুই ছেলে নকুল আর সহদেব এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকছে। তাদের স্ত্রীরাও এসে এসে দেখে যাচ্ছে। দিন-রাতের নার্স এসেছে। পদস্থ কর্মচারীরা দু'বেলা এসে এসে খবর নিচ্ছে।

চারদিন বাদে জ্ঞান হয়েছে। সেই জ্ঞান টনটনে হয়ে উঠতেও খুব সময় লাগেনি। কিন্তু যে থাবা পড়েছে তাতে বাঁ দিকের সর্ব অঙ্গ অসাড়। মুখের বাঁদিক বাঁ-হাত বাঁ-পা।

সাড়ম্বর চিকিৎসা চলতেই থাকল। মুখের বিকৃতিই শুধু কমতে লাগল, কিন্তু বাঁ-হাত বাঁ-পা অচল। এরই মধ্যে ছেলেরা একজনের প্রতি বাপের মনোভাব লক্ষ্য করেছে। ছ' বছর রক্ষিতার মতো থেকে যে এখন কপালে সিঁথিতে সিঁদুর পরে বসে আছে, তাকে। তার দিকে চোখ পড়লেই বাপের ক্রূর দৃষ্টি আর বিড়বিড় গালাগালি। বড় ছেলে নকুল বাবার সামনেই অবন্তীকে একদিন বলে বসল, আমরা যতক্ষণ থাকব আপনি ততক্ষণ এ-ঘরে বা আমাদের সামনে আসবেন না!

বাপের মনের খবর শোনা ছিল, এখানে এসে স্বচক্ষেই ছেলেরা দেখেছে। এ-রকম বলে দেবার পরেও বাপের পরিতুষ্ট মুখই দেখেছে।

দোরগোড়া থেকে আর একজন এ অপমান দেখেছে। শুনেছে। পুরনো ড্রাইভার মিশ্র। মালিকের অসুখে সে-ও বাড়ির লোকের মতোই উতলা।

ছেলেদের এক সময় নিচে পেয়ে সে বিষণ্ণ মুখে বলেছে, গুরুজী মহারাজ নিজে বসে মন্ত্র পড়ে মালিকের সঙ্গে যাঁর বিয়ে দিয়েছেন তাঁকে দাদাবাবুদের এভাবে অপমান করা ঠিক হল না।

দুই ভাই-ই একসঙ্গে তড়িৎস্পৃষ্ট যেন। —কে বসে মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিয়েছেন ? আমাদের গুরুদেব···ব্রহ্মগুরু ?

—জি দাদাবাবুরা, আউর আপনা লেড়কির মতন ওস্তাদ দয়াল মহারাজ সম্প্রদান করিয়েছেন।

দু'ভাই আবারও হাঁ। এ কি অসম্ভব কথা শুনছে তারা !

কিন্তু এরপর অবন্তীর দেখা আর তারা পায়নি। তারা এলে অবন্তী নিজের ঘরে সেঁধিয়ে থাকে।

ছ' মাস পরেও সূর্য পাণ্ডে নিজে হাঁটতে পারেন না। লাঠি সত্ত্বেও বাঁদিকে লোকের কাঁধে ভর দিয়ে একটু-আধটু হাঁটতে চলতে পারেন। বিকেল চারটে থেকে বেশ রাত পর্যন্ত লোকেরও দরকার হয় না। সারাক্ষণই বীরেন্দ্র চৌবে ছায়ার মতো সঙ্গে আছে।

এ অবস্থায়ও মানুষটার বিকৃতি বেড়েই চলেছে। অবন্তীর ওপর দুর্বার আক্রোশই তাঁর সব থেকে বড় বিকৃতি। তাকে সামনে দেখলে ক্ষেপে যান—অশ্রাব্য গালাগালি করেন, আবার না দেখতে পেলেও সেটা স্পর্ধা ভাবেন, চেলাকে হুকুম করেন ঘাড় ধরে নিয়ে আয় ! অবন্তীর হাতের রান্না দূরে থাক, ছোঁয়াও খান না। আবার খাওয়ার অনিয়ম শুরু হয়েছে। মদের মাত্রাও আবার বাড়ছে। ব্লাড প্রেসার তো চড়েই আছে, অক্সিজেন সিলিণ্ডার চালাতে হয় না এমন রাত যায় না। অন্য ঘর থেকেও শ্বাসের সাঁই-সাঁই শব্দ শোনা যায়। বীরেন্দ্র চৌবের সামনে বসে সন্ধ্যা থেকে রাতের শুশ্রূষা অবন্তীকেই করতে হয়। এতে আপত্তি হবে কেন, এ তো শাস্তিরই সামিল—আরো শাস্তি বীরেন্দ্রর ক্ষুধাতুর লোভাতুর দৃষ্টি-লেহনের সামনে বসে থাকাটা। সূর্য পাণ্ডে বিকৃত আনন্দে লক্ষ্য করে যান।

সেদিন অফিস ঘরে এসে অবন্তী ফোনের রিসিভার তুলে নিল, নম্বর ডায়াল করল। সাড়া পেয়ে জানান দিল নকুল বা সহদেব পাণ্ডের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

নকুল পাণ্ডেই ফোন ধরল।

অবন্তী বলল, মুখ দেখতে আপত্তি আছে জানি, কিন্তু খুব দরকারে দুই একটা কথা জানাতে পারব কি?

—বলুন। নকুল পাণ্ডের বিব্রত অথচ সংযত জবাব।

—আবার খাওয়া-দাওয়ার বেশি-রকম অনিয়ম শুরু হয়েছে, ড্রিংকএর মাত্রাও বাড়ছে—সব থেকে বেশি ক্ষতি করছেন তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্রবাবু, রোজই সকালে ডাক্তার এসে বকাবকি করেন, কিন্তু সন্ধ্যের পরে একই ব্যাপার চলছে। শ্বাস কষ্টও আগের থেকে অনেকে বেড়েছে।··· গুরুদেব বলে গেছলেন এ বছরটা খুব দুঃসময়, তাই জানানো দরকার মনে করলাম।

সেই বিকেলে দুই ছেলে হাজির। অবন্তী জানত না। ঘরের সামনে আসতেই ক্রুদ্ধ চিৎকার কানে এলো, ফোনে তোদের কাছে উনি নালিশ করেছেন? এত আস্পর্ধা! তোরা এসেছিস যখন ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়ে যা—আমি হুকুম করছি!

নকুল পাণ্ডের মিনমিনে গলা। —এর মধ্যে গুরুদেব আছেন শুনলাম ··।

—থাকলেই বা! ক্রোধে ক্ষিপ্ত। —গুরুদেব মানুষ নন? তিনি একটা ভুল করলে সেই ভুল আমাদের মাথায় করে বসে থাকতে হবে?

অবন্তী নিজের ঘরে চলে এলো। না, কেউ তাকে বার করে দেবার জন্য এগিয়ে এলো না।

রাত ন'টা নাগাদ চাকর মারফত ঘরে ডাক পড়ল তার। আসতে শয্যার নিজের বাঁদিকে অর্থাৎ যে-দিকটা এখনো অচল, সূর্য পাণ্ডে সে-দিকটায় বসতে বললেন তাকে। তাঁর ডান দিকটা সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল।

অবন্তী বসল। তিন হাতের মধ্যে বীরেন্দ্র চৌবে বসে। তার চোখে-মুখে হিংস্র খুশির ঝিলিক।

অবন্তী সোজা তার দিকে তাকালো।

—শোনো, মোলায়েম সুরে সূর্য পাণ্ডে শুরু করলেন, শোনো

মহাভারত নিশ্চয় পড়েছ, আর ক্ষেত্রজ সন্তানের কথাও ঝুড়ি-ঝুড়ি পড়েছ ··সেটা অনাচার নয় শাস্ত্রেও বাধে না, অক্ষম স্বামীর হুকুমই শাস্ত্র···আমার আর একটি সন্তান চাই, বীরেন আমার অনুরোধে রাজি হয়েছে, তোমার খুব একটা লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ নেই, আমি তো সামনেই থাকব! ও কি—উঠছ যে? বোসো বলছি! বজ্র হুংকার।

অবন্তী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

—উঃ! অস্ফুট একটা আর্তনাদ গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো। পিঠটা জ্বলে ঝলসে যাচ্ছে।

চামড়ার যে পুঁটলি বসানো চাবুকটা দেয়ালে ঝোলানো থাকে সেটা সূর্য পাণ্ডের ডান হাতে—সেটাই প্রচণ্ড আঘাত নিয়ে একবার অবন্তীর পিঠের ওপর নেমে এসে আবার উঠছে।

অবন্তী নিজের অগোচরে কয়েক পা সরে এলো। সূর্য পাণ্ডে বীরেন্দ্রর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলেন, ধর্ ওকে, আজ আমি ওকে আধমরা করে দেখব আমার হুকুম মানে কিনা!

অবন্তী ছুটে বেরিয়ে গেল। নিজের ঘরে এসে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ধড়মড় করে উঠতে হল আবার। দরজার কাছে কে দু'জন দাঁড়িয়ে।

একটা চাকরের সঙ্গে বীরেন্দ্র। কাঁপা গলায় জানালো, দাদার শ্বাস কষ্ট ভয়ঙ্কর বেড়েছে, বুকেও ব্যথা হচ্ছে, আথাল-পাথাল করছেন, একটুও ভালো মনে হচ্ছে না।

এসে অবস্থা দেখে অবন্তীর চক্ষু স্থির। পাগলের মতোই করছেন। দরদর করে ঘাম হচ্ছে। সঙ্গে অবিরাম কাশি। গলার কাশি নয়, অন্য রকমের অচেনা কাশি। বীরেন্দ্র জানালো সে এর মধ্যে চারটে শ্বাস কষ্টের আর দুটো ঘুমের ওষুধ দিয়েছে।

অবন্তী ছুটে টেলিফোনের কাছে যেতে বীরেন্দ্র জানালো, ডাক্তার একটা জরুরি কলে গেছেন, এখনো ফেরেন নি—এলেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

—বাড়িতে ছেলেদের ফোন করুন। অবন্তী বলল।

তার গলা পেয়ে এত কষ্টের মধ্যেও সূর্য পাণ্ডে চোখ তাকিয়ে দেখলেন। পাথুরে চোখ দুটো ধকধক করছে। চাকর আর ড্রাইভার মিশ্রর সামনেই গালাগালি করে উঠতে গিয়ে কাশতে লাগলেন। ফলে আরো ঘাম, আরো শ্বাস কষ্ট।

রিসিভার রেখে হতাশ মুখে বীরেন্দ্র বলল, দুই 'ভাই-ই ব্যবসার কাজে কোথায় গেছে, কাল সকালের আগে ফিরবে না।

অবন্তী ফিরে দেখে মৃত্যু-যন্ত্রণার সঙ্গে যোঝা সত্ত্বেও ওই মানুষ আহত জানোয়ারের মতো তার দিকে চেয়ে।

ফানেল খুলে অবন্তী অক্সিজেনের সরু নলটাই মাপমতো নাকে ঢুকিয়ে দিল। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে নিতে লাগল। তার নিজের পিঠের চামড়া দু'ফাঁক, এখনো জ্বলে যাচ্ছে। এই লোকের বাধা দেবার শক্তি নেই, কেবল চোখের চাবুক এখনো তার সর্বাঙ্গে নেমে আসছে।

ডাক্তার রাত সাড়ে এগারোটার পরে এলেন। অবন্তী জানে এই রোগীর ওপর অভিজ্ঞ ডাক্তারটি খুবই বিরূপ। অবাধ্য রোগী সর্বদাই তাঁকে মুখের ওপর বলে দ্যান, আপনার চিকিৎসা আপনি করুন, আমাকে আমার মতো থাকতে দিন।

এসে পর পর তিনটে ইনজেকশন দিলেন তিনি। মিনিট পনেরোর মধ্যে শ্বাসের টান কিছু কমল। বুকের ব্যথাও বোধহয়। ঘুমিয়ে পড়লেন।

ডাক্তার অবন্তীকে বললেন, ইনজেকশনের এফেক্ট কতক্ষণ থাকবে বলা যায় না, কারণ এ ধরনের কাশিটাই মারাত্মক। রাতটা কেটে গেলে সকালের আগে আর কিছু করার নেই। এক কথায়, এ-রকম অবস্থায় আশ্বাস দেবার মতো কিছু নেই।

রাত দুটো।

কাশির চোটেই ঘুম ভেঙে গেল। কাশি বাড়তেই থাকল। শ্বাসকষ্টে আবার কপালে বুকে ঘাম দেখা দিল। অবন্তী সামনের চেয়ারে বসে। ঘরে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অবন্তী ঘাম মুছে কূল পাচ্ছে না। খুক-খুক কাশিরও বিরাম নেই। বুকে যন্ত্রণা। কিন্তু সব

থেকে অসহ্য শ্বাসকষ্ট। রাতের নির্জনে এই শ্বাসের শব্দ বড় ভয়ঙ্কর।

উথাল পাথাল ভাব বাড়তেই থাকল। ফুল-স্পিডে পাখা ঘুরছে, নাকে অক্সিজেন, তবু ইশারায় বাতাস চাইছেন। কার কাছে চাইছেন খেয়াল নেই। অবন্তী ছুটে গিয়ে একটা হাত-পাখা এনে শয্যার পাশে বসে প্রাণপণে বাতাস করতে লাগল। কিন্তু ফল কিছু হচ্ছে মনে হয় না। মুহুর্মুহু তৃষ্ণা। পাখা রেখে অবন্তী জল দিচ্ছে আবার পাখা নিয়ে বসছে।

শ্বাসকষ্টে এক-একবার উঠে বসতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাঁদিক অচল, পারা সম্ভব নয়। অবন্তী আর একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে দিল।

ছটফটানির মধ্যেও এবারে খেয়াল করলেন কে সুশ্রূষা করছে। হাপরের মতো শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছেন ফেলছেন। কাশির কামাই নেই। তার মধ্যেই হিংস্র বিকৃত দুই পাথুরে চোখ অবন্তীর মুখের ওপর। কাশির ফাঁকে ফাঁকে বলে উঠলেন, তুমি ভেবেছ কি···তোমাকে টিট করতে না পারলে আমার নামে কুকুর পুষো···শুধু বীরেন নয়, পাঁচ সাতটা নেকড়ে-মানুষ এনে তোমাকে আমি খাওয়াবো··আর আয়েস করে আমি তাই দেখব···তবে আমি সূর্য পাণ্ডে!

অবন্তীর কি যে হল হঠাৎ। তারও দু'চোখ পাথরের মতো হয়ে উঠছে। লোকটার মুখের দিকে অপলক্ষ চেয়ে আছে। হাপরের মতো বুকটা উঠতে দেখছে নামতে দেখছে, কপাল মুখ ঘামতে দেখছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে দেখছে। খুক-খুক কাশির জন্য সিকিভাগ নিঃশ্বাসও নিতে পারছে না। তারই মধ্যে দুই ঘোলাটে চোখে এই অমোঘ ভবিতব্য ঘটানোর ক্রূর শপথ।

অবন্তীর হাতের উল্টোদিকের আচমকা ঝাপটায় লিউকো-প্লাস্ট লাগানো নাকের অক্সিজেনের সরু নলটা ছিটকে বিছানার একদিকে পড়ে গেল। মানুষটার দু'চোখ দিশেহারা হয়ে ওঠার আগেই অবন্তী শয্যা ছেড়ে উঠল। নিজেই দেখছে তারই দুটো আঙুল অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের চাবিটা বন্ধ করে দিল। পুরোদমে ঘোরা পাখার-সুইচটাও

টিপে বন্ধ করে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল।

বাইরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিল অবন্তী। আবার যখন ভিতরে ঢুকল রাত প্রায় চারটে।

এই বাড়িতে বা আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে সরবে শোক করার কেউ নেই। দুই ছেলে এসেছে তাদের বউ ছেলে মেয়েরা এসেছে দুই তরফের সমস্ত কর্মচারীরা এসেছে। সকলেই একটা বিষণ্ণ মৃত্যু দেখছে। বিষণ্ণ বলতে মৃতের মুখে প্রায় ক্ষেত্রেই যে সৌম্যভাব ফিরে আসে সেটা নেই। ডাক্তারটি ভোরে নিজে থেকেই দেখতে এসেছিলেন।...ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেছেন। দুই ছেলেই উপস্থিত তখন। তারা ভোর-রাতের গাড়িতে ফিরে খবর পেয়েই চলে এসেছে। ডাক্তার তাদের বলে গেছেন, রাতের অবস্থা দেখেই মনে হয়েছিল সকাল পর্যন্ত হয়তো টিকবেন না।

মৌন আড়ম্বরে দেহ মণিকর্ণিকার শ্মশানে ছাই হয়েছে।

অবন্তীকে ক'দিনের মধ্যে কেউ একটিবারও নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখেনি।

ব্রহ্মগুরু এসেছেন আরো প্রায় দু'মাস বাদে। ছেলেরা তাঁর অপেক্ষাতেই ছিল। তাদের সঙ্গে নিয়ে এ-বাড়িতে এলেন। এই দু' মাসের মধ্যেও অন্দরমহলের কোনো লোক অবন্তীর মুখ দেখেনি।

অবন্তী সেদিনও নিজের ঘরের মেঝেতে বসে।

ছেলেরা দরজার বাইরে। ব্রহ্মগুরু ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। তিনি চেয়ে আছেন। অবন্তীও অপলক চেয়ে আছে। তাঁর চোখের গভীরে এখনো সেই অপার স্নেহের সমুদ্র।

অবন্তীর সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। দু'হাতে পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে কপাল রাখল। সেই একদিন অবন্তীর চোখের জলে তাঁর পায়ের সামনের মেঝেটা ভিজেছিল। এইদিন পা দু'খানা ভিজল।

—ওঠো।

অবন্তী উঠল।

···এ বছরটা কাটবে না মনে হয়েছিল, তোমাকে বলে গেছলাম, এদেরও বলে গেছলাম। কিন্তু দু'মাস ধরে তুমি ঘর-বন্দী হয়ে আছ শুনলাম, তোমার ব্যবসা দেখবে কে?

অবন্তীর অন্তরাত্মা এখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু ভয়ে আদৌ নয়। তার সমস্ত ভয় সমস্ত চিন্তা বড় আশ্চর্যভাবে উবে গেছে। এঁরও কি অগোচর কিছু থাকতে পারে? কিছু জানতে বাকি থাকতে পারে? না না, তা হতে পারে না। তবু এই মুখ কেন? চোখের গভীরে এত দয়া কেন? শিষ্যর সমস্ত আপদ বালাই" সৎ গুরু নাকি দু'হাত পেতে নেন। ইনিও তাই নিয়েছেন?

অবন্তীর চোখে পলক পড়ে না।

ব্রহ্মগুরু বললেন, অবশ্য তোমাকে নিয়ে সুর্যব ছেলেদের কিছু সমস্যা উপস্থিত হয়েছে শুনলাম। তাই ওদেরও তাদের মা চেনাতে নিয়ে এলাম। ঘুরে নকুল আর সহদেবকে ডাকলেন, এসো। ···তোমাদের বাবা নেই, কিন্তু কপালগুণে আবার তোমরা মা পেয়েছ। মনে রেখো এই মা তোমাদের একাধারে লক্ষ্মী, সরস্বতীও।

···মাস দুইয়েব মধ্যে আবার যে ব্যাপারটা ঘটল, অবন্তীর বদ্ধ বিশ্বাস সে-ও গুরুদেবেব লীলা ভিন্ন আব কিছু নয়।

নকুলের দশ বছরের ছেলের ধুম জ্বব। সেই জ্বর মেনিনজাইটিসে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মগুরু তখন এলাহাবাদে তারা জানত। পাগলের মতো তারা তাঁর সঙ্গে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে। তিনি বলে দিয়েছেন, তোদের মা-কে ধরে নিয়ে যা, ছেলের মাথার কাছে বসে সকাল-সন্ধ্যা জপ করতে বল।

অবন্তী এর আগে থেকেই রাত থাকতে স্নান করে। সহদেব এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। গুরু-নাম সম্বল করে অবন্তী দশ বছরের ছেলেটার শিয়রের কাছে চোখ বুজে বসেছে। ডাক্তার এসেছে গেছে, চিকিৎসা চলেছে, কিন্তু অবন্তী রাতের আগে চোখ আর খোলেনি। এই জপে বাধা দিয়ে কেউ এক গেলাস জলও সামনে ধরতে সাহস করেনি। সন্ধ্যার পর থেকে ছেলেটা সত্যি সুস্থ।

তারপর থেকে নকুল সহদেব এই মায়ের ছেলে।

গোড়ার দিকে এরপর বছরে দুই একবার করে অনেকবারই গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে অবন্তীর। পরের দিকে তার অদ্ভুত সাহস আর মনের জোর বেড়েছে। গুরুকে ধরেই পড়েছে, জীবনের কথা শুনতেই হবে, তারপর বিচার করতে হবে।

তিনি কেবল হাসেন। বলেন, বিচার যিনি করার তিনি করছেন। করবেনও। শেষের বার কেবল বলেছিলেন, আমাকে কিছু বলার দরকার নেই, কোনদিন শোনার মতো দরদী লোক পেলে বোলো।

১১

ট্রেন কলকাতার দিকে হু হু করে ধাওয়া করেছে। এয়ার কনডিশনড কামরায় এক মাত্র আমিই বোধ হয় জেগে। ঘড়ি দেখলাম, রাত মাত্র বারোটা।

আমার সমস্ত মন বারাণসীতেই পড়ে আছে।

ভাবছি, এমনও হতে পারে, বাড়ির সকলে যখন ঘুমিয়ে, এই ভরা শীতের বারাণসীরও প্রায় যখন সকলে ঘুমিয়ে, অবন্তী পাণ্ডে হয়তো নির্লিপ্ত তৃপ্ত মুখে স্নান করছেন। ...ওই কমনীয় মুখে দেহজ গ্লানির কোনো ছাপ নেই, মনের গ্লানির আভাস মাত্র মেলে না। কেবল কি গ্লানির স্মৃতিটুকুই এখনো ধুয়ে মুছে যায়নি?

কাহিনীর এখানেই শেষ ভেবেছিলাম। সামান্য বাকি জানতাম না।

সাড়ে তিন বছর বাদে কোনো উপলক্ষে বারাণসীতে এসেছি। স্টেশান থেকে সোজা অবন্তী-ধামে চলে গেলাম। অপ্রত্যাশিত অতিথি দেখে তাঁর মুখখানা কেমন হবে ভাবতে ভালো লাগছিল।

কিন্তু এসে শুনি সেখানে আর এক মহিলা কর্ত্রী। ড্রাইভার মিশ্রজী জানালো আজ দু'বছরের ওপর হয়ে গেল মাতাজী (অবন্তীকে পরে মাতাজী বলেই ডাকত) উত্তর কাশীর কোন্

আশ্রমে থাকেন।

নকুল আর সহদেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তারা আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল। পরে বিরস মুখে জানালো, গুরুদেবের ইচ্ছায় তাদের মা উত্তর কাশীতে এক কুষ্ঠাশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে আছেন।

…আরো বছর ছয় সাড়ে ছয় পরে।

সকালের কাগজ খুলে দেখি নিচের দিকে ছোট হেডিং, সাধিকার মৃত্যু। হেডিংয়ের নিচে ছবি। খুব খেয়াল না করেই পাতা ওল্টাতে যাচ্ছিলাম। নাকের সাদা পাথর চোখ টানল। ছবিতে মুখের আদল খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু পাথরটাই চিনিয়ে দিল।

'উত্তর কাশীর বৃহৎ কুষ্ঠাশ্রমের কর্ত্রী সাধিকা অবন্তী মাতাজী পরলোকে। তাঁর গুরু ব্রহ্ম মহারাজের নির্দেশে দীর্ঘকাল ধরে তিনি এই কুষ্ঠাশ্রমের অক্লান্ত সেবা করে এসেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছাপ্পান্ন বছর। ব্রহ্ম মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মুখের আশ্চর্য খবর, অবন্তী মাতাজীর স্বামী সূর্য পাণ্ডে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে যে দিনের যে তারিখে মারা যান, মাতাজীও ওই বয়সেতে সেই দিন আর তারিখেই সজ্ঞানে স্বধাম যাত্রা করেছেন। তবে মাতাজীর অন্তিম যাত্রা সকালের দিকে আর তাঁর স্বামীর মৃত্যু সেই দিনেরই গভীর রাত্রিতে।'